মরণের পারে

স্বামী অভেদানন্দ

মরণের পারে

(বৈজ্ঞানিক আলোচনা)

॥ বাংলা গ্রন্থ ॥

স্বামী অভেদানন্দ-প্রণীত	মূল্য
ভারত ও তাহার সংস্কৃতি	২০.০০
হিন্দুনারী	৩.৫০
মনের বিচিত্র রূপ	৬.০০
আত্মবিকাশ	৬.০০
যোগশিক্ষা	১০.০০
আত্মজ্ঞান	১০.০০
পুনর্জন্মবাদ	৮.০০
স্তোত্ররত্নাকর	৬.০০
কর্মবিজ্ঞান	যন্ত্রস্থ
ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম	৩.০০
স্বামী বিবেকানন্দ	যন্ত্রস্থ
কাশ্মীর ও তিব্বতে	যন্ত্রস্থ
শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম	যন্ত্রস্থ

হাশিরাশি দেবী-প্রণীত

আচার্য অভেদানন্দ ২.০০

ডঃ অমিয় মজুমদার-প্রণীত

অভেদানন্দের বিজ্ঞানদৃষ্টি ৮.০০

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-প্রণীত	মূল্য
শ্রীদুর্গা	যন্ত্রস্থ
ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস	
প্রথমভাগ	২০.০০
দ্বিতীয় ভাগ (প্রথমার্দ্ধ)	২০.০০
ঐ (শেষার্দ্ধ)	২০.০০
রাগ ও রূপ (১ম ভাগ)	১৬.০০
ঐ (২য় ভাগ)	১৪.০০
অভেদানন্দদর্শন, ১ম ও ২য় ভাগ	যন্ত্রস্থ
তীর্থরেণু	৮.০০
মন ও মানুষ (প্রথমখণ্ড)	২০.০০
দ্বিতীয় খণ্ড	যন্ত্রস্থ
নাট্যসঙ্গীতের রূপায়ণ	৫.০০
সঙ্গীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান	১২.০০

মণি বাগচী-প্রণীত

Swami Abhedananda :
A Spiritual Biography
(in Eng.) Rs. 16·00

আশুতোষ ঘোষ-প্রণীত

Swami Abhedananda,
The Patriot-Saint
Rs. 2·00

স্বামী অভেদানন্দ
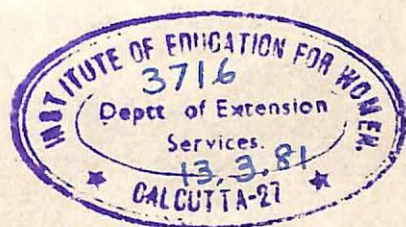
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৬০
পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, পৌষ ১৩৬১
পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, ফাল্গুন ১৩৬৪
পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ, আষাঢ় ১৩৭০
পঞ্চম সংস্করণ, আষাঢ় ১৩৭১
ষষ্ঠ সংস্করণ, চৈত্র ১৩৭৪
সপ্তম সংস্করণ, ফাল্গুন ১৩৮০
অষ্টম সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৮২
নবম সংস্করণ, পৌষ ১৩৮৫
দশম সংস্করণ, পৌষ ১৩৮৭

প্রকাশক :
স্বামী প্রণবেশানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রামকৃষ্ণ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

মুদ্রক :
শ্রীমোহন চাঁদ শীল
প্রিণ্ট ও প্রিণ্ট
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

॥ প্রথম সংস্করণ ॥

'মরণের পারে' ইংরেজী 'লাইফ বিয়ণ্ড ডেথ'-গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। সমগ্র গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। প্রথম থেকে ষষ্ঠ পর্যন্ত ও ষোড়শ অধ্যায় অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক শ্রীধীরানন্দ ঠাকুর। সপ্তম হতে একাদশ পর্যন্ত শ্রীমীরা মিত্র ও দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ অধ্যায় ও পরিশিষ্ট অনুবাদ করেছেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। ইংরেজী সংস্করণের মতো বাংলা সংস্করণেরও বহু পাদটীকা যোজনা করেছেন এবং ভূমিকা প্রভৃতি লিখেছেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। বইটির মূল বিষয়-আলোচনা ছাড়া ইংরেজী পরিশিষ্টেরও বাংলা অনুবাদ দেওয়া হয়েছে। প্রথম পরিশিষ্টের উপাদান সংগ্রহ করেছেন স্বামী বেদানন্দ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংযোজনা করেছেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। বি, ভি, শ্রেনেক নটজিঙ-রচিত 'ফেনোমেনা অব মেটিরিয়ালাইজিং' ও অন্যান্য ইংরেজী বই থেকে প্রেতাত্মাদের আরও কতকগুলি আলোকচিত্র এই বাংলা সংস্করণে সংযোজিত হল। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের একখানি আলোকচিত্র দেওয়া হ'ল। এর ইংরেজী সংস্করণও কয়েকবার প্রকাশিত হয়েছে সকলের আগ্রহ ও অজস্র প্রশংসাবাদ নিয়ে। আশাকরি এই বাংলা সংস্করণও জ্ঞানলিপ্সু পাঠক-পাঠীকাগণের কাছে অবশ্যই সমাদর পাবে।

প্রকাশক

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
৪ঠা আশ্বিন, ১৩৬০
ইং ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩

*

॥ দ্বিতীয় সংস্করণ ॥

'মরণের পারে'-গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ পাঠক-পাঠিকাদের সমাজে বিশেষ আদৃত হয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণের বেশীর ভাগ অংশ আবার সম্পূর্ণ নতুন করে অনুবাদ করা হয়েছে। বহু পরিত্যক্ত অংশও এই সংস্করণে অনুবাদ করে সংযুক্ত করা হল। তাছাড়া 'তৃতীয় পরিশিষ্ট'-রূপে আমেরিকার বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের 'প্রেততত্ত্ব'-সম্বন্ধে বক্তৃতার সারাংশগুলিও অনুবাদ করে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। প্রথম সংস্করণের ছাপায়

সম্পাদনার ত্রুটী-বিচ্যুতি থাকা বিচিত্র নয়, অথচ সেগুলি অমার্জনীয়ও নয়। তাই এই দ্বিতীয় সংস্করণকে বিশুদ্ধভাবে প্রকাশ করার জন্য আমরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছি, কিন্তু তাই বলে একথা নয় যে সর্বদোষ ও সকল ত্রুটী থেকে এই সংস্করণও মুক্ত হয়েছে। অনবধানতা মানুষমাত্রেরই আছে, আর তার জন্য ত্রুটী-বিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক।

প্রেতাত্মাদের আলোকচিত্রের সন্নিবেশ নিয়ে কিছু কিছু মতবিরোধ কোন কোন দিক থেকে দেখা গেছে, তাই এ' বিষয়ে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য জানানো কর্তব্য যে, ভৌতিক সাহিত্য ও ভুতুড়েবিদ্যা প্রচার করার কোনদিনই আমরা পক্ষপাতী নই, বরং সর্বতোভাবে বিরোধীই। তবে সত্য ঘটনা এবং ঐতিহাসিক বিজ্ঞানসম্মত বিবরণ ও তথ্য যা তার বিলোপ-সাধন করার বা প্রকাশবিরোধী হওয়ার আমরা পক্ষপাতী নই। সকল সময়েই অসংলগ্ন ভুতুড়েবিদ্যা-প্রচারের একান্ত বিরোধী ছিলেন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ নিজে, আর তারই জন্য এই গ্রন্থের অনেক জায়গায় সুস্পষ্ট ভাষায় তিনি প্রকাশ করেছেন: "আধুনিক প্রেততত্ত্ববাদের কতকগুলি চাক্ষুষ ঘটনা কোন কোন লোককে সাহায্য করে তাদের স্বাভাবিক কৌতুহলকে চরিতার্থ করার জন্য তাদের আশান্বিত করে বিদেহী বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের সংগে মরণের পরে সেই রহস্যময় দেশে মিলিত হবার জন্য। কিন্তু এ'ধরণের আশা ও আকাঙ্ক্ষা তাদের অন্তরে সান্ত্বনা মাত্র দেওয়া ছাড়া তার কিছুই করে না। তারা আসলে চায় পরলোকে মিলিত হতে বিদেহীদের সাথে, কিন্তু সত্যানুভূতি বা পরমমুক্তির পথ এ'সব দিয়ে কোনদিনই উন্মুক্ত হয় না।"

সত্যকারের কথা যে, প্রেততত্ত্বের আলোচনায় রহস্যময় মরণ-রাজ্যের কোন কোন তথ্যের সন্ধান হয়তো আমরা করতে পারি, কিন্তু তাই দিয়ে অধ্যাত্মরাজ্যের কোন রহস্যই উদ্‌ঘাটিত হবে না। মানুষ মরণের পর সঙ্গে নিয়ে যায় তার সকল কিছু সঞ্চিত জ্ঞান ও পার্থিব জগতের অভিজ্ঞতা। যতটুকুই সে করে সঞ্চয় ততটুকুই তার পাথেয়, সুতরাং মরণের পর নতুন ক'রে দিব্যজ্ঞানের অধিকারী সে হ'তে পারে না, কারুকে পথচারী হবারও তাই সাহায্য করতে পারে না সে সেই পরলোক থেকে। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজও তাঁর বিষরবস্তুর চাক্ষুষ ও বিজ্ঞানসম্মত আলোচনায় এ'কথারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন সকল সময়। তাছাড়া ইংরাজী 'লাইফ বিয়ণ্ড ডেথ' বা বাংলা 'মরণের পারে'-গ্রন্থটির আলোচনায় ইহজীবনের পরেও

আত্মার তথা জীবাত্মার অস্তিত্ব থাকে এবং সেই সেই আত্মার নিরাবরণ সত্যকারের রূপ যে সর্ববন্ধনহীন স্বয়ংজোতিষ্মান পরমচৈতন্য এটাই তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন, আর তারই জন্য বস্তুতন্ত্রবাদের প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে যাঁরা মরণের পর নিজেদের সত্তা অস্বীকার করেন ও আত্মাকে বলেন জড়বস্তুর পরিণতি, তাদের মতবাদকেই তিনি বিশেষভাবে খণ্ডন করেছেন শাস্ত্রযুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত বিচারের অবতারণা ক'রে: স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, মানুষ এই পৃথিবীলোক থেকে চিরবিদায় কোনদিন নেয় না, যতদিন পর্যন্ত না শাশ্বত স্বরূপকে মানুষ উপলব্ধি করতে পারে ততদিন সে বার বার যায় ও আসে এবং নতুন নতুন অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করে। এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ফলে তার বিবেক-বিচারের পথ হয় উন্মুক্ত ও তারই অত্যুজ্জ্বল আলোকে তার অজ্ঞানের অন্ধকারও যায় দূরে, উপলব্ধি করে পরিশেষে জন্ম-মরণহীন আপন অমৃতসত্তাকে। এই পরমতত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টাই করেছেন অভেদানন্দ মহারাজ এই গ্রন্থে বিচারপ্রণালী, বিচিত্র ঘটনা ও অসংখ্য প্রমাণপঞ্জী দিয়ে। আলোকচিত্র বা ছবি হল তাঁর বিষয়বস্তুকে চাক্ষুষভাবে বোঝানোর জন্য এবং আমরাও ব্যবহার করেছি প্রেতাত্মাদের আলোকচিত্রগুলি একমাত্র তার উদাহরণেরই নিদর্শনরূপে।

পরিশেষে বক্তব্য, এই দ্বিতীয় সংস্করণে বৈজ্ঞানিক ক্রুকস্ ও তাঁর পরীক্ষা এ'দুটি নতুন আলোকচিত্র সন্নিবিষ্ট করা হল। দ্বিতীয় সংস্করণ-প্রকাশের শ্রমকেও আমরা সার্থক বলে মনে করব যদি সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের সমাজে এ' অক্ষুন্ন রাখতে পারে তার পূর্বগৌরব ও মর্যাদা।

প্রকাশক

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ,
কলিকাতা-৬
১লা মাঘ, ১৩৬১

*

॥ তৃতীয় সংস্করণ ॥

'মরণের পারে'-গ্রন্থের তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। জীবন-রহস্যের সমস্যার সমাধান কিভাবে হ'তে পারে ও পরলোকে মানুষের অস্তিত্ব থাকে কিনা এ' বিষয় জানার জন্য মানুষমাত্রেই আগ্রহশীল। মনে হয়,

'মরণের পারে' মানুষের সেই আগ্রহের কথঞ্চিৎ নিবৃত্তি করতে পেরেছে। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ ভৌতিকতত্ত্বের অবতারণা করেছেন পার্থিব জীবনের পারেও যে তার একটা অস্তিত্ব আছে ব'লে তাই প্রমাণ করার জন্য, কিন্তু তাই ব'লে তিনি সেদিকে মানুষের প্রবৃত্তিকে পরিচালিত করার পক্ষপাতী কোনদিনই ছিলেন না। এই গ্রন্থের বক্তৃতাগুলির অবতারণা করার উদ্দেশ্য— মানুষকে তার আত্মসত্তায় পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস স্থাপন ও সঙ্গে সঙ্গে সেই চিরপবিত্র শাশ্বত আত্মার স্বরূপকে উপলব্ধি করে জন্ম-মৃত্যুপ্রবাহের পারে উপনীত করানো। আশা করি, জ্ঞানলিপ্সু মানুষকে এই সংস্করণও পূর্বপূর্ববারের মতো জিজ্ঞাসার উপাদান পরিবেশন করতে সক্ষম হবে।

প্রকাশক

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
কলিকাতা-৬
৮ই ফাল্গুন, ১৩৬৪

*

॥ চতুর্থ সংস্করণ ॥

'মরণের পারে'-গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। মৃত্যুই মানুষের সমগ্র সত্তাকে চিরদিনের জন্য গ্রাস করে না, মৃত্যুতে পার্থিব শরীরের মাত্র ধ্বংস হয় এবং শরীরে অবস্থিত শারীরী আত্মার সত্তা চিরদিনই থাকে—এই ভারতীয় রহস্যকথা বিশ্বের সকল মানুষের নিকট এক শান্তি ও সান্ত্বনার বার্তা। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, অধ্যাত্ম-অনুভূতি ও বৈজ্ঞানিক যুক্তির সাহায্যে মরণোত্তর মানবসত্তাকে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন এবং সফল হয়েছেন। জ্ঞানলিপ্সু পাঠক-পাঠিকাদের প্রাণে এ'গ্রন্থ সান্ত্বনার আশ্বাস দান করেছে। এবং এই চতুর্থ সংস্করণের প্রকাশ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আশা করি, পরমশান্তিকামী মানুষ এই পরলোকতত্ত্বকে তার অধ্যাত্মপথেরই প্রেরণাবাণী-রূপে গ্রহণ ক'রে জীবন-সাধনার পথে অগ্রসর হবেন।

প্রকাশক

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
কলিকাতা-৬
২৩শে জুন, ১৯৬৩

॥ পঞ্চম সংস্করণ ॥

১৩৭১ সালের গোড়ার দিকে দপ্তরীর বাড়ীতে অগ্নিসংযোগে মঠের যে বহু গ্রন্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, 'মরণের পারে' সেগুলির অন্যতম। সর্বসাধারণ সমাজে এই গ্রন্থের বিশেষ দাবী ও সমাদর থাকায় ইহা পুনরায় প্রকাশ করতে আমরা বাধ্য হলাম।

আষাঢ়, ১৩৭১

প্রকাশক

*

॥ ষষ্ঠ সংস্করণ ॥

ষষ্ঠ সংস্করণ ছাপা হ'ল আরো ভালভাবে সম্পাদনা ক'রে। আশা করি এবারও এই গ্রন্থ সর্বসাধারণের কাছে আদরণীয় হবে।

চৈত্র, ১৩৭৪

প্রকাশক

*

॥ সপ্তম সংস্করণ ॥

সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। এই মৃত্যুতত্ত্বের উপর মানুষের মনের আকর্ষণ স্বাভাবিক, কিন্তু এই আকর্ষণ কেবল কৌতূহল-চরিতার্থের জন্য হওয়া উচিত নয়, উচিত এই মৃত্যুতত্ত্বকে জেনে মৃত্যুরহস্যের পারে যাওয়া। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যই তাই। সকল পাঠক-পাঠিকাকে আমরা অন্তরের অভিনন্দন জানাই এই গ্রন্থের প্রকাশকে সমাদর দেখানোর জন্য।

ফাল্গুন, ১৩৮০

প্রকাশক

॥ অষ্টম সংস্করণ ॥

গ্রন্থের অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। গ্রন্থের প্রতিটি পরিচ্ছেদে ভাষা ও বিষয়বস্তুর প্রয়োজনীয়তা-অনুসারে কিছু কিছু সংস্কার এই অষ্টম সংস্করণে করা হল। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-লিখিত একটি ভূমিকাও এবারে এই নূতন সংস্করণে সংযোজন করা হ'ল। গ্রন্থটি ভারতের সর্বত্র আদরণীয় হওয়ায় আমরা আনন্দিত এবং এই আনন্দের সঙ্গে আমরা সকল পাঠক-পাঠিকাকে জানাই তাঁরা যেন এই গ্রন্থের যথার্থ উদ্দেশ্য ও সিদ্ধান্ত উপলব্ধি ক'রে তাঁদের জ্ঞানক্ষেত্রকে আরো সমুজ্জ্বল করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
কলিকাতা
ভাদ্র, ১৩৮২

প্রকাশক

*

॥ নবম সংস্করণ ॥

নবম সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। এই সংস্করণে সামান্য সামান্য পরিশুদ্ধ করা ছাড়া সমস্তই পূর্বসংস্করণের মতো রাখা হয়েছে। মরণের পারে মানুষের অস্তিত্ব থাকে কি-না সকল মানুষেরই মনের প্রশ্ন। এই গ্রন্থে সেই সকল প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
কলিকাতা
ফাল্গুন, ১৩৮৫

প্রকাশক

*

॥ দশম সংস্করণ ॥

সর্বসাধারণ মানুষের সমাজে 'মরণের পারে' গ্রন্থটি বিশেষ পরিচিত ও আদৃত। পূর্বসংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় আমরা নূতন দশম সংস্করণ হিসাবে গ্রন্থটি পুনরায় মুদ্রিত করে প্রকাশ করলাম। এই সংস্করণে আর কোন নূতন বিষয়বস্তু সংযুক্ত হ'ল না, পূর্বের মতোই প্রকাশিত হ'ল।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
কলিকাতা-৭০০০০৬
পৌষ, ১৩৮৭

প্রকাশক

॥ ভূমিকা ॥

(এক

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

(১) বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

(২) জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥

শ্লোকদুটি গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২২ এবং ২৭ শ্লোক। বীর অর্জুন ধর্মক্ষেত্ররূপ কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে যুদ্ধ করতে উদ্যত। যুদ্ধের সূচনা পাণ্ডব ও কৌরবদের মধ্যে। কৌরবরা শত্রু হলেও স্বজন ও বন্ধু, কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হ'য়ে উঠলো। পাণ্ডবদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ—যিনি অর্জুনের সারথ্য স্বীকার করলেন। অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'য়েও সম্মুখে শ্রদ্ধেয় গুরুজন ও স্বজনদের দেখে যুদ্ধ করবেন না ব'লে অস্ত্র ত্যাগ করলেন। তিনি বললেন—

'দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ, যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি॥

*   *   *

মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন॥

*   *   *

এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ॥' গীতা ১।২৮—৪৬

এটি অর্জুনবিষাদযোগ-অধ্যায়। বিষাদ এ'জন্য যে, অর্জুনের শ্রদ্ধেয় ও স্নেহের পাত্র সকলে যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত এবং তাঁরা মৃত্যুলোকের সম্মুখীন, মৃত্যু তাঁদের অনিবার্য। আসলে অর্জুন মায়া ও মোহাচ্ছন্ন হয়েছিলেন এবং এই অনুশোচনা অর্জুনের মধ্যে দয়ার বিকাশ নয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "দয়া মানে সর্বভূতে আমার হরি আছেন এই জেনে সকলকে সমান ভালবাসা।......দয়া

আর মায়া দু'টি আলাদা জিনিস। মায়া মানে আত্মীয়ে মমতা--যেমন বাপ, মা, ভাই, ভগ্নী, স্ত্রীপুত্র—এদের উপর ভালবাসা। দয়া সর্বভূতে ভালবাসা—সমদৃষ্টি। কারু ভিতর যদি দয়া দেখ, সে জান্‌বে ঈশ্বরের দয়া। দয়া থেকে সর্বভূতে সেবা হয়। মায়াও ঈশ্বরের। মায়ার দ্বারা তিনি (ঈশ্বর) আত্মীয়দের সেবা করিয়ে লন। তবে একটি কথা আছে—মায়াতে মুগ্ধ ক'রে রাখে, আর বদ্ধ করে, কিন্তু দয়াতে চিত্তশুদ্ধি হয়। ক্রমে বন্ধনমুক্তি হয়।"

তাই দেখি, রণক্ষেত্রে আত্মীয়-স্বজনদের দেখে মোহ ও মায়া এসেছিল অর্জুনের মধ্যে। মোহ ও মায়া আত্মীয়-স্বজনদের দেহসত্তার উপর কিন্তু দেহ তো অজর অমর ও শাশ্বত নয়, দেহের ক্ষয় ও নাশ আছে, কিন্তু দেহের মধ্যে যিনি বাস করেন শরীরী আত্মা—তাঁর কোনদিন ক্ষয়-ব্যয় নাই, তিনি জন্ম-মৃত্যুহীন অমর ও শাশ্বত। অর্জুনের এই ধরণের মোহ হয়েছিল। তিনি দেহাত্মবোধ নিয়ে তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের দেখেছিলেন ও বিচার করেছিলেন, তাঁদের শাশ্বত ও অমর আত্মার প্রতি দৃষ্টি দেন নি, সে'জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মোহাচ্ছন্ন অর্জুনের জ্ঞানদৃষ্টি ফিরিয়ে আনার জন্য বলেছিলেন: "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ···ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।" শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন—

'ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরম্॥'

হে অর্জুন, তুমি যাদের জন্য দেহবোধে অর্থাৎ দেহের নাশে মৃত্যু হবে এই বোধে শোক কর্‌ছো, সত্যকারের তাঁরা কেউই (জন্মের) পূর্বে ছিলেন না, তুমিও ছিলে না, এ'সকল নৃপতিরাও ছিলেন না, আর যদি বলো মৃত্যুর পর এই দেহ নিয়ে তুমি থাক্‌বে ও তাঁরাও সকলে থাক্‌বেন—তা ঠিক নয়, তাই এ'কথা যদি ভাবো তবে খুব ভুল কর্‌বে। শ্রীকৃষ্ণ আরও বল্লেন: 'এটা জেনে রেখো অর্জুন যার সত্তা বা অস্তিত্ব আছে তার নাশ কোনদিনই হ'তে পারে না, কেননা সদ্-বস্তুর সত্তা সর্বকালে সর্বদাই থাকে ও থাক্‌বে। আত্মাই পরিবর্তনশীল জগতে অপরিবর্তনীয় ও সত্য, সুতরাং তুমি দেহদৃষ্টি ত্যাগ ক'রে আত্মদৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত হও! "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ",—সুতরাং আত্মা সর্বদাই সত্য ও অবিনাশী, তাঁর জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, তিনি দেহের সীমান্তে আবদ্ধ নন, তিনি সর্বদেহে ও বিশ্বের সর্বত্র চৈতন্যময়, অর্থাৎ এক ও অদ্বিতীয় চৈতন্যরূপে বিদ্যমান। পূর্বের "বাসাংসি জীর্ণানি" ও "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুধ্রুবং

জন্ম মৃতস্য চ" শ্লোক' দুটি আত্মার অমরত্ব এবং জন্ম ও মৃত্যুশীল যে জিনিস তা জন্মায় আবার ধ্বংস হয় সে' প্রসঙ্গেই বলেছেন। কথায় বলে 'জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে',—যার জন্ম আছে, তার মৃত্যু হবেই, কিন্তু যার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই—অজর ও অমর তাঁর সম্বন্ধে জন্ম-মৃত্যুর কোন প্রশ্নই ওঠে না। সাংখ্যদর্শনে মুনি কপিল এ' কথাই বলেছেন—'নাশ অর্থে কার্যের কারণাবস্থায় ফিরে যাওয়া'। কার্য থাকলে তার কারণ থাকবে ও কারণ থাকলে তার কার্য থাকবে। তাই কার্য-কারণ-সম্বন্ধ মায়িক জগতের কথা, এটি মায়ার অতীত রাজ্যের কথা নয়। জ্ঞানস্বরূপ আত্মার আসন যেখানে প্রতিষ্ঠিত সেখানে কারণ নাই, কার্য নাই, কার্য-কারণের তা অতীত। কার্য-কারণের অতীত এবং জন্ম-মৃত্যুর অতীত বস্তুই সত্য ও পারমার্থিক তত্ত্ব। এই তত্ত্ব উপলব্ধি করার জন্যই জন্মের ও সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর কথা নিয়ে আলোচনার সূচনা। জন্ম থাকলেই মৃত্যু এবং মৃত্যুকে স্বীকার করলেই জন্ম—এই ব্যবহারিক বা জাগতিক তত্ত্ব একমাত্র উৎপত্তি ও মরণশীল দেহেতেই সঙ্গত হয়, কিন্তু শাশ্বত দেহী বা আত্মায় এই জাগতিক বা পার্থিব তত্ত্বের কোন সঙ্গতি নাই।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ 'মরণের পারে'-তত্ত্বের আলোচনা করেছেন জন্ম-মৃত্যুর অতীত আত্মসত্তার রহস্যকথা জন্ম-মরণশীল মায়াসক্ত মানুষকে শোনানোর জন্য। অধিকাংশ মানুষের বিশ্বাস যে, মৃত্যুর পর মানুষের সত্তা বা অস্তিত্ব থাকে না—শূন্যেই তা বিলীন হয়, কিন্তু প্রকৃত কথা তা নয়। মানুষ ও সকল প্রাণী জন্মগ্রহণ করে যে যার সংস্কারকে বা কর্মফলকে নিয়ে, ভোগভূমি সংসারে কিছুদিন তারা কর্মফল ভোগ ক'রে আবার নূতন সংস্কার বা কর্মফল সৃষ্টি করে, তারপর ভোগের শেষে আবার পৃথিবীলোক থেকে বিদায় নেয়। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বলেছেন, সেই বিদায় কিন্তু চিরদিনের জন্য নয়—ক্ষণিকের জন্য, আর এই বিচ্ছেদ ও মিলন অনন্তকাল ধরেই চলতে থাকে প্রবৃত্তির বা বাসনা-কামনার পথে থাকলে, কিন্তু নিবৃত্তির পথে গেলে মিলন-বিচ্ছেদ-খেলার শেষ হয়, তখন একমাত্র ব্রাহ্মীস্থিতি বা আত্মস্থিতি। তখন জন্ম-মৃত্যুহীন আত্মার যা অবিকৃত ও পরিশুদ্ধ রূপ সর্বব্যাপক ও সর্বানুস্যূতি শাশ্বত পরমসত্তা—তাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকে সকল মানুষ ও সকল প্রাণী। মৃত্যুলোক ও মৃত্যুর অতীত লোকের প্রশ্ন তখন আর থাকে না, থাকে একমাত্র অমরাত্মার অমৃতময় সত্তার কথা। স্থিতি ও প্রকাশ তখন একই

সঙ্গে থাকে, আর দেশ কাল ও নিমিত্তের কোন চিহ্ন তখন থাকেনা। একেই আচার্য গৌড়পাদ বলেছেন,

'তত্ত্বমাধ্যাত্মিকং দৃষ্ট্বা তত্ত্বং দৃষ্ট্বা তু বাহ্যতঃ।
তত্ত্বীভূতস্তদারামস্তত্ত্বাদপ্রচ্যুতো ভবেৎ॥'

তখন মানবসত্তা ও সর্বপ্রাণীসত্তা একই পরমসত্তারূপ অদ্বৈততত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকে—"আত্মা চ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজোঽপূর্বোঽনপরোঽন্তরোঽবাহ্যো কৃৎস্ন আকাশবং সর্বগতঃ সূক্ষ্মোঽচলো নির্গুণো, নিষ্কলো নিষ্ক্রিয়ঃ।" এই সর্বগত অদ্বৈতপ্রতিষ্ঠাই প্রতিটি জীবাত্মার কাম্য।

(দুই)

'মরণের পারে' এক রহস্যময় দেশ—যে দেশে সূর্য নাই, চন্দ্র নাই, নক্ষত্র নাই, যে দেশে স্থূল নাই, কেবলই সূক্ষ্ম-ভাবনা ও সূক্ষ্মচিন্তার রাজ্য। এই চিন্তার রাজ্যকেই মনোরাজ্য বা স্বপ্নরাজ্য বলে। মাণ্ডুক্য-উপনিষদে এই মনোরাজ্যের কিছুটা আভাস দেওয়া হয়েছে—"বিশ্বে হি স্থূলভূঙ্‌নিত্যং তৈজসং প্রবিবিক্তভুক্।" "স্থূলং তর্পয়তে বিশ্বং প্রবিবিক্তন্তু তৈজসম্।" বিশ্ব বা বিরাট বিশ্বচরাচররূপে বাস্তব প্রকাশ। এটি ইন্দ্রিয়ের জগৎ, স্থূলভোগের জগৎ, কিন্তু তৈজস বা মনের জগৎ তা থেকে ভিন্ন। কথা এই যে, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের যে স্থূল ভোগের জগৎ সেখানে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মানুষ ও সকল প্রাণী স্থূল-বিষয়ই ভোগ করে, কিন্তু মৃত্যুর পর সকলের সূক্ষ্মশরীর যায় স্বপ্নলোক বা মানসলোকে। মনেরই সেখানে বিলাস—চলা, বসা, খাওয়া, দেওয়া-নেওয়া। এই সমস্ত পরলোকবাসী জীবাত্মা ভোগ করে মনে, তাই মনেরই সেটি রাজ্য, মনেরই সেটি লোক।

ইহলোক স্থূল-ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে, আর পরলোক সূক্ষ্ম-মনের ও মানসিক সংস্কারের রাজ্যে। ইহলোক ও পরলোক তাই জাগ্রত-অবস্থা ও স্বপ্ন-অবস্থা। জাগ্রত-অবস্থায় মানুষ যে যে কাজ করে, স্বপ্ন অবস্থায় তাদেরই সংস্কার মনে মনোলোকে থাকে ও জীবাত্মা সূক্ষ্মদেহে সেই সব ভোগ করে। সুষুপ্তির রাজ্য জাগ্রত ও স্বপ্ন এই দুটি রাজ্যের পারে। জাগ্রত-অবস্থায় স্থূলবস্তু থাকে, স্বপ্ন-অবস্থায় স্থূলবস্তুর সূক্ষ্ম-সংস্কার থাকে, আর সুষুপ্তিতে সকল-কিছুরই কারণ সংস্কাররূপ অজ্ঞান থাকে। সুষুপ্তি-অবস্থায় কারণ অজ্ঞান থাকে শুদ্ধ আত্মার সহকারী হয়ে, তাই বলা হয়েছে,—'আনন্দশ্চ তথা প্রাজ্ঞম্'। প্রাজ্ঞ কিনা

জীবাত্মা সুষুপ্তির অবস্থায় কারন-অজ্ঞানের সঙ্গে থাকে—"বীজ-নিদ্রাযুতং প্রাজ্ঞঃ" বীজ বা কারণ-অজ্ঞান হোল যে অজ্ঞানের জন্য জীবাত্মা পুনরায় পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে, ভোগ করে, ও সৃষ্টি করে সকল-কিছু ভোগের বস্তু বাসনা-কামনার প্রেরণায়। এই কারন-অজ্ঞানের পরেই বিশুদ্ধ-আত্মার জ্ঞানময় ও আনন্দময় রাজ্য। বিশুদ্ধ-আত্মার জ্ঞানময় রাজ্যকে বলে তুরীয় বা চতুর্থ। চতুর্থ কিনা স্থূল বা জাগ্রত, সূক্ষ্ম বা স্বপ্ন ও কারন বা সুষুপ্তি-অবস্থার অতীত। এই অতীত রাজ্যই আত্মা বা ব্রহ্মের স্বরূপরাজ্য। স্বরূপরাজ্যই প্রতিটি মানুষ ও জীবের লক্ষ্য ও কাম্য। স্বরূপরাজ্যে বাসনা-কামনার লেশ নাই, দ্বৈত বা দুই-দুই জ্ঞান নাই, আছে মাত্র এক ও অখণ্ড-জ্ঞান ও শাশ্বত আনন্দ। ঐ অতীত ও চতুর্থ রাজ্যে অজ্ঞান থাকলে তার নাম হয় সুষুপ্তি এবং সুষুপ্তিলোকবাসী জীবের নাম হয় 'প্রাজ্ঞ': আচার্য গৌড়পাদ মাণ্ডুক্যকারিকায় প্রাজ্ঞ (সুষুপ্তি-অবস্থার) ও শুদ্ধ-আত্মার (তুরীয়-অবস্থার) মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন এ'ভাবে—

'স্বপ্ননিদ্রাযুতাবাদ্যৌ প্রাজ্ঞস্ত্বস্বপ্ননিদ্রয়া।
ন নিদ্রাং নৈব স্বপ্নং তুর্যে পশ্যন্তি নিশ্চিতাঃ॥'

জাগত-অবস্থার জীবাত্মা বিরাট ও স্বপ্ন-অবস্থার জীবাত্মা তৈজস স্বপ্ন ও নিদ্রাযুক্ত থাকে, কারণ-অবস্থার জীবাত্মা প্রাজ্ঞ, কিন্তু প্রাজ্ঞ স্বপ্নরহিত ও কেবলই নিদ্রাযুক্ত, আর তুরীয়ে বা বিশুদ্ধ-আত্মাস্বরূপে নিদ্রা নাই, সুতরাং স্বপ্ন নাই। কার্য-কারন-সম্বন্ধ নিয়েই জাগ্রৎ, স্বপ্ন প্রভৃতি অবস্থা। কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ নিয়েই ইহলোক বা পৃথিবীরূপ ভোগলোক ও পরলোক বা মনোলোক। কারণ-অজ্ঞানের রাজ্য সুষুপ্তির অবস্থা। তাই সুষুপ্তিতেও কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ থাকে, আর কার্যরূপ স্থূল, স্থূলের পর সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম থাকলেই কারণ থাকে। আচার্য গৌড়পাদ বলেছেন: 'বীজ-নিদ্রাযুতঃ প্রাজ্ঞঃ, সা চ তুর্যে ন বিদ্যতে'। কথা এই যে, মৃত্যুর পর সংস্কারসমূহ ভোগ ক'রে জীবাত্মা, আর যখন সকল সংস্কারের ও মনোলোকের অতীত মহাসুষুপ্তির অবস্থায় জীবাত্মা উপনীত হয় তখন আর নিদ্রা থাকে না, নিদ্রাজন্য স্বপ্নও থাকে না, তখন একমাত্র সুষুপ্তির অবস্থা। এই অবস্থায় বিদেহী আত্মা কারন-অজ্ঞানে আবদ্ধ থাকে। পূর্বেই বলেছি, এই কারণ-অজ্ঞান থেকেই মনের কল্পনা এবং সূক্ষ্ম জগৎ ও বাস্তব-পৃথিবীলোক (স্থূল-জগৎ) সৃষ্টি হয়। ঈশ্বরও মায়া-রূপ কারণ-অজ্ঞানের সাহায্যে ইচ্ছামাত্রে বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করেন। ঈশ্বরের সহকারিণী মায়াই

বিশ্বপ্রকৃতি। মায়াই কারণ-অজ্ঞান সমুদ্র। এই সমুদ্রে বাসনা-কামনার অসংখ্য তরঙ্গ সৃষ্টি হয় প্রথমে সূক্ষ্মাকারে ও পরে স্থূলাকারে ও বিশ্বচরাচরের আকারে। সৃষ্টির এটিই ক্রম, ধারা বা বিকাশস্তর।

কারণ-অজ্ঞানরূপ মায়ানিদ্রাতেই বিশ্বচরাচরের প্রতিটি জীব বা প্রাণী সুপ্ত। কিন্তু এই সুপ্তির যে'দিন শেষ হয় জীব মায়ানিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়, সে'দিনই তার জন্ম-মৃত্যুর চক্রগতি স্থির ও নিশ্চল হয় এবং সে তার যথার্থ-আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করে—

অনাদিমায়য়া সুপ্তো যদাজীবঃ প্রবুধ্যতে।
অজমনিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা॥

অনাদি মায়া কিনা অনাদিকাল ধরে 'অহং', 'মম'—'আমি' ও 'আমার' জীবের এই সীমাবদ্ধ মনোভাব চলে আসছে। এই সীমিত মনোভাবই স্বপ্ন। এই সীমায়িত মোহনিদ্রাগত সংসারী জীবাত্মাই সুপ্ত, কিন্তু যখন বিবেক-বিচারের সাহায্যে জীবাত্মা নিজের ভেদশূন্য ও বন্ধনশূন্য অবস্থা উপলব্ধি করে তখন সে সকল অবস্থার—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—ইহলোক, পরলোক ও অজ্ঞানলোক সকল-কিছুর পারে উপনীত হয় এবং জীবাত্মা থেকে মুক্ত হয়ে সে শিবত্বে ব্রহ্মস্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সর্বসংস্কারবর্জিত মায়াহীন অবস্থাই জীবাত্মার আপন স্বভাব ও স্বরূপ। অসংখ্য বাসনার ও ভোগের আকাঙ্ক্ষার জন্যই জীবের সংসার মোহবন্ধন। বন্ধন কিনা ইহলোকের ও পরলোকের চক্রপথের যাত্রী হওয়া; ইহলোক থাকলেই পরলোক এবং বাসনা ও প্রবৃত্তি থাক্‌লেই নির্বাসনা ও নিবৃত্তির আশা থাকে। তাই মানুষ প্রথমে ইহজগতে বা স্থূল-ভোগের জগতে বাস করে, তারপর স্থূলভোগে বিতৃষ্ণ হ'লে সূক্ষ্মভোগের জগতে যায় ও সেখানে মনের সাহায্যে সূক্ষ্ম-সংস্কার ভোগ করে। তারপর সে যায় নিবৃত্তির প্রথম স্তর কারণের অবস্থায়, কিন্তু সেখানেও প্রবৃত্তির বীজ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয় না। সেখানে সেভোগ করে না, কিন্তু ভোগের কারণ বা সংস্কার তার মধ্যে বীজাকারে থাকে। তারপর বিবেক-বিচারের সাহায্যে সে যায় বীজসংস্কার হীন আনন্দলোকে। এই আনন্দলোক আসলে লোক নয়, তা কেবল আনন্দ-স্বরূপেরই উপলব্ধি—'অদ্বৈতং পরমার্থতঃ। অদ্বৈত বা সর্বদ্বৈতহীন উপলব্ধির লোক 'সর্বভাববিকারবর্জিত'অবস্থা। এ'জন্যগৌড়পাদ বলেছেন : 'মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতং অদ্বৈতং পরমার্থতঃ'। দ্বৈত বা ইহলোক পরলোক, জাগ্রৎ- স্বপ্ন, মর্ত্য-স্বর্গ এ'সমস্তই দুই দুই জ্ঞান বা মায়া। এখানে 'মায়া' বলতে আমরা এ'দুটিকে সত্য

ব'লে গ্রহণ করি এবং পার্থিবসত্তাকে সত্য ব'লে গ্রহণ ক'রে মৃত্যুলোক বা পরলোকের ভয়ে ভীত হই। কিন্তু 'দ্বৈতাদ্ভয়ম্'—দুই থাকলেই ভয়ের সৃষ্টি। পৃথিবীলোক ভোগভূমি। ভোগভূমিতে আমরা শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ দিয়ে ঘেরা বিশ্বসৌন্দর্যকে জীবনের সর্বস্ব ও পরমার্থ ব'লে ভোগ করি, ভোগের পর পুনরায় পরলোকের যাত্রী হই এবং সেখানে বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর সূক্ষ্ম-সংস্কার ভোগ করি। তাই ভোগের আর শেষ নাই। শাস্ত্র বলে যে ভোগে শান্তি নাই, ত্যাগেই শান্তি। ত্যাগে অর্থে বাসনা-কামনার ত্যাগ। ত্যাগ এলে জীবাত্মা পরমামৃতরূপ আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখনই ইহলোক ও পরলোকে যাওয়া-আসার চিরসমাপ্তি ঘটে।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বলেছেন, মৃত্যু মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করলেও মৃত্যুর পর পরলোক সৃষ্টি করে এই আশা যে, ইহলোকের পর পরলোক এবং পরলোকেও থাকে জীবাত্মার সত্তা—যদিও তা সূক্ষ্ম ও ছায়াদেহ, আর সেই পরলোকবাসী বিদেহী আত্মাই পুনরায় জন্মগ্রহণ করে ইহলোকে ভোগভূমি পৃথিবীতে।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ আমেরিকার বিভিন্ন প্রেততত্ত্বের প্রতিষ্ঠানে ও বৈঠকে প্রেতলোক, প্রেততত্ত্ব, জীবাত্মার আতিবাহিক দেহ, প্রেতবৈঠক, প্রেতাত্মার সঙ্গে যোগাযোগ প্রভৃতি বিষয়ে ইংরাজীতে বক্তৃতা দেন। গতানুগতিক বিশ্বাস ও সকল রকম ভাবাবেগের সম্পূর্ণ উর্ধে থেকে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ যুক্তি ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই গ্রন্থে প্রতিটি বিষয়-বস্তুর আলোচনা করেছেন এবং বিভিন্ন সমস্যা ও সংশয়ের সমাধান করেছেন। বিভিন্ন আলোচনায় বিদেহী-আত্মার বিচিত্র কথা ও কাহিনী--বিচিত্র তত্ত্ব ও অবস্থার বর্ণনা করেছেন নিজের প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতা দিয়ে, শোনা কথা ও বই পড়ার তথ্যে বিশ্বাসী হয়ে তিনি এ'গ্রন্থে কোন আলোচনাই করেন নি।

কর্মের সংসারে মানুষ চিরদিন কর্ম করে, কিন্তু বন্ধন সৃষ্টি করে কর্মের ফল আকাঙ্খা ক'রে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই গীতায় কর্ম করতে নিষেধ করেন নি, নিষেধ করেছেন ফলের আকাঙ্খা করতে। তিনি বলেছেন, কর্মের সংসারে কর্ম করার অধিকার প্রতিটি মানুষেরই আছে, কিন্তু কর্মের ফলে আশা না করাই ভাল, কেননা ফল চাইলে সেই ফলের আকাঙ্খা পুনরায় কর্মের সংসারে নিয়ে আসে ও আবদ্ধ করে মানুষকে। পুনরায় চলতে থাকে জন্ম-মৃত্যুর পথে যাওয়া

বিশ্বপ্রকৃতি। মায়াই কারণ-অজ্ঞান সমুদ্র। এই সমুদ্রে বাসনা-কামনার অসংখ্য তরঙ্গ সৃষ্টি হয় প্রথমে সূক্ষ্মাকারে ও পরে স্থূলাকারে ও বিশ্বচরাচরের আকারে। সৃষ্টির এটিই ক্রম, ধারা বা বিকাশস্তর।

কারণ-অজ্ঞানরূপ মায়ানিদ্রাতেই বিশ্বচরাচরের প্রতিটি জীব বা প্রাণী সুপ্ত। কিন্তু এই সুপ্তির যে'দিন শেষ হয় জীব মায়ানিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়, সে'দিনই তার জন্ম-মৃত্যুর চক্রগতি স্থির ও নিশ্চল হয় এবং সে তার যথার্থ-আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করে—

অনাদিমায়য়া সুপ্তো যদাজীবঃ প্রবুধ্যতে।
অজমনিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা॥

অনাদি মায়া কিনা অনাদিকাল ধরে 'অহং', 'মম'—'আমি' ও 'আমার' জীবের এই সীমাবদ্ধ মনোভাব চলে আসছে। এই সীমিত মনোভাবই স্বপ্ন। এই সীমায়িত মোহনিদ্রাগত সংসারী জীবাত্মাই সুপ্ত, কিন্তু যখন বিবেক-বিচারের সাহায্যে জীবাত্মা নিজের ভেদশূন্য ও বন্ধনশূন্য অবস্থা উপলব্ধি করে তখন সে সকল অবস্থার—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—ইহলোক, পরলোক ও অজ্ঞানলোক সকল-কিছুর পারে উপনীত হয় এবং জীবাত্মা থেকে মুক্ত হয়ে সে শিবত্বে ব্রহ্মস্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সর্বসংস্কারবর্জিত মায়াহীন অবস্থাই জীবাত্মার আপন স্বভাব ও স্বরূপ। অসংখ্য বাসনার ও ভোগের আকাঙ্ক্ষার জন্যই জীবের সংসার মোহবন্ধন। বন্ধন কিনা ইহলোকের ও পরলোকের চক্রপথের যাত্রী হওয়া; ইহলোক থাকলেই পরলোক এবং বাসনা ও প্রবৃত্তি থাকলেই নির্বাসনা ও নিবৃত্তির আশা থাকে। তাই মানুষ প্রথমে ইহজগতে বা স্থূল-ভোগের জগতে বাস করে, তারপর স্থূলভোগে বিতৃষ্ণ হ'লে সূক্ষ্মভোগের জগতে যায় ও সেখানে মনের সাহায্যে সূক্ষ্ম-সংস্কার ভোগ করে। তারপর সে যায় নিবৃত্তির প্রথম স্তর কারণের অবস্থায়, কিন্তু সেখানেও প্রবৃত্তির বীজ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয় না। সেখানে সে ভোগ করে না, কিন্তু ভোগের কারণ বা সংস্কার তার মধ্যে বীজাকারে থাকে। তারপর বিবেক-বিচারের সাহায্যে সে যায় বীজসংস্কার হীন আনন্দলোকে। এই আনন্দলোক আসলে লোক নয়, তা কেবল আনন্দ-স্বরূপেরই উপলব্ধি—'অদ্বৈতং পরমার্থতঃ। অদ্বৈত বা সর্বদ্বৈতহীন উপলব্ধির লোক 'সর্বভাববিকারবর্জিত' অবস্থা। এ'জন্যগৌড়পাদ বলেছেন: 'মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতং অদ্বৈতং পরমার্থতঃ'। দ্বৈত বা ইহলোক পরলোক, জাগ্রৎ-স্বপ্ন, মর্ত্য-স্বর্গ এ'সমস্তই দুই দুই জ্ঞান বা মায়া। এখানে 'মায়া' বলতে আমরা এ'দুটিকে সত্য

ব'লে গ্রহণ করি এবং পার্থিবসত্তাকে সত্য ব'লে গ্রহণ ক'রে মৃত্যুলোক বা পরলোকের ভয়ে ভীত হই। কিন্তু 'দ্বৈতাদ্ভয়ম্'—দুই থাকলেই ভয়ের সৃষ্টি। পৃথিবীলোক ভোগভূমি। ভোগভূমিতে আমরা শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ দিয়ে ঘেরা বিশ্বসৌন্দর্যকে জীবনের সর্বস্ব ও পরমার্থ ব'লে ভোগ করি, ভোগের পর পুনরায় পরলোকের যাত্রী হই এবং সেখানে বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর সূক্ষ্ম-সংস্কার ভোগ করি। তাই ভোগের আর শেষ নাই। শাস্ত্র বলে যে ভোগে শান্তি নাই, ত্যাগেই শান্তি। ত্যাগে অর্থে বাসনা-কামনার ত্যাগ। ত্যাগ এলে জীবাত্মা পরমামৃতরূপ আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখনই ইহলোক ও পরলোকে যাওয়া-আসার চিরসমাপ্তি ঘটে।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বলেছেন, মৃত্যু মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করলেও মৃত্যুর পর পরলোক সৃষ্টি করে এই আশা যে, ইহলোকের পর পরলোক এবং পরলোকেও থাকে জীবাত্মার সত্তা—যদিও তা সূক্ষ্ম ও ছায়াদেহ, আর সেই পরলোকবাসী বিদেহী আত্মাই পুনরায় জন্মগ্রহণ করে ইহলোকে ভোগভূমি পৃথিবীতে।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ আমেরিকার বিভিন্ন প্রেততত্ত্বের প্রতিষ্ঠানে ও বৈঠকে প্রেতলোক, প্রেততত্ত্ব, জীবাত্মার আতিবাহিক দেহ, প্রেতবৈঠক, প্রেতাত্মার সঙ্গে যোগাযোগ প্রভৃতি বিষয়ে ইংরাজীতে বক্তৃতা দেন। গতানুগতিক বিশ্বাস ও সকল রকম ভাবাবেগের সম্পূর্ণ উর্ধে থেকে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ যুক্তি ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই গ্রন্থে প্রতিটি বিষয়-বস্তুর আলোচনা করেছেন এবং বিভিন্ন সমস্যা ও সংশয়ের সমাধান করেছেন। বিভিন্ন আলোচনায় বিদেহী-আত্মার বিচিত্র কথা ও কাহিনী--বিচিত্র তত্ত্ব ও অবস্থার বর্ণনা করেছেন নিজের প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতা দিয়ে, শোনা কথা ও বই পড়ার তথ্যে বিশ্বাসী হয়ে তিনি এ'গ্রন্থে কোন আলোচনাই করেন নি।

কর্মের সংসারে মানুষ চিরদিন কর্ম করে, কিন্তু বন্ধন সৃষ্টি করে কর্মের ফল আকাঙ্খা ক'রে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই গীতায় কর্ম করতে নিষেধ করেন নি, নিষেধ করেছেন ফলের আকাঙ্খা করতে। তিনি বলেছেন, কর্মের সংসারে কর্ম করার অধিকার প্রতিটি মানুষেরই আছে, কিন্তু কর্মের ফলে আশা না করাই ভাল, কেননা ফল চাইলে সেই ফলের আকাঙ্খা পুনরায় কর্মের সংসারে নিয়ে আসে ও আবদ্ধ করে মানুষকে। পুনরায় চলতে থাকে জন্ম-মৃত্যুর পথে যাওয়া

আসার লীলাখেলা। অবিশ্রান্তই চলে এই গতি। কিন্তু এই গতির বা যাতায়াতেরও শেষ আছে, শেষ আছে কর্মের আশা আসক্তির পারে গেলে। শ্রীকৃষ্ণ তাই বলেছেন 'ফলে সক্তঃ নিবধ্যতে', কৃপণাঃ ফলহেতবঃ', 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্'। গীতার বাণী হোল (২-৪৭-৬৫)—

'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি॥
যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।

*　　*　　*

বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥

কর্মানুষ্ঠানকে জগতের কল্যাণের জন্য ও পরহিতায় মনে করলে নিরাসক্তির ভাব সৃষ্টি হয় মনে। একেই ব'লে চিত্তশুদ্ধি। চিত্তের শুদ্ধি বলতে মনে সৃষ্টি হয় বৃত্তিহীন অচঞ্চল ভাব—যেমন তরঙ্গায়িত সমুদ্রের তরঙ্গ শান্ত হলে সমুদ্র হয় প্রশান্ত। সংকল্প-বিকল্পাত্মক মন স্থির হ'লে মন শুদ্ধচৈতন্যে রূপান্তরিত হয়। তখন চৈতন্যের সঙ্গে চৈতন্যের হয় মিলন। এই মিলনেই মানুষ পায় শান্তি; মানুষ পায় সংসার-বন্ধন থেকে মুক্তি। তখনই মানুষ লাভ করে মহামুক্তির আশীর্বাদ এবং জন্ম-মৃত্যুর কোন সমস্যাই আর তখন থাকে না। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ এই গ্রন্থে বারবারই পাঠক-পাঠিকাকে বলেছেন, যেমন দিন যায় ও রাত্রি আসে, যেমন সুখ যায় ও দুঃখ আসে, তেমনি জন্ম হয় ও মৃত্যু আসে। আলো-ছায়ার এই রহস্যময়ী খেলার আর শেষ নাই। তাই মৃত্যুলোকবাসী বিদেহী প্রেতাত্মাদের কৌতুকময়ী কাহিনীতে আকৃষ্ট না হ'য়ে প্রেতলোকের পারে—মহানিদ্রাময় অজ্ঞানরাজ্যের পারে সর্বাভরণহীন নিরাবরণ আত্মার দর্শনে জীবনকে কৃতকৃতার্থ করতে বলেছে বেদান্ত। অনেকে মনের কৌতুহল নিয়ে প্রেতাত্মা বৈঠকের আয়োজন করেন, বিদেহী-আত্মাদের ডেকে বিচিত্র প্রশ্নের অবতারণা করেন, প্রশ্নের উত্তরে কিছুটা তৃপ্তি ও অতৃপ্তির আশা-নিরাশার মনোভাব নিয়ে নিজেদের ব্যাপৃত রাখেন কিন্তু স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বারবার বলেছেন, বিদেহী-আত্মাদের কাউকে শান্তি ও মুক্তি দেবার ক্ষমতা নাই, যদি সান্ত্বনা দেয় তাও সান্ত্বনা দেয় তারা ক্ষণিকের জন্য, কেননা আশা ও নিরাশার বন্ধনে নিজেরাই তারা আবদ্ধ। তাছাড়া কামনা-বাসনার জালে পরলোকেও তারা আবদ্ধ থাকে। বদ্ধ আত্মা

কি কখনও মুক্তির আস্বাদ দিতে পারে? একমাত্র মুক্ত মহান্ আত্মারাই দিতে পারেন মানুষকে মহামুক্তির আশীর্বাদ; একমাত্র দেহাত্মা ও পরলোকাত্মার অতীত জ্ঞানবিগ্রহ পুরুষেরাই দিতে পারেন মানুষকে শান্তি ও সান্ত্বনা, কিন্তু সূক্ষ্মবাসনাবদ্ধ বিদেহী আত্মারা তা পারেন না। এ'সকলের চাক্ষুষ নিদর্শনও দিয়েছেন অভেদানন্দ মহারাজ আমেরিকায় থাকা-কালে বিভিন্ন প্রেতাহ্বান-বৈঠকে আমন্ত্রিত প্রেতাত্মাদের প্রশ্ন ক'রে ও তাদের প্রত্যক্ষ-সংস্পর্শে এসে।

তাই মৃত্যু মানুষের জীবনে একটি অপরিহার্য প্রহেলিকা—সে'কথা বলেছি মৃত্যু নির্মম, আবার হৃদয়বান! মৃত্যু মাতাপিতার আর্তনাদ, সন্তানের কাতর ক্রন্দন, বিধবার অশ্রুপাত, অর্থের ও ঐশ্বর্যের প্রলোভন কোন-কিছুর দিকেই দৃষ্টিপাত করে না, প্রাকৃতিক নিয়মের অবহেলা না করে করে যায় তার চিরাচরিত কর্তব্য! মৃত্যু যে আবার হৃদয়বান ও বন্ধু, সে'কথার প্রমাণ হয় যখন আমরা প্রাকৃতিক ক্রমবিকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করি। দৃষ্টিপাত করি স্থূল থেকে সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম থেকে কারণে ও কারণ থেকে মহাকারণের গতি ও ক্রমপরিণতির সোপানের দিকে এবং জড় বা অচেতন থেকে চৈতন্যের দিকে। অব্যক্ত থেকে ব্যক্তের দিকে লক্ষ্য করলে একথাই মনে হয়, মানুষ নিম্ন থেকে ঊর্ধগতি লাভ ক'রে অবিকশিত থেকে পূর্ণবিকাশের পথে ক্রমশ অগ্রসর হয়। গতি জীবাত্মার পূর্ণতার দিকে থাকেই—তবে মন্থর ও ধীর, কিংবা সচল ও দ্রুত। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন, নৌকা স্রোতের বুকে এগিয়ে চলেই, তবে ধীরে। আবার নৌকায় পাল তুলে দিয়ে ও দাঁড় টান্‌বে নৌকা আরও দ্রুত যায় ও লক্ষ্যে উপনীত হয় অবিলম্বে। মানুষের আত্মাও তেমনি যাত্রা শুরু করে ধীরে স্থূল ও অচেতন বস্তু থেকে, উপনীত হয় ক্রমে সূক্ষ্মে ও চেতনে এবং সেখানেও তার গতির শেষ না হ'য়ে সে আত্মসমর্পণ ক'রে চরমলক্ষ্যরূপে আত্মচৈতন্যে। এই আত্মচৈতন্যই মানুষ সকল প্রাণীর স্বরূপ ও চরমলক্ষ্য। তারা অবতরণ করে অচেতন ও অজ্ঞানের রাজ্যে বাসনা-কামনার জন্য। বাসনা-কামনার প্রলোভনই নিম্নমুখী ক'রে নিয়ে যায় আসক্তি ও ভোগের সংসারে এবং সেখানেই তারা আবদ্ধ থাকে মুক্তির আলোকের যতদিন না সন্ধান না পায় এবং আলোকের সন্ধান পেলে তারা মায়াপ্রহেলিকা ভেদ ক'রে অমৃতময় আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। মৃত্যুর প্রহেলিকা তখন আর থাকে না, মৃত্যুর আলেয়া তখন জীবাত্মাকে আর আকৃষ্ট করে না, জীবাত্মা জানতে পারে তখন নিজের

প্রকৃত স্বরূপ ও লক্ষ্যের কথা এবং জীবনসাধনার চরিতার্থের কথা, আর তখনই সে যায় সকল সন্দেহের ও সকল বন্ধনের পারে, মুক্তিময় হয় জীবন বাসনা-কামনায় ঘেরা মায়ারই সংসারে। মায়া তখন মহামায়ারূপে আত্ম স্বরূপের কাছে :আত্মসমর্পণ করে, দ্বৈতজ্ঞান ও ভ্রমজ্ঞান আর থাকে না—'জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে' বলেছেন জীবন্মুক্ত আচার্য গৌড়পাদ। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবও বলেছেন, মায়াকে জান্‌লে মায়া আর থাকে না। মায়া তখন ব্রহ্মে লীন হয়, ভ্রমজ্ঞান ও যথার্থজ্ঞান এই ভেদজ্ঞান তখন থাকে না—'অদ্বৈতং বুধ্যতে তদা', সুতরাং মৃত্যুলোক বা মরণের পারে মহামুক্তিতে মৃত্যু আর সমস্যা বলে মনে হয় না—বলেছেন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ। তখন সমস্যা একমাত্র মৃত্যুরূপ অজ্ঞানের পারে গিয়ে অমৃতময় আত্মস্বরূপকে জানা ও উপলব্ধি করা।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬
৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

॥ স্বামী অভেদানন্দ ॥

মরণের পারে

প্রথম অধ্যায়

আধুনিক বিজ্ঞান ও পরলোকতত্ত্ব ॥

গত ষাট বছর ধরে প্রেততত্ত্ব বেশ অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। এই অগ্রগতি আজ বহু বৈজ্ঞানিক মনকে মরণোত্তর সত্যোদ্ঘাটনে নিযুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। আমেরিকায় পরীক্ষামূলক প্রেততত্ত্বের গবেষণার সূত্রপাত হয় ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে। তারপরের বছর অসাধারণ প্রতিভাশালী ও বহুখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যর উইলিয়াম ক্রুক্স্‌, মিসেস ফ্লোরেন্স কুক্‌কে 'মিডিয়াম'-রূপে গ্রহণ ক'রে শুরু করেন তাঁর পরীক্ষা-নীরিক্ষার কাজ। মিডিয়ম সাহায্যে তাঁর সেই তিন বছরের পরীক্ষাকার্যের বিশদ-বিবরণ দেওয়া এখানে নিষ্প্রয়োজন। এই সময় তিনি সকল প্রকার সাবধানতা অবলম্বন করেন যাতে কোন প্রকার ভ্রান্তি, কল্পনা বা ভেক্কি এসে না পড়ে। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে কাজ ক'রে যান তিনি, আর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রও ব্যবহার করেন তাঁর কাজে। যাঁরা সত্যিই প্রেততত্ত্বের সত্যোদ্ঘাটনে একান্ত আগ্রহশীল ছিলেন এমন কয়েকজন বন্ধুদের নিয়ে তিনি প্রেতবৈঠক বসাতেন নিজেরই বাড়ীতে। মিসেস্‌ কুক্‌সের নিয়ন্ত্রণকারী প্রেতাত্মা 'কেটি কিং'-এর নামের সাথে বহু আমেরিকাবাসীরই পরিচয় ঘটে। সে নিজেকে বাস্তবরূপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছিলো। তার নাড়ীর গতি গণনা করা হয়, তার হৃৎশব্দ শোনা যায়, তার ছবি তোলা হয় ও সে তার বাস্তবকৃত কেশ উপস্থিতদের মধ্যে বিতরণও করে। আমাদের মনে রাখতে হবে, এ'সমস্ত ছিল কড়া পরীক্ষাবৃত্তির অনুশাসনে আবদ্ধ। তাঁর নিজের ঘরে যেখানে এই বৈঠক বসতো সেখানে এমনভাবে বৈদ্যুতিক ঘণ্টা লাগানো হয়েছিল যে বাইরের সামান্য ব্যাঘাত সেখানে প্রতিধ্বনিত হবে। স্যর উইলিয়ম ক্রুক্স্‌ও প্রথমে বিজ্ঞান-জগতের কাছে বিদ্রূপ অর্জন করেন। কিন্তু জানবার মতো সাহায্যও স্যর ক্রুক্স্‌ পেয়েছিলেন মিসেস্‌ কুক্‌সের চেয়েও। তাঁর পরীক্ষাকার্য সমানভাবেই চালিয়ে যান। মিষ্টার ডি. ডি. হোম নামে আর একজন মিডিয়মের সাহায্যও স্যর ক্রুক্স্‌ পেয়েছিলেন। মিসেস্‌ কুক্‌সের চেয়েও তাঁর প্রতিকূল প্রভাবকে প্রতিহত করার শক্তি ছিল বেশী। তাঁর অধিকাংশ বৈঠকই আবদ্ধ ঘরে বসতো না, বসতো খোলা জায়গায়, উন্মুক্ত আলোকে।

বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরলোকতত্ত্বের সাধনা ও গবেষণা করার উদ্দেশ্যে লণ্ডনে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সোসাইটি ফর দি সাইকিক্যাল রিসার্চ' নামে একটি সংসদ স্থাপিত হয়। সেই সংসদ সাধারণের কাছে 'এস.পি.আর.' নামে পরিচিতি লাভ করে। এই সংসদের নথিপত্র থেকেই জানা যায়, কি গভীর বিচক্ষণতা এবং কি অপূর্ব বৈজ্ঞানিক ধৈর্যই না ছিল এডমাণ্ড গারেন, ডাঃ এফ্. ডব্লিউ. এইচ. মায়ার্স, ফ্রাঙ্ক পোডমোর ও তাঁদের উত্তর সাধকদের মধ্যে। যাঁরা মায়ার্সের মহান্ কীর্তি "হিউম্যান পার্সোনালিটি এণ্ড ইট্‌স্ সারভাইভল আফটার বডিলি ডেথ" নামে গ্রন্থটি পড়েছেন তাঁরাও এ' কথার যাথার্থ্য স্বীকার করবেন।

আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস, রবার্ট ডেল আউয়েন, অধ্যাপক আক্সাকফ, রিচার্ড, হজ্সন্, হারভার্ডের উইলিয়ম জেম্স এবং ইংলণ্ডের বাকিংহাম ইউনিভার্সিটির অধ্যক্ষ স্যর অলিভার লজ প্রভৃতি অপরাপর বৈজ্ঞানিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা প্রেতের আবির্ভাব বিষয়ে সত্যকে আবিষ্কার করার জন্য কোন শ্রম—কোন কষ্ট স্বীকার করতে বিমুখ হন নি। তাঁদের সেই শ্রমসাধ্য কর্মের উল্লেখ ক'রে মরিস মেটারলিঙ্ক ঠিক কথাই বলেছেন ঃ

"অকাট্য প্রমাণ, লিখিত নথিপত্র এবং নির্ভরযোগ্য সূত্রের দ্বারা সমর্থিত না হ'লে কোন ঘটনাকে মেনে নেওয়া হ'ত না। এককথায় মানুষের সাক্ষ্য বা প্রমাণপঞ্জীর কোন যথার্থ মূল্য দেব না বলে মনস্থির না করলে—তাদের প্রয়োজনীয় অকাট্যতাকে অস্বীকার করা দুষ্কর"।[১]

আমরা সকলেই জানি, অধ্যাপক মায়ার্স—যিনি বহু বছর ধরে 'এস পি, আর.'-এর সভাপতি ছিলেন, তিনি তাঁর বন্ধুদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেন দৈহিক মৃত্যুর পর ফিরে আসবেন বলে। তিনি তাঁর পণ রক্ষা করেন, তাঁর মৃত্যুর একমাস পরে বিখ্যাত মিডিয়াম মিসেস টম্সন আবিষ্ট হন ও তাঁর মধ্য দিয়ে অধ্যাপক মায়ার্স স্যর অলিভার লজের সাথে সংযোগ স্থাপন করেন। প্রথমে কয়েকটি কথাতেই মায়ার্সের পরিচিতি প্রতিপন্ন হয়। বোঝা যায়, প্রকৃতই তিনি মায়ার্স, তিনি ছাড়া অন্য কেউ নন। তিনি বলেন তাঁর ভাব বা চিন্তাকে মিডিয়মের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্তি দান করা অত্যন্ত কঠিন। 'স্কুলের ছেলের ভার্জিলের প্রথম পদ অনুবাদ করার মতোই এরা আমার ভাবানুবাদ করেছে'। তাঁর তখনকার অবস্থা সম্বন্ধে তিনি বলেন, তাঁর মৃত্যু হ'য়েছে এটা বোঝার আগে পর্যন্ত তিনি মনে করেছিলেন একটি অজানা শহরে তিনি

১। আওয়ার ইটারনিটি

পথভ্রষ্ট হয়েছেন, এমন কি যাঁদের তিনি মৃত ব'লে জানতেন তাদের দেখেও ভেবেছিলেন সেটা তাঁর কল্পদর্শন।[২]

'এস. পি. আর.'-এর আমেরিকা শাখার (যার সহ-সভাপতি ছিলেন উইলিয়ম জেম্‌স) পরিচালক ডাঃ হজসন্‌ও প্রতিজ্ঞা করেন মৃত্যুর পর প্রত্যাগমন করবেন, আর মৃত্যুর এক সপ্তাহ পরে তিনি এসেওছিলেন। মিসেস পাইবার-এর মাধ্যমে তিনি 'স্বয়ং লিখন'-এর দ্বারা সংযোগ স্থাপন করেন। উইলিয়ম জেম্‌স্ সেখানের সেই সকল বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। হার্‌ভার্ডের উইলিয়ম জেম্‌স্ তাঁর নিজের ক্ষেত্রে ঠিক ঐ প্রতিজ্ঞাই করেন আর 'আমেরিকান ইন্‌ষ্টিটিউট অফ সায়েনটিফিক রিসার্চ'-এর সভাপতি ও মিচিগান বিশ্বলিদ্যালয়ের ফলিত-গণিতের পূর্বতন অধ্যাপক মিঃ সি. এন. জোন্‌স্-এর সাথে কথা বলে জেম্‌স্ তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষাও করেন। নিউইয়র্ক-পেপার্স-এ[৩] প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে মিঃ সি. এন. জোন্‌স্ এই সংযোগের বিশদ বিবরণ দেন। প্রথম-সংযোগ হয় ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের বাইশে অক্টোবর সন্ধ্যায়। তারপর এক এক ক'রে আরো পাঁচবার সংযোগ ঘটে। ১১ই মার্চ ১৯১১ তে হয় শেষ-সংযোগ। এইগুলিতে অধ্যাপক জেম্‌স্ তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় ব্যক্ত করতে যতদূর সম্ভব চেষ্টা করেন। মিঃ জোন্‌স্ ও অন্যান্য যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরাও সকলে উপস্থিত হন। অপরাপর কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়গুলির মধ্যে একটি হল অধ্যাপক জেম্‌স্-এর উক্তি: "আমি ধন্য যে এমন ব্যক্তিরা আছেন যাঁরা যথার্থই ইচ্ছুক যে তাঁদের কাছে যেন আমি আসি। আমি এই দয়াবান ব্যক্তিটির কথাই বলছি যিনি আমার পাশে দাঁড়িয়ে নিজেকে আমায় ব্যবহার করতে দিচ্ছেন। ইনি নিজে বেরিয়ে এসে দেহটি আমার ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। আমি এর জন্য কৃতজ্ঞ। আমি কোনভাবেই এটিকে ক্ষতিগ্রস্ত বা তাঁর ব্যবহারের অনুপযোগী করে ফেলতে চাই না"। শুনেছি অধ্যাপক জেম্‌স বন্ধুদের সাথে করমর্দনও করেন। স্যার অলিভার লজ্, মিসেস্ পাইপার ও অন্যান্য মিডিয়ামদের সাহায্যে নানা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পরীক্ষার পর অবশেষে স্বীকার করেন যে মৃত্যুর পরও জীবনের অস্তিত্ব থাকে। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে 'বৃটিশ এ্যাশোসিয়েসন'-এ সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন:

২। 'আওয়ার ইটারনিটি'
৩। টাইমস, ১০ ডিসেম্বর ১৯১১

"আমার সহকর্মী ও আমার নিজের প্রতি যথার্থ বিচার করলে আমাকে এটুকু বলার দুঃসাহসকে বরণ করতে হয় যে, শুধু প্রাপ্ত প্রমাণপঞ্জীর ওপর নির্ভর ক'রেই নয়, আজ যাকে অলৌকিক বলা হচ্ছে তাকেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যত্ন-সহকারে পরীক্ষা করা চলে এবং সুসংগতির স্বীকৃতিও দান করতে হয়। আমি পরিপূর্ণ সাহসের সঙ্গেই বলতে পারি, এই রকম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষিত বহু ঘটনাই আমাকে স্বীকার করিয়েছে যে, স্মৃতি এবং ভালোবাসা শুধু বস্তুর সাথেই সংশ্লিষ্ট নয়—যাতে তারা শুধু এখানে এবং এখনই মাত্র বিকশিত হতে পারবে। ব্যক্তিত্বের সত্তা দেহগত মৃত্যুর পর থাকে। আমার মনে হয়, ঘটনাগুলির সাক্ষ্য প্রমাণ করেছে যে, বিদেহী আত্মা বিশেষ-পরিবেশে আমাদের সাথে সংযুক্ত হতে পারে, সুতরাং বাস্তবতার দিক থেকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সীমায় এসে সে পৌঁছতে পারে।

বিখ্যাত ইংরাজ বৈজ্ঞানিক আলফ্রেড আর, ওয়ালেস বলেছেন :

"প্রেততত্ত্বকে প্রমাণ করার জন্য অধিক আর কোনই প্রমাণের প্রয়োজন নেই। কেননা বিজ্ঞান-সমর্থিত অপর আর কোনও সিদ্ধান্তের স্বপক্ষেই এর চেয়ে সুদৃঢ় প্রমাণ নেই"।

'ল অফ্ সাইকিক্ ফেনোমেন' গ্রন্থের গ্রন্থকার ডাঃ টমাস জে. হাড্সন বলেছেন : আজকের দিনেও যে প্রেততত্ত্বকে স্বীকার করে না, সে 'নাস্তিক ব'লে অভিহিত হবারও যোগ্য নয়, তাকে শুধু অজ্ঞ বলাই চলে।" কোমলি ফ্লেমোরিয়ন, ডব্লিউ, টি ষ্টিড্, অধ্যাপক হাইলপ্ ও এমন আরও অনেকে ঠিক একইভাবে স্বীকার করেছেন যে অশরীরী আত্মা আমাদের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, বিজ্ঞানের এই সমস্ত প্রসিদ্ধ সাধকেরাও আধুনিক প্রেততত্ত্বের মূলতথ্যকে আগেই স্বীকার করেছেন।

যদিও পেশাদার মিডিয়ামরা অনেক ক্ষেত্রেই শোচনীয়ভাবে প্রবঞ্চক প্রতিপন্ন হয়েছেন, তবুও বিশ্বস্ত মিডিয়ামও আছেন এবং এমন প্রেতাবতরণ ঘটে যাকে মনপঠন বলে ব্যাখ্যা করা চলে না, অশরীরী আত্মার যোগাযোগ বলেই মানতে হয়। অনেক সময় বৈঠকীরা পার্থিবস্তরের প্রেতাত্মাদের দ্বারা বিভ্রান্ত হন। বাস্তব-স্তরে অবতরণে অনেক সময় টেবিল উল্টে দেওয়া, খট খট শব্দ করা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে প্রেতাবতরণ বোঝা যায় কিন্তু এগুলি সবই নিম্নস্তরের প্রেতাত্মাদের কাজ। একে অনেকেই 'স্পিরিটিজম্' বলেন। এই প্রেততত্ত্ব আমাদের কৌতুহল-নিবৃত্তি ছাড়া কোন প্রধান সমস্যার সমাধান

করতে পারে না। কিন্তু যথার্থ প্রেততত্ত্ব এই 'স্পিরিটিজম্' বা ভৌতিকতা হতে ভিন্ন। উন্নত প্রেততত্ত্বের উৎপত্তি মরণোত্তর আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস হতে, তা আত্মার স্বরূপ ও ঈশ্বরের সাথে তার সম্বন্ধ ব্যক্ত করে।

এই প্রেততত্ত্বই জগতে প্রধান ধর্মগুলির মূল। তথাকথিত দেবদূত বা ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ—যাঁদের ভারতবর্ষে বলা হয় দেবতা,—তাঁদের সাথে সংযোগ স্থাপনই হ'ল প্রাচীন ও নিউ-টেষ্টামেণ্টের প্রবক্তা ও দ্রষ্টাদের জ্ঞান ও দিব্যপ্রেরণার উৎস! আব্রাহাম, জেকব এবং মোজেস-এর সময় থেকে যীশু ও তাঁর শিষ্যদের সময় পর্যন্ত বহু ঋষি ও সত্যদ্রষ্টারা বিদেহী আত্মাদের দেখেছেন, তাদের বাণী শুনেছেন ও তাদের শিক্ষা অনুসরণ করেছেন। ইহুদি ও খ্রীষ্ট-ধর্মের মতো অন্য ধর্মেও এই ব্যাপারই ঘটেছে। শুদ্ধ ও শ্রদ্ধাশীল চিত্তে অতীতেও যেমন এই সত্য প্রকাশিত হয়েছে, বর্তমানেও তেমনই প্রকাশিত হয়। ষ্টেনটন্ মোজেসের মিডিয়ামে প্রকাশিত প্রেততত্ত্ব কাহিনীর কথা যাঁরা পড়েছেন তাঁদের মনে পড়বে কেমন ক'রে উর্ধ্বস্তরের আত্মারা, ডক্টর, রেক্টর, ইম্পারেটরের নামে বাণী প্রেরণ ক'রে গোড়ামী ও কুসংস্কার থেকে মানুষকে মুক্ত হতে সহায়তা করতেন।

আমাদের মনে রাখতে হবে, 'ষ্টেনটন্ মোজেস' ছিলেন ইংলণ্ডের 'অ্যাংলিকান' সম্প্রদায়ভুক্ত একজন গোঁড়া পাদ্রী। তিনি ছিলেন অন্ধ রক্ষণশীল এবং চূড়ান্ত প্রাচীনপন্থী, অথচ তাঁরই মধ্য দিয়ে আসতো বাণী এবং এটি শুধু তাঁর নিজেরই নয়, সমস্ত খ্রীষ্টান জগতের এক বিরাট বিস্ময়-বিশেষ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

॥ মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব থাকে কিনা ॥

কাব্যধর্মী উপনিষদগুলির মধ্যে কঠোপনিষদ্ অন্যতম। 'দি সিক্রেট অব্ ডেথ' নাম দিয়ে এই গ্রন্থটিরই অনুবাদ করেছেন স্যর এড্উইন আর্নল্ড। গ্রন্থটির আরম্ভ এই প্রশ্ন নিয়ে :

কেউ কেউ বলেন, মানুষ মরলে চিরকালের মত লুপ্ত হ'য়ে যায়, আর কেউ কেউ বলেন, মরণের পরও মানুষ বেঁচে থাকে। এই কথাদুটির কোনটি সত্য এই প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে।'[১]

দর্শন, অধ্যাত্মতত্ত্ব, ধর্ম, বিজ্ঞান এই প্রশ্নের সমাধান কর্বার নানা চেষ্টা করেছে। আবার এমনও দেখা গেছে যে, এই প্রশ্ন চাপা পড়ে যাতে এ বিষয়ে অন্বেষণ কিছু না হ'তে পারে তারও চেষ্টা হয়েছে। এমন একটি দরকারী বিষয়ের প্রশ্ন নানা যুক্তি নিয়ে শত শত চিন্তাশীল মনীষীরা উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন।

ভারতে প্রাচীন কাল থেকে নাস্তিক্যবাদী ও জড়বাদী লোকেরা দেহের অবসানের পর আত্মার যে অস্তিত্ব আছে সে'কথা অস্বীকার করতেন। তাঁদের বলা হ'ত চার্বাক। তাঁদের মত ছিল : দেহই আত্মা; দেহ ছাড়া আত্মা ব'লে স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নাই; দেহের মরণের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার বিলুপ্তি ঘটে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় এমন কোন বস্তুকে তাঁরা বিশ্বাস করতেন না। তাঁদের নীতি ছিল :

"যতদিন বাঁচবে ভোগ হতে বঞ্চিত কোরো না নিজেকে। সুখে আরামে বেঁচে জীবনের আনন্দসুধা উপভোগ করে যাও। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করা মূঢ়তা ছাড়া কিছু নয়। তোমার যা দরকার তা যেমন করে হোক যোগাড় কর। অর্থ নেই তোমার? বেশ তো, ঋণ কর, না হয় ভিক্ষে করে জুটিয়ে নাও। মরণের পর কোনো কাজের জন্য কেহ দায় হবে না; তবে আর ভাবনা কিসের?'[২]

১। যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেঽস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে, এতদ বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ।—কঠ-উপনিষৎ ১।৩০

২। ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।
নৈব বর্ণাশ্রমাদীনং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ॥
চ * *
যাবজ্জীবেৎ সুখম্ জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতম্ পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।
—সর্বদর্শনসংগ্রহে বৃহস্পতিবাক্য

প্রায় সকল দেশেই এমনি ধরনের চার্বাক দেখা যায়। ওল্ড টেস্টামেণ্টে আছে, সলমন বলেছেন :

"যা মন চায় তাই কর। ফুর্তি ক'রে খাও দাও, আনন্দ কর। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুখে ঘর কর। যা করতে পার সকল শক্তি দিয়ে কর; কারণ, শেষ অবধি তো যেতেই হবে সেই কবরে। কাজ বলে—কৌশল বলে—জ্ঞান বলে কোন জিনিষ পরলোকে থাকে না।"

এইভাবে চিন্তাশীলদের দলের বিস্তার লাভ ঘটেছে ও তাদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। এদের বলা হয় নাস্তিক, বস্তুবাদী, জড়বাদী প্রভৃতি। এদের মতে আত্মাকে যাঁরা দেহ থেকে পৃথক সত্তা ব'লে ভাবেন তাঁরা হয় অবোধ বা গোঁড়া কুসংস্কারী, আর যাঁরা এঁদের মত অনুসরণ ক'রে চলেন তাঁরা চতুর ও বুদ্ধিমান। এঁদের অনেকেই আত্মা বলে কোন পদার্থকে বিশ্বাস করেন না। কোন যুক্তি এঁরা মানতে রাজী নন, কারণ ইন্দ্রিয় দিয়ে যা পাওয়া যায় না তার অস্তিত্ব তাঁরা স্বীকার করতে চান না। আত্মার অস্তিত্বের বিরুদ্ধে এঁরা বিস্তর বই লিখেছেন, কিন্তু তথাপি কি তাঁরা এই চিরন্তন প্রশ্নকে থামিয়ে দিতে পেরেছেন—মরণের পর কি থাকে? প্রায় সবার মনেই কি স্বতঃই জাগে না এই প্রশ্ন? আজও এই প্রশ্ন জাগে যেমনটি জাগতো হাজার হাজার বছর আগে, কেউ বন্ধ করতে পারে না তা কারণ আমাদের স্বভাবের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এই জিজ্ঞাসা।

সকল দেশে সকল জাতির পাপী, ভক্ত, পুরোহিত, যাজক, আমীর, ফকিরের মনে ঐ একই প্রশ্ন উঠেছিল, আর আজও আমরা সেই প্রশ্নের আলোচনা করে চলেছি; ভবিষ্যতেও এর নিবৃত্তি হবে বলে মনে হয় না। জীবন-সংগ্রামের ডামা-ডোলে কখনো কখনো এই প্রশ্ন একটু আড়ালে পড়তে পারে হয় তো; আরামে, বিলাসে, ভোগসুখের প্রাচুর্যের মধ্যে মগ্ন হ'য়ে গিয়েও এ' প্রশ্ন না জাগতে পারে। অনেক ভ্রান্ত যুক্তি দিয়েও ভুলিয়ে রাখতে পারি নিজেদের কিন্তু যখনই আমরা মৃত্যুর আকস্মিক আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করি, আমাদের কোন প্রিয়জনকে যখন দেখি মুমূর্ষ অবস্থায় তখন কি মনে মনে জাগে না এই প্রশ্ন—কী এই মৃত্যু? মরণের পরে মানুষ কোথায় যায়? মৃত্যুর পরও কি থাকে মানুষের সত্তা? সেই সুপ্ত প্রশ্ন তখন জেগে ওঠে, শান্তি নষ্ট করতে থাকে আমাদের মনের। কিন্তু প্রশ্ন আমাদের ফিরে আসে এক দুর্ভেদ্য, দুর্লঙ্ঘ্য প্রাকারে ধাক্কা খেয়ে। ক্ষীণচেতা অল্পধী যারা তারা থেমে যায় সেখানেই।

সে প্রাচীরটি আর কিছুই নয়, সেটি হচ্ছে এই ধারণা যে, আত্মা দেহ হতে জাত —জড়দেহেরই ফলস্বরূপ। যারা এই কঠিন বাধাকে অতিক্রম করতে পারে তারা বুঝতে পারে—মৃত্যুর পর আত্মা থাকে কিনা। কোন সময়ে কোন ব্যক্তি পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল; এ-থেকে প্রাচীনকালে মরণোত্তর ভবিষ্যৎ জীবনের অনুমান করার ধারার সূত্রপাত হয়েছিল। কিন্তু এতে আধুনিক মন তৃপ্ত হয় না। কোন লোকের কথাকে প্রামাণ্য বলে অবিশ্বাস করার দিন চলে গেছে। আমরা-আর শিশু নই, বেশ পাকা যুক্তি না পেলে এখন আর মন বিশ্বাস করে না। বিষয়টা আমরা গভীরভাবে দৃষ্টি দিয়ে দেখতে চাই। অলৌকিকতার ওপর আমরা আস্থা স্থাপন করতে পারি না। এখন বিষয়টিকে শিক্ষিত লোকেরা চান দার্শনিক, মনস্তাত্ত্বিক, আধ্যাত্মিক এবং বৈজ্ঞানিকভাবে দেখতে।

এখন বিচার করা যাক্—দেহই যে আত্মার সৃষ্টির কারণ একথার মধ্যে কোন যুক্তিযুক্ত বা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা আছে কিনা। মন, কি বুদ্ধি, কি আত্মা কতকগুলি পদার্থের সংযোগে সৃষ্ট[৩]—একথা যদি ধরে নেওয়া যায় তবু আর একটি প্রশ্ন এসে দাঁড়ায়। সেটি হচ্ছে এই সেই দেহের কারণটি কি? সেই শক্তি কোন্ শক্তি যা বিভিন্ন লোকের দেহ বিভিন্নভাবে গড়ে তুলছে আর সে ভেদের কারণই বা কি? বস্তুবাদী চার্বাকেরা বলবেন আমাদের এই দেহ পিতামাতাদের দেহ থেকে সৃষ্টি হয়েছে, সুতরাং পিতামাতারা যখন আমাদের দেহের সৃষ্টিকর্তা তখন তাঁদের দেহই আমাদের দেহসৃষ্টির কারণ।

কিন্তু এই উত্তর উপযুক্ত নয়, কেননা জড় দেহসৃষ্টির কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে বস্তুবাদীরা আর কতকগুলি জড়পদার্থের কথা বলেছেন, কাজেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে আর একটি প্রশ্নেরই বরং উত্থাপন করা হয়েছে। এখন জড়পদার্থের কারণ কি? এর উত্তরে বলব কি যে, পিতামাতার শরীর! পিতামাতার শরীরও তো কতকগুলি জড়পদার্থের সমষ্টি। কাজেই জড়ের কারণ জড় এবং এ'ভাবেই একটার পর একটা প্রশ্নই চলতে থাকবে, উত্তর আর দেওয়া হবে না। তাতে বরং অনন্তকাল পরে অমীমাংসিত প্রশ্নেরই জের চলতে থাকবে, সমাধান আর হবে না। আত্মার সৃষ্টির কারণের এই যে উত্তর, অর্থাৎ দেহ থেকেই আত্মার সৃষ্টি হয়—এই ধরণের যে উত্তর, যেই কার্য থেকেই

৩। স্বামী অভেদানন্দের 'সেলফ্ নলেজ' বা 'আত্মজ্ঞান'-গ্রন্থে 'চৈতন্য ও পদার্থ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

কারণের সৃষ্টি হয়—সেই রকমেরই উত্তর। প্রশ্নের উত্তর তো দূরের কথা প্রশ্নের প্রবাহই তাতে চলতে থাকে।

আধুনিক শরীরতত্ত্ববিদ্, চিকিৎসক ও অন্যান্য বস্তুবাদীরা বলেন, আমাদের দেহ কতকগুলি পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত, আর বুদ্ধি, চেতনা, মন অথবা আত্মা জড়দেহ থেকে উৎপন্ন। তাঁরা বলেন, চিন্তা বা জ্ঞান মস্তিষ্কের ক্রিয়াজাত। প্রতিটি বিশেষ চিন্তা মস্তিষ্কে বিশেষ বিশেষ অংশের ক্রিয়াপ্রসূত—এই কথাও বলেন তাঁরা। এ'ছাড়া তাঁরা বলেন, প্রত্যেকটি বিশেষ ধরনের চিন্তার সৃষ্টি হয় মস্তিষ্কের বিশেষ একটি অংশ থেকে। আমরা যখন কোন বস্তু দেখি, অথবা দেখা জিনিষের কথা ভাবি তখন বুঝতে হবে আমাদের মস্তিষ্কের নয়নাংশের স্নায়ুসমূহের বিশেষভাবে স্পন্দন সৃষ্টি হয়েছে। তেমনি শ্রবণ-স্নায়ুগুলির সক্রিয়তার ফলে শোনার কাজটি হয়ে থাকে।

যে সব আধুনিক বিজ্ঞানীরা বলেন; চিন্তা মস্তিষ্কসৃষ্ট ফল, তাঁরা মনকে মস্তিষ্কের সহপরিণামী বলে ভেবে থাকেন। অর্থাৎ তাঁদের মতে, মস্তিষ্কের কাজ ফুরিয়ে গেলেই মনের কাজও ফুরিয়ে যায়, আত্মা ব'লে স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নেই সুতরাং মরণের পর জীবনের কোন কথাই উঠতে পারে না। আত্মার সত্তা এঁরা মোটেই মানেন না। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ বন্ধ হলেই অনুভূতি ও চেতনা লোপ পায়। অনেকের মতে, মস্তিষ্কযন্ত্রের ক্রিয়ার ফলে চেতনা প্রভৃতি মনের উপাদানগুলির উদ্ভব হয়। কেউ কেউ বলেন, পাকস্থলী থেকে যেমন পরিপাকশক্তির, যকৃৎ থেকে যেমন পিত্তের উৎপত্তি, মস্তিষ্ক থেকে তেমনি চিন্তা ও চেতনার সৃষ্টি। খাদ্যসামগ্রী যেমন পাকস্থলীতে পড়বার পর অন্য জিনিষে রূপান্তরিত হয়, মাথার বস্তুও তেমনি স্নায়ুমণ্ডলীর সংস্পর্শে ভাব, চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা, বাক্য প্রভৃতিতে পরিণত হয়। তা হলেই দেখা যাচ্ছে, মন অথবা আত্মাকে মস্তিষ্কের রস-নির্যাস বলা যেতে পারে। তাই মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় হ'য়ে গেলে আত্মারও নাশ হয়। মোটকথা তাঁদের মতে, মনের বৃত্তি বা সংস্কারগুলি হল খাদ্য-সামগ্রী বিশেষ, সুতরাং তারা জড় এবং দ্রষ্টা মন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অন্যতম বিখ্যাত বস্তুদার্শনিক বুক্‌নার বলেন ঃ "চিন্তাশক্তিকে সাধারণ স্বাভাবিক ক্রিয়া বা গতির একটা বিশেষ রীতি বলতে হবে"।

জে. লুইস. (J Luys) বলেন ঃ "একটা ধাতব-দণ্ডকে জলন্ত চুল্লীতে রাখলে সেটা যেমন ক্রমে উত্তপ্ত হতে না হতে ফিকে লাল থেকে ঘোর লালে,

ঘোর লাল থেকে সাদা রং পায়, জীবন্ত জীবকোষগুলিতেও তেমনি উত্তেজক বস্তুর উত্তেজনা বৃদ্ধির সংগে সংগে বাড়তে থাকে সূক্ষ্ম অনুভূতি।”

পার্সিভাল লোয়েল বলেন: “আমাদের মনে যখন কোন আইডিয়া বা ধারণা আসে তখন ব্যাপারটা হয় এই রকম: আণবিক পরিবর্তনের স্নায়ুশক্তি-প্রবাহ স্নায়ুগুলির মধ্য দিয়ে গিয়ে গ্রন্থিগুলিতে পৌছায়, সেখান থেকে শেষে যায় বহিস্থঃ কোষসমূহে। এই শক্তি ঐ বহিস্থঃ কোষসমূহে পৌছে আর একদল পরমাণু দেখতে পায়; এরা কিন্তু ঐ বিশেষ পরিবর্তনে অভ্যস্ত নয়। উপরোক্ত শক্তিস্রোত এখানে এসে বাধা পায়, আর এই বাধা অতিক্রম করবার চেষ্টায় কোষসমূহ জ্যোতির্ময় হ'য়ে ওঠে। কোষসমুহের এই যে একটা শ্বেত আভায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠা, একেই বলা যেতে পারে ‘চৈতন্য’। সংক্ষেপে বলতে গেলে—চৈতন্য স্নায়ুজ্যোতিঃ।”

যে সব পাশ্চাত্য জড়বাদীরা মনে করেন, দৈহিক রূপান্তরিত হয় ভাব, চিন্তনা, অনুভাবনা প্রভৃতি, মানসিক ক্রিয়ায়, তাঁরা বর্ণনাও করেন—কেমন ভাবে তা হয়। হাবার্ট স্পেনসার একজন এই শ্রেণীর জড়বাদী বৈজ্ঞানিক। তিনি এই মতের সমর্থক, তবে তিনি ওই রীতির ব্যাখ্যা বা বর্ণনা করেন নি। তিনি এটিকে একটি রহস্যময় ব্যাপার ব'লে ছেড়ে দিয়েছেন। এর মানে এই যে, মনের ধারণাগুলির রূপান্তর ঘটে থাকে, তবে কিভাবে ঘটে তা তিনি জানেন না। হার্বাট স্পেন্সার মস্তিষ্ককেই আত্মা ব'লে মনে করেছেন। একে তিনি তুলনা করেছেন পিয়ানোর সঙ্গে। তিনি বলেছেন: “আমাদের আইডিয়া অর্থাৎ ধারণা বা চিন্তাগুলো হচ্ছে পিয়ানোর মধ্যে স্থিত পরস্পর পাশাপাশি সাজানো সুর আর তালের মতো। ওদের কতকগুলো যখন সজীব সক্রিয় থাকে অন্যগুলো তখন নিষ্ক্রিয় হ'য়ে যায়। এই নিষ্ক্রিয় আইডিয়ার সুর-তালগুলো পিয়ানো অর্থাৎ মস্তিষ্কের (আত্মার) ভেতরেই থাকে।”

কিন্তু এ'কথা বলতেই হবে, শ্রদ্ধেয় স্পেনসার মনে রাখেন নি যে, পিয়ানো আপনি বাজে না, এটিকে বাজাতে হ'লে একটি লোকের দরকার হয়। এই হিসাবে স্পেনসারের তুলনা অসংগত ও অপূর্ণ। এর চেয়ে বরং তিনি যদি এমন মনে করতেন যে, এই মস্তিষ্ক হতে মন বা আত্মা ভিন্ন, আর এই মন বা আত্মাই সমস্ত মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রীকে ঝংকৃত করে তাহ'লে তাঁর উপমা সংগত হত বলে মনে হয়।

অধ্যাপক ডবলিউ. কে. ক্লিফোর্ড নামে আর একজন বস্তুবাদী দার্শনিক ও

এই দেহশক্তির সমন্বয়ে মনের বা আত্মার উৎপত্তির কথা বিশ্বাস করেন। তিনি বলেন : "চৈতন্য নামক পদার্থটি বড় জটিল, কতকগুলি জড়বস্তুর মিশ্রণে এর উদ্ভব। এ বস্তুগুলি হচ্ছে অনুভূতিসমষ্টি। এই অনুভূতিগুলি মিলে একটি ধারা বা প্রবাহের সৃষ্টি হয়। একেই চেতনাপ্রবাহ বলা যেতে পারে। কারণ, চৈতন্যের মধ্যে প্রত্যেকটি অনুভূতির মতো মস্তিষ্কের স্নায়ুবার্তারও সত্তা আছে। মস্তিষ্কের ক্রিয়া বড় জটিল, এর ক্রিয়া কতকগুলি উপাদানের সংযোগের ফলে সৃষ্টি হ'য়ে থাকে। সেগুলি হচ্ছে স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়া। চৈতন্যধারার প্রতিটি অনুভূতির সংগে সংগে মস্তিষ্কে একটি করে স্নায়ুস্পন্দনের ক্রিয়া হ'য়ে থাকে। আর যদি ঠিক এই ধরনের একটি যোগাযোগ প্রাতষ্ঠিত হয় আধ্যাত্ম-শরীরের সংগে ; তবে তা থেকে বুঝতে হবে যে, সাধারণ পার্থিব-শরীরের সংগে সংগে অধ্যাত্ম-শরীরেরও মৃত্যু অনিবার্য।"

তা হলেই দেখা যাচ্ছে, যে সমস্ত বস্তুতান্ত্রিক দার্শনিকরা মস্তিষ্ক থেকে অথবা পার্থিব-শরীর থেকে পৃথক আত্মার সত্তা স্বীকার করেন না তাঁরা উৎপত্তিবাদ বা সংহতবাদের দোহাই দিয়ে মন ও চৈতন্যকে জড়বস্তু বা জড়বস্তু-সমষ্টি থেকে সৃষ্ট পদার্থরূপে প্রতিপাদন করতে চেষ্টা করেন।

ভারতেও চার্বাকগণ ঐ মত প্রচার করেছিলেন। তাঁরা স্থূলশরীর হতে আত্মার সত্তার কথা বিশ্বাস করতেন না। বৌদ্ধদেরও অভিমত ছিল এই রকম। তাঁরা বলতেন, জড় দেহই মন ও বুদ্ধির কারণ ; অচেতন পদার্থের সংযোগের ফলেই চৈতন্যবস্তুর উৎপত্তি। তাঁরা নির্দিষ্ট কতকগুলি পদার্থের রাসায়নিক মিশ্রণের ফলে মদ্যের মাদকতাশক্তির উদাহরণের কথা উল্লেখ করেন চৈতন্যসৃষ্টির প্রসংগে।

বেদান্ত কিন্তু এই জড়বাদী মতের খণ্ডন করেছেন। বেদান্তের মতে, বস্তু বা পদার্থ বিশ্বের অর্ধাংশ মাত্র ; অপরার্ধ হ'ল মন বা আত্মা। একটি হতে আর একটার উৎপত্তি নির্ণয় করা অসাধ্য।[৪] বস্তু ও শক্তির জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই যে, বস্তু বা শক্তিকে চৈতন্যের সাহায্য ব্যাতিরেকে জানা যায় না ; এগুলি স্বয়ংবোধ্য নয়। কোন জিনিস জানা মানে মনের অবস্থার রূপান্তর হওয়া। আমরা যখন বলি—বস্তুর সত্তা আছে তখন আমরা একটা বিশেষ মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করি, তার বেশী আর কিছু জানাবার উপায় আমাদের নেই। মন নিজেকে ছাড়িয়ে কোথাও যেতে পারে না। আমরা

৪। স্বামী অভেনানন্দের 'সেলফ্-নলেজ' বা আত্মজ্ঞান' গ্রন্থে চৈতন্য ও পদার্থ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য

যখন অনুভব করি, আত্মা বা মন মস্তিষ্কেরই ক্রিয়াফল তখন আর একটি মন বা জ্ঞাতার কথা মেনে নিতেই হয়। তা নইলে মস্তিষ্কের সে-ক্রিয়া-সম্বন্ধে সচেতন হওয়া যেতে পারে কেমন করে? যে কোন জ্ঞান-জ্ঞাতার চৈতন্য বা আত্মসচেতনতার ওপর নির্ভর করে। সুতরাং সেই সচেতনতা বা জ্ঞানের বিষয় অস্বীকার করা অসংগত বই কি? জন স্টুয়ার্ট মিল সত্যই বলেছেন, মানুষের মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার ক'রে যখন আমরা দেখি, আত্মা বা মন ব'লে কোন পদার্থের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না, সুতরাং আত্মার সত্তাকে অস্বীকার ক'রে বলি আত্মা বা মন মস্তিষ্ক থেকেই সৃষ্টি-হয়েছে, তখন কিন্তু একটি কথা ভুলে যাই যে, আত্মাকে অস্বীকার করা মানে আর একটি পৃথক আত্মা বা মনের সত্তাকে আমরা স্বীকার করি। জড়বস্তু মস্তিষ্ক বা যে-কোন পদার্থের জ্ঞান যখন আত্মচৈতন্যের ওপর নির্ভর করে তখন সেই আত্মচৈতন্যের পূর্বসত্তাকে আমরা কখনই অস্বীকার করতে পারি না। আত্ম-চৈতন্যই সকল পার্থিব-জ্ঞানের আধার এবং ওই আত্মচৈতন্যের মাধ্যমেই আমরা জড়বস্তু বা জড়বস্তুর সমষ্টি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করি।

জি. জে. রোমেন্স বলেন: "যে মন বিষয়বস্তুর চিন্তা করে বা করতে পারে তার কথা বাদ দিয়ে বাহ্য প্রকৃতির আর কোন ব্যাপারের কথা ভাবাই যায় না। সুতরাং আমাদের ক্ষেত্রে অন্তত প্রত্যেক বিষয়েরই পূর্ব-মনের সত্তার কথা স্বীকার্য। এটাই হ'ল আমাদের জীবনরীতি, আর সব কিছুই বুঝতে হবে এর আলোকে বা মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। তাই মনকে দৈহিক ক্রিয়ার ফল বল্‌লে বলতে হয় যে, ওটি একটি গোলমেলে প্রতিশব্দ ছাড়া অন্য কিছুই নয়, ওটি তার নিজেরই ক্রিয়া। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, জড়বাদীর মত দাঁড়াতে পারছে না।"[৫]

আধুনিক বিজ্ঞানের মতে, গতি গতিরই সৃষ্টি করে, অন্য কিছু নয়। তাহলে আণবিক গতির ফলে যে চেতনা ও বুদ্ধির উদ্ভব হয়, সে-ব্যাপার ব্যাখ্যা করা যাবে কি করে? এই চেতনা বা বুদ্ধি তো আর গতি নয়। তাই বেদান্তদর্শনের মতে, চেতনার কারণ কখনো জড়বস্তু হ'তে পারে না, চেতনা স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও বস্তু-নিরপেক্ষ। যাকে বস্তু বলা হয় তার মাধ্যমে, তার ভেতর দিয়েই চৈতন্য প্রকাশ পায়।

৫। রোমেন্স: 'মাইণ্ড এ্যাণ্ড মেসিন এ্যাণ্ড মনিজম্,' পৃঃ ২১।

অন্যতম বিখ্যাত দার্শনিক শিলার (Schiller) বলেন : "বস্তু চেতনাকে সৃষ্টি করে না, তাকে সীমায়িত করে মাত্র"।

অন্যান্য জড়বাদী দার্শনিকদের মত হচ্ছে : 'আত্মার সত্তা সম্বন্ধে মানুষের যে ধারণা তাকল্পনার সৃষ্টি ছাড়া অন্য কিছু নয়।"

ক্যাণ্ট বলেন : "আত্মার গঠন ও রূপকে আত্মা ব্যতীত অন্য কোন বস্তু দিয়ে কিছুই জানা যাবে না, কেননা আত্মার গঠনোপাদান আত্মা থেকে ভিন্ন নয়"।

কোন কোন ভারতীয় বৌদ্ধ-দার্শনিকের মতো ডেভিড হিউমও মনে করতেন, মানুষের আত্মা কতকগুলি অনুভূতি ও ধারণার সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি বলেছেন :

"আমি যখন একান্তভাবে আপনাকে পাই তখন শীত-উষ্ণ, আলো-ছায়া, প্রীতি-বিদ্বেষ, সুখ-দুঃখের অনুভব করি। যখন আমার সে জ্ঞান থাকে না— যেমনটি ঘটে সুষুপ্তিতে, তখন আমার আমিত্ব-বোধ যায় লোপ পেয়ে। মরণ যখন ঐ-সব জ্ঞান একেবারে অপহরণ করে তখন আমারও ঘটে বিলুপ্তি। কিছুই তখন ভাবি না, অনুভব করি না, দেখিনা, ভালবাসি না বা ঘৃণা করি না। কাজেই পরিপূর্ণ অনস্তিত্ব এর চেয়ে আর বেশি কি হ'তে পারে?

ডেভিড হিউমের মতে, প্রতিদিনের নিদ্রায় আত্মার মৃত্যু হয়। মানব-আত্মার প্রকৃতির এই ব্যাখ্যা ক'জন গ্রহণ করেন জানি না।

প্রত্যক্ষবাদীরা মস্তিষ্ক, হৃদযন্ত্র ও পাকস্থলী বিশ্লেষণ ক'রে আত্মাকে দেখতে চান ; এগুলির মধ্যে না পেলে এর অস্তিত্ব তাঁরা স্বীকার করতে চান না। কিন্তু প্রাচীনকাল থেকে এইরূপ মতবাদ প্রচলিত থাকলেও ঐ-সব যুক্তিতে কি জিজ্ঞাসা তৃপ্ত হয়? মন তবু যেন মান্‌তে চায় না যে, মরণের সংগে সংগে জীবনের সব বৈশিষ্ট চিরকালের জন্য লুপ্ত হ'য়ে যাবে। বিবেক-বিচার ও বুদ্ধি ও-যুক্তি এবং সমাধানের মধ্যে কোন সান্ত্বনা পায় না। সত্য কাকে বলবো? যা চিরকাল থাকে তাই সৎ বা সত্য। স্বত্তাবস্তুর অস্তিত্ব যদি আজ সত্য হয় তো অনন্তকাল তা সত্য থাকবে।

আত্মাকে যদি জড়বস্তু থেকে স্বতন্ত্র সত্তা বলে না মানা হয় তা'হলে জীবনের বহু বিষয়ের তাৎপর্য ঠিক অবগত হওয়া যায় না, তাতে ইউরোপ ও আমেরিকার পরলোকতত্ত্ব গবেষণা-সমিতিগুলির প্রকাশিত বিবরণ বা ব্যাপারগুলির ব্যাখ্যাও করা যায় না। অনেক ঝানু নাস্তিক ও বস্তুবাদী

কখনো-কখনো নির্জন কক্ষে কৌচে বা আরাম-কেদারায় বিশ্রামকালে তাঁদের দ্বিতীয় একটি সত্তাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। এমনও হয়েছে যে, এই সব দ্বিতীয় সত্তাকে কথা কইতে, চলতে ও অন্যান্য কাজ করতে দেখা গেছে। তবে কেমন করে বোঝা যাবে এই সব ব্যাপার? ভারতে যোগীদের দ্বিতীয় সত্তার আবির্ভাবের কথা শোনা যায়। কেউ কেউ এগুলিকে দৃষ্টিভ্রান্তি বল্‌তে চেয়েছেন। কিন্তু পরখ ক'রে দেখার পরও ওগুলির অস্তিত্ব থাকলে, তা তো বলা যাবে না। দ্বিতীয় সত্তার আবির্ভাবের অনেক পরীক্ষিত উদাহরণের নাম করা যায়। ধরুন, রাতের বেলা কোন লোক ভেতর থেকে তালা বন্ধ ক'রে ঘরের মধ্যে বসে আছেন; তিনি কোন দরকারী বিষয়ে কি গণিতের তত্ত্বচিন্তায় ব্যাপৃত এমন সময় তিনি যদি দেখেন, ঠিক তাঁরই মতো একটি লোক চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর কিছু লিখছেন, আর সেই-লেখায় যদি তাঁরই বহু-চিন্তিত সমস্যার সমাধান থাকে, তা'হলে এ ব্যাপারটি কি বলতে হবে? এটিকে কি রকমের বুদ্ধিভ্রান্তি বলা যাবে? মানস-দৃষ্টি বা টেলিপ্যাথি বললে তো বিষয়টি পরিষ্কার হবে না। কেউ কেউ হয়তো বলবেন—এটি একটি বানানো গল্প, কিন্তু সে-কথা বলে তো আর ব্যাপারটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কোনো বিষয়কে অস্বীকার করলেই যে তার প্রকৃতি বদলে যায় এমন কথা নয়। এ সমস্ত ব্যাপার বোঝা সহজ হবে আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা মানলে। বিজ্ঞানের মতে; যে থিওরি বা মতবাদ অনেক ব্য পারকে বুঝতে সাহায্য করে তাই সত্য। যাঁরা কোন্ জিনিস থেকে কোন্ জিনিসের সৃষ্টি হয় (প্রোডাক্‌সন থিওরি), বা কতকগুলি উপাদানের একত্র-মিলনে কোন জিনিস উৎপন্ন হয় (কম্‌বিনেসন থিওরি) একথা বিশ্বাস করেন তাঁদের দৃষ্টি এদিকে পড়ে না। কিন্তু যাঁরা সংস্করণবাদ (ট্রান্সমিসন থিওরী) স্বীকার করেন অথবা অন্যভাবে বলা যায়, যাঁরা বিশ্বাস করেন যে মানুষের মস্তিষ্ক একটি যন্ত্র-বিশেষ, তার ভেতর দিয়ে যাবতীয় শক্তির বিকাশসাধন করেন আত্মা, তাঁদের কাছে মানুষের দ্বিতীয় সত্তার রহস্যটি বিশেষ জটিল নয়। সংস্করণবাদে বিশ্বাস করলেই সৃষ্টিবাদের মধ্যে যে-সব জটিলতা থাকে সে-সব দূর হ'য়ে যায়। সুতরাং যাবৎ অন্য কোন উপযুক্ততর থিওরি বা মতবাদ না পাওয়া যাচ্ছে তাবৎ আত্মার দেহ-নিক্ষেপ-সত্তার মতবাদ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। মস্তিষ্কটি একটি যন্ত্র, এর মধ্যে দিয়ে আত্মার শক্তির বহিঃপ্রকাশ—এ'কথা মানলে দ্বিতীয় সত্তার সবকিছু ব্যাপার ভালো ক'রে ব্যাখ্যা করতে পারা যায়।

মৃত্যুর পর কোন-কোন লোক বন্ধুকে দেখা দিয়েছেন এমন দৃষ্টান্তও আছে। ভারতে, য়ুরোপে, সবদেশেই এমন হয়েছে। সন্তান-সন্ততিদের রক্ষণাবেক্ষণে অথবা অপর কোন সংবাদ দেবার জন্যই ঐরকম আবির্ভাব হ'তে দেখা যায়। এর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবার জন্যে প্রেততাত্ত্বিকসংসদে যাবার দরকার হয় না। অনেকের ব্যক্তিগত জীবনে নিজের বাড়ীতে এমন ব্যাপার হতে শোনা যায়। আর সে-সব ব্যাপার পরীক্ষা করে দেখা হয়নি এমন নয়।

অনেক প্রেতাহ্বায়কসংসদে এই পারলৌকিক আত্মার আগমন বিষয়ে অনেক জালিয়াতী থাকে। বহু জালিয়াৎ এই নিয়ে ধরা পড়েছে বহু জায়গায়। এই ব্যাপারটিকে অনেকে টাকা রোজগার করবার ফন্দী হিসাবে নিয়েছেন।

ভারতে হিন্দুরা সাধারণতঃ পেশাদার মিডিয়ামে বিশ্বাস করেন না। তাঁদের অভিমত হচ্ছে…টাকা নিয়ে এ'সব করা গর্হিত। বেচারী প্রেতাত্মাদের নিয়ে খেলা ক'রে অর্থোপার্জন করা একটা অন্যায় কাজ। এখন যে সমস্ত প্রেতাত্মারা তোমাদের কাছে আসে তাদের উপলক্ষ্য করে কেনই বা তোমার জীবিকা উপার্জনের ব্যবস্থা করো ? আমাদের মনে হয় সাধারণ ভিক্ষাজীবী ফকিরেরাই ঐসব কাজ করে। যদিও অনেক মিডিয়ামের জাল-জালিয়াতী ধরা পড়েছে এবং অনেক প্রেতাত্মার আবির্ভাবটাও নিছক ঐন্দ্রজালিক খেলা বলে জানা গেছে তাহলেও এ'কথা ঠিক যে ঐ সব মিথ্যা প্রতারণার জন্য মরণের পরে দেহাতিরিক্ত যে আত্মার অস্তিত্ব থাকে তা অস্বীকার করা যাবে না।

এখন প্রশ্নটি হচ্ছে, মরণের পর আত্মা ব'লে যদি কোন জিনিস থাকেই তা'হলে সে তার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখ্তে পারে কি ? বেদান্তদর্শন বলে, হ্যাঁ, তা পারে। যে-সব পাশ্চাত্য দার্শনিক বলেন, হিন্দুধর্মের উচ্চতম আদর্শ হল আত্মার বিলুপ্তি-সাধন তাঁরা হিন্দুধর্মের কিছু জানেন বলে মনে করা চলে না। ঐ সব উক্তি থেকে তাঁদের অজ্ঞতাই প্রমাণিত হয়। মনে হয়, ঐ দার্শনিকেরা খ্রীষ্টান মিশনারীদের কাছ থেকে ঐ-রকম ধারণা পেয়েছেন। আর খ্রীষ্টান মিশনারীরা তো একমাত্র নিজেদের ধর্মে ছাড়া কোথাও কিছু ভাল দেখতে পান না। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র যদি অভিনিবেশ করে পড়া যায় তাহলে দেখা যাবে কোথাও মৃত্যুর পর আত্মার ধ্বংসের কথা নেই। বরং ঠিক তার বিপরীত মতটিই পাওয়া যাবেঃ আত্মা হচ্ছে অনন্ত ও অমর। ভগবদ্গীতায় আছে ঃ

"মানুষের আত্মা অবিনাশী ; অস্ত্রের দ্বারা একে ছেদন করা যায় না,

আগুনে একে পোড়ান যায় না ; বাতাস একে শুকিয়ে ফেলতে পারে না ; আর জলেও একে ভেজানো যায় না"।[৬]

"একে (আত্মাকে) যিনি হন্তা বা হত মনে করেন তিনি জানেন না যে, আত্মা হত্যা করেও না, হতও হয় না"।[৭]

র‍্যাল্‌ফ্‌ ওয়াল্ডো এমারসন ভগবদ্গীতা প'ড়ে এই শ্লোকটির একটি 'ব্রহ্ম' নামে পদ্যানুবাদ করেছিলেন ইংরাজীতে—

আত্মাকে যে হন্তা কিংবা হত মনে করে,
জানে না সে ভালভাবে সূক্ষ্মতত্ত্ব কিবা।
আত্মা কিন্তু হন্তা কিংবা হত নন কভু,
জীবরূপে আসে যায় অখণ্ড স্বরূপে॥

আত্মার বৈশিষ্ট্যরক্ষাসম্পর্কে বেদান্ত বলে, প্রত্যেক আত্মাই পার্থিব জীবনে অর্জিত সকল অভিজ্ঞতা, সংস্কার ও ধারণা সংগে নিয়ে যায়। মন, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়জ্ঞানও আত্মার সংগে সংগে থাকে এবং সে যা চিন্তা ও কর্ম করে তাদের সমস্ত ফলই সংস্কারের আকারে সংগে নিয়ে যায়।

হিন্দুদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মন্ত্রগুলি বুঝ্‌লে দেখা যাবে যে, মৃত ব্যক্তির আত্মীয়গণ তাঁর নামে প্রার্থনা ও সৎকাজ করেন তাঁর সদ্গতি লাভের জন্য, কেননা তাঁরা বিশ্বাস করেন যে মৃতের উদ্দেশ্যে বা নামে সকল-কিছু সচ্চিন্তা প্রার্থনা ও সৎকর্ম বিদেহীদের পরলোকে সাহায্য করে। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, যদি মৃত আত্মাদের কল্যাণ-কামনা না ক'রে কেবল নিজেদের স্বার্থ ও কৌতুহল চরিতার্থের জন্যই স্মরণ ও আহ্বান করি, তা'হলে তাদের পার্থিব পরিত্যক্ত দেহটিতে ও নির্দিষ্ট একটি ব্যক্তিত্বে আবদ্ধ থাকার জন্যই তাদের বাধ্য করা হবে। ব্যক্তিসত্তা বা ব্যক্তিত্ব শরীরের সংগেই জড়িত থাকে।

প্রত্যেক জন্মেই বিশেষ পরিবেশ অনুসারে আমাদের এক একটা ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। কোন আত্মাকে যদি তার একটি বিশেষ ব্যক্তিত্ব ও পরিবেশের গণ্ডির মধ্যে আটকে রাখা হয় তো তার আর উর্ধ্বগতি হয় না। সেজন্যই

৬। নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
—ভগবদ্গীতা ২।২৩

৭। য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে।
—গীতা ২।১৯

পরলোকগত আত্মাকে আমাদের পার্থিব জগতে টেনে আনা উচিত নয়, বরং তাঁর উদ্দেশ্যে ভাল কাজ ক'রে তাঁর উর্ধ্বগতির সাহায্য করা উচিত।

বৈদিক যুগের লেখকেরাও যে প্রেতলোকে বিশ্বাস করতেন তা জানা যায়। তাঁদের লেখাতেই পিতৃলোকের উল্লেখ পাওয়া যায়। যম সেখানের রাজা ও শাসক। মানুষের মধ্যে তিনিই নাকি প্রথমে সেখানে গিয়েছিলেন, গিয়ে তিনিই সেখানকার রাজা হন।

হিন্দুরা স্বর্গসত্তা বিশ্বাস করেন, কিন্তু যথার্থ কোন নরক আছে ব'লে স্বীকার করেন না।[৮] তবে হিন্দুর স্বর্গ খ্রীষ্টান কিংবা মুসলমানের স্বর্গ হ'তে ভিন্ন। হিন্দুরা মনে করেন, স্বর্গ এমন একটি জায়গা যেখানে মৃত ব্যক্তিরা তাদের পুণ্যকর্মের ফল ভোগ করতে যান। সেখানে গিয়ে তাঁরা কিছুকাল থাকেন, যতকাল পুণ্যকর্মের ক্ষয় না হচ্চে ততকাল।[৯] সে পুণ্যফলভোগ শেষ হ'লে আবার তাঁরা মর্তে ফিরে আসেন। খ্রীষ্টান, মুসলমান ও জোরোয়স্ত্রীয়রা স্বর্গকে ইন্দ্রিয়সুখের পরমরমণীয় স্থান বলে মনে করেন, সেখানে আমোদ-প্রমোদ নাকি অফুরন্ত। হিন্দুদের মতে, ঐ অবস্থা চরমকাম্য নয়। তাঁরা বলেন, সেই সমস্ত স্বর্গীয় আমোদ-আহ্লাদও কিছুকাল স্থায়ী হয়, তারপর সে-সবেরও ক্ষয় আছে। মনে করুন—কোন প্রেতাত্মা একলক্ষ বছর বা এক যুগ স্বর্গে ভোগ করলে, কিন্তু সেই লক্ষ বছরও অনন্তকালের তুলনায় কম সময়। তাই হিন্দুরা বলেন, স্বর্গের ফলভোগ শেষ হলে আত্মাকে আবার জন্ম নিতে হয়, হয় এখানে —নয় তো অন্য কোথায়। আত্মার ভাব ও প্রকৃতি অনুসারে সে-সব গতি নির্ধারিত হয়। গীতায় বলা হয়েছে—

'স্বর্গই হোক অথবা যে-কোন লোকই হোক সেখান থেকে আত্মাকে ফিরে আসতে হবেই'।[১০] এর কারণ হচ্ছে এই যে, এ' সবই সুখময় জগতের বিষয়, সুতরাং পরিবর্তনশীল। যিনি সত্যকে উপলব্ধি করেন তিনি এই পরিবর্তনশীল বিশ্বের উর্ধ্বে গমন করেন।

পারস্যবাসীরা বিশ্বাস করতেন, মৃত্যুর তিন দিন পরে আত্মা স্বর্গে কিংবা নরকে যায় আপন-আপন ভাবনা কামনা, ও ক্রিয়াকর্ম অনুসারে।

৮। কিন্তু পুরাণে বা পৌরাণিক সাহিত্যে নরকের বিভীষিকাময় বর্ণনা পাওয়া যায়, অনিষ্ট ও অকল্যাণকারীদের নরক ভোগ করতে হয়। বৌদ্ধসাহিত্যেও নরকের কথা আছে।

৯। তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।—গীতা ৯।২১

১০। গীতা ৮।১৬

পারস্তবাসীদের এই ধারণা ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা নিয়েছিল। প্রাচীন হিব্রু সম্প্রদায় মরণোত্তর জীবন—কি মৃত্যুর বিষয় নিয়ে মাথা ঘামান নি। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, ঈশ্বর মানুষের নাসিকার ভেতর দিয়ে প্রাণবায়ু দিয়ে দেন এবং সেই প্রাণবায়ু যেমন জিহোবার কাছ থেকে এসেছে তেমনি তাঁর কাছেই আবার ফিরে যায়। প্রত্যেক প্রাণীর প্রাণবায়ুও সেখান থেকে এসেছে, সেই কারণে ফিরে যায়। মানুষের ক্ষেত্রে যেমন, অপর তির্যক প্রাণীদের ক্ষেত্রেও তাই। এই প্রাণবায়ুকে তাঁরা বলনে 'নেফেশ্', 'রুআক্' অথবা 'নেশামা'।

মিশরীয়রা আত্মার দ্বিতীয় সত্তাকে ছায়ার মতো বলে মনে করতেন। তাঁদের মতে, যতদিন দেহ থাকে ততদিনই সেই ছায়া থাকে। এ'থেকে দেহকে রক্ষা ক'রে 'মমি' ক'রে রাখার ধারণা ও প্রথা এসেছিল। তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে, দেহের কোন অংশে যদি ক্ষত হয় তো দ্বিতীয় সত্তা অর্থাৎ বিদেহী আত্মারও সেই অংশে ক্ষত হবে। তাই আত্মাকে অক্ষত রাখার জন্যে তাঁরা দেহকে ক্ষতবিহীন ক'রে রাখতেন নষ্ট হতে দিতেন না।

চালডীয়াবাসীরা মানুষের দ্বিতীয়-সত্তায় বিশ্বাস করতেন। দেহ নষ্ট হ'য়ে গেলে আত্মাও নষ্ট হয়ে যাবে—এই ছিল তাদের ধারণা। তাঁরা মৃতদেহের পুনরুজ্জীবন বা পুনরুত্থান প্রতীক্ষা ক'রে থাকতেন। অনেক খ্রীষ্টানেরও এই রকমই বিশ্বাস আছে। এই বিশ্বাস থেকেই এদের মধ্যে দেহকে ভেষজ দ্বারা অনুলেপন ক'রে কবর দেবার প্রথার উদ্ভব হয়েছে। কোন কোন খ্রীষ্টান এখনো বিশ্বাস করেন, মৃত্যুর পর দেহের পুনরুত্থান হবে। তাঁদের বিশ্বাস—আত্মা অনন্ত কাল থাকবে, যদিও এর জন্ম বা আরম্ভ একদিন হয়েছে। আত্মার জন্ম-সম্বন্ধে খ্রীষ্টানদের সংস্কার এই যে, পরমেশ্বর প্রত্যেক আত্মাকে জন্মের সময় নতুন ক'রে সৃষ্টি করেন। কিন্তু হিন্দুদের মত হচ্ছে, যার জন্ম আছে তা অনন্তকাল থাকতে পারে না, তার শেষও হ'তে হবে। আত্মাকে ঈশ্বর বা অপর কোন দেবতা সৃষ্টি করেন, হিন্দুরা একথা মানেন না। এই আত্মা অজ অর্থাৎ জন্মহীন, নিত্য, শাশ্বত। হিন্দুদের মতে, মৃত্যুতে আত্মার ধ্বংশ হয় না; তাঁদের মরণের অর্থ দেহান্তরপ্রাপ্তি। এই মৃত্যু জীবনের নিত্যসহচর। পরিবর্তন বা রূপান্তর ছাড়া পার্থিব জীবন সম্ভব নয়। প্রতিদিনই কোন-না-কোন রকমের পরিবর্তন বা মরণ ঘটছেই। প্রতি সাত বছরে দেহের প্রতিটি কণিকার পরিবর্তন হ'য়ে নতুন সৃষ্টি হয়।

অধ্যাপক হাক্সলি বলেন : 'শরীরতত্ত্ব মানুষের জীবন-সম্বন্ধে যে'কথা বলে

তার অর্থ সুগভীর এবং তার তুলনায় রোমীয় কবির ব্যাখ্যায় দৈন্য দেখা যায় জীবন ও সত্তা কি মহীরুহ, কি পতঙ্গ, কি মানুষ যে কোন রূপই নিক না তার আদিরূপকে শুধু যে শেষ পর্যন্ত রূপান্তরিত হতেই হয়, এর খনিজ এবং প্রাণহীন উপাদানগুলির মধ্যে মিশে যেতে হয় তাই নয়, একে সর্বদাই মরতে হয়"। কথাটা বিপরীত শোনাবে—তবু বলতে হয় যে, মরে না পাল্টালে জীবন বাঁচতে পারে না।

দেহের প্রতিটি কণিকার পরিবর্তন হলেও আমরা বেঁচে থাকি, আমাদের জীবনধারার বিচ্ছেদ ঘটে না। শৈশব হতে বার্ধক্য অবধি আমাদের আমিত্ববোধ কিংবা স্বরূপের কোন বৈলক্ষণ্য সংঘটন হয় না। আমিত্ববোধের এই যে অবিচ্ছিন্নতা—একে পদার্থতত্ব কি রসায়নবিদ্যার নিয়ম-অনুসারে ব্যাখ্যা করা যাবে না। বেদান্তদর্শনের মতে, চিন্তা, অনুভূতি বা বুদ্ধি যান্ত্রিক বা আণবিক গতির ফলে উৎপন্ন হতে পারে না। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে—গতি গতির সৃষ্টি করে। তা যদি হয় তো দেহের আণবিক গতি কেমন ক'রে চৈতন্য সৃষ্টি করবে! নিশ্চয়ই কোন উচ্চতর শক্তির কল্যাণে তা সম্ভব হয়। এই শক্তিকেই তো সাধারণ ভাষায় বলে 'আত্মা'। দেহের আণবিক বা রাসায়নিক পরিবর্তনের প্রভাব আত্মার ওপর পড়ে না। এই আত্মাই সে-সব পরিবর্তনের কারণ। আত্মার কোন রূপান্তর বা মৃত্যু নেই। এই আত্মাই চেতনার অবিচ্ছিন্নতা এবং ব্যক্তিত্ববোধের মূল। প্রতি সাত বছরের পরিবর্তনের পরও আমরা যেমন ব্যক্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকি তেমনি অন্তিম রূপান্তরের (মৃত্যুর) পরও ব্যক্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকব। গীতায় আছে, জীবৎকালে শৈশব, যৌবন ও পরিণত দেহের রূপান্তরের পরও আমরা যেমন বেঁচে থাকি আমাদের বিশিষ্ট সত্তা নিয়ে মরণের পর তেমনি অনন্তকাল বেঁচে থাকব আমাদের ব্যক্তিত্ব নিয়ে।[১১]

১১। দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥
—গীতা ২.১৩

তৃতীয় অধ্যায়

॥ মৃত্যু সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অভিমত ॥

এখনকার এই বস্তুতান্ত্রিক যুগে অতিঅল্প লোকই মৃত্যুসম্বন্ধে চিন্তা করে। ঠিক কথা বলতে গেলে, তারা চিন্তা করতে কাতর। মরণের পর কি হবে সে-বিষয়ে তারা কোন পরোয়াই করে না। জীবনের যা-কিছু সুবিধা ও প্রাপ্য তা নিয়ে সব সুখ তারা ভোগ করতে চায়, পৃথিবীর যা-কিছু সুখ তারা ভোগ করতে চায়, প্রত্যেক জিনিষের সদ্ব্যবহার করতে চায় এবং তারা এ'কথা নিশ্চয় করে জানে যে, মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়ে অনন্তকাল তারা জীবনে বাঁচতে পারবে না। এ'কথা সত্য যে, পৃথিবীর দু'শো কোটি লোকের মধ্যে অন্তত চার কোটি লোক প্রতি বছর দেহত্যাগ করছে, ফলে দশ লক্ষ টন মানুষের মাংস, হাড় ও রক্ত পরিত্যক্ত বস্তু হিসাবে ফেলে দেওয়া বা নষ্ট করা হচ্ছে। বিগত বিশ্বযুদ্ধে যে কত লোক মরেছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু এসব যেন আমাদের তেমন গায়ে লাগে না। আমাদের যে মরতে হবে, এ-কথাই যেন ভাবনায় আসে না। মৃত্যু জীবনের সবচেয়ে গভীর ও প্রধান রহস্যের বিষয় হলেও এর সমাধানের জন্যে আধুনিক মানুষের তেমন আগ্রহ দেখা যায় না। এমন কি খ্রীষ্টানরাও গত শতাব্দীতে এ বিষয়ে যেমন আগ্রহ দেখাতেন, এনখ আর তেমনটি দেখান না। তাঁরা বরং সামাজিক, শিক্ষাবিষয়ক ও রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবেন, তবু এ' সম্বন্ধে ভাববেন না। তাঁদের হাতে শত শত লোকের মৃত্যু হলেও এ যুগের চিকিৎসকরা মৃত্যরহস্য ভেদ করতে পারেন না, তাঁরা শুধু জীবনে আমোদ-আহ্লাদ ভোগ করবার জন্যে যা-কিছু পারেন যোগাড় করেন।

হিন্দুদের প্রাচীনতম মহাকাব্য মহাভারতে একটি চমৎকার প্রশ্ন পাওয়া যায়। প্রাচীনকালের বহু মনীষীকে ঐ প্রশ্নটি করা হয়। উত্তর অনেক রকমই হয়েছিল, কিন্তু সেগুলি তেমন মনোমত হয়নি। যুধিষ্ঠির যে উত্তরটি দিয়েছিল, সেইটিই গৃহীত হয়েছিল। সেটি হচ্ছে—

'নিত্য দিনই মানুষ ও জীবজন্তু মারা যাচ্ছে, কিন্তু তবু মানুষ মৃত্যুর বিষয়

ভাবে না, তার ধারণা—তার কখনো মরণ হ'বে না। এর চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় আর কি হ'তে পারে?'[১]

প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে এই উত্তরটি দেওয়া হয়েছে। তবু এর সত্যতা অব্যাহত রয়েছে আজও। যদিও আমাদের চোখের সামনে দিয়ে মৃতদেহ শ্মশানে দাহ অথবা কবরে সমাহিত করার জন্য নেওয়া হয়, তবুও আমরা মৃত্যুর কথা চিন্তা করি না।

আখ্যানিক বা পৌরাণিক বিশ্বাস দ্বারা যে মরণের রহস্যভেদ হচ্ছে তা আমরা বলছি না, অথচ এই বিশ্বাস চলে এসেছে সুপ্রাচীন কাল থেকে। ইহুদী, খ্রীষ্টান, পার্শী এবং মুসলমানদের শাস্ত্রে মৃত্যু যে কি জিনিস তা বলেনি। তবে এদের কারো-কারো ধর্মগ্রন্থে দেখা যায়, ঈশ্বর আদিম-মানবকে কতকগুলি আদেশ ও পরামর্শ দিয়েছিলেন, যেমন তাঁকে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু আদিম-মানব সে আদেশ পালন না করায় ঈশ্বর তাঁকে শাপ দিয়েছিলেন, তারই ফলে পৃথিবীতে মৃত্যু দেখা দিয়েছিল। জেনেসিসে আছে: "এই কাননের যেকোন গাছের ফল যথেচ্ছা পাড়ো, কিন্তু এই সৎ অসৎ জ্ঞানের গাছের ফল খাবে না। যেদিন এই গাছের ফল খাবে সেদিন তোমার মৃত্যু হবে নিশ্চিত[২]।"

অবশ্য আদম যে দিনে প্রলুব্ধ হয়ে ফল খেল সেই দিনই মরে নি, তাঁর মৃত্যু হয়েছিল পরে, কিন্তু তখন তাকে এই আদেশ না মানার ফল পেতে হয়েছিল। এ'থেকে বোঝা যায়, ঈশ্বর প্রথমে মানুষকে মরণ দিতে চান নি, কিন্তু শয়তানের দুষ্টামির ফলেই পৃথিবীতে মরণের উদ্ভব হ'ল—যাঁরা এই মতকে নির্দিষ্ট ও স্বাভাবিক বলে বিশ্বাস করেন তাঁরা মরণ-বিষয়ে তাই আর বেশি চিন্তা করেন না। এটাকে একটি নির্দিষ্ট অপরিবর্তনীয় ব্যাপার বলে তাঁরা মনে করছেন, তাই তাঁরা আর এর সমাধানে তৎপর নন।

মরণের কারণ-বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অনেক সত্য ও জ্ঞান আবিষ্কৃত হয়েছে, যে'গুলি জেনেসিস-রচয়িতা ও বিভিন্ন জাতির প্রাচীন ধর্মগ্রন্থলেখকদের জানা ছিল না।

তথাকথিত বিজ্ঞান ও জড়বিজ্ঞান কতগুলি বাস্তব পদার্থ ও ক্রিয়াশক্তির

১। অহন্যাহানি ভূতানি গচ্ছন্তি যম মন্দিরম্।
শেষাস্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃপরম্॥—মহাভারত

২। জেনেসিস ১।১৬-১৭

বিকাশ ছাড়া বুদ্ধি, মন, আত্মা ব'লে স্বতন্ত্র বস্তু স্বীকার করে না এবং স্বীকারও করে না যে, জড়শক্তি ও রাসায়নিক ক্রিয়া-নিয়ন্ত্রিত জড়পদার্থ থেকে আত্মা আলাদা কিছু। তার মানে মৃত্যু অর্থে জীবনের সমাপ্তি। এই মরণ সকলেরই অনিবার্য পরিণাম। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা এই মরণবিষয়ে বিশেষ-কিছু জানেন না ব'লে এর বিশদ ব্যাখ্যা তাঁরা করতে পারেন নি, অথচ তাঁরা বলেন, দেহযন্ত্রের বিশেষ দরকারী অংশগুলি ক্ষয়ে গেলেই সমস্ত যন্ত্রটি বিকল হয়ে পড়ে। হৃদযন্ত্র, শ্বাসযন্ত্র, মস্তিস্ক—এ'গুলি দেহের প্রধান অংশ। কোন অসুখ বা আকস্মিক ব্যাপারে এই প্রধান কেন্দ্রের যেকোন একটির মৃত্যু হ'লে সমগ্র শরীরের যন্ত্রটি বন্ধ হয়।

কিন্তু এখানে প্রশ্ন ওঠে, সচেতন, জীবনের মরণ হলেই কি দেহের যন্ত্র বা অংশগুলি সব বিকল হয়ে যায়? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। কিন্তু বিজ্ঞানের মতে, দেহের মরণ হবার সংগে সংগেই যে'সব অংশগুলি বিকল বা নির্জীব হয়ে যায়—তা নয়। একটি মুরগীর মাথা কেটে ফেলে তার হৃদ্‌যন্ত্র বার ক'রে দেখলে দেখা যাবে, মরণের পরও অনেকক্ষণ সেটা বেঁচে আছে। রকফেলার ইন্‌সটিটিউটে একটি মুরগীর হৃদ্‌যন্ত্রকে আট বছর ধরে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল, আর সেটি স্বাভাবিকভাবেই আপন ক্রিয়া ক'রে চলেছিল। এ'থেকে বোঝা যায়, দেহের অংশগুলির স্বতন্ত্র সত্তা আছে, দেহের মৃত্যুর পরও সেগুলি বেঁচে থাকতে পারে। এ'ভাবে দেখানো যেতে পারে, দেহের জীবকোষ এবং টিশুগুলিরও স্বকীয় প্রাণ আছে। ব্যক্তির মৃত্যু হলেও তার সত্তা থেকে যায়। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে, মৃত্যু দু'রকমের আছে: এক হ'ল সচেতন প্রাণের মৃত্যু, আর দ্বিতীয় কৌষিক জীবনের মৃত্যু। তবে একটি অপরটীর ওপর নির্ভরশীল নয়। প্রকৃতপক্ষে প্রাণশক্তির বিরতি কখনই হয় না। কিন্তু জড়বিজ্ঞান বলতে পারে না কেমন ক'রে এই কোষ ও টিশুগুলি বেঁচে থাকে। এই বিজ্ঞান সমস্ত অভিব্যক্তি বিরাটশক্তি বা প্রকৃতি (nature) থেকে ভিন্ন প্রাণশক্তিতে বিশ্বাস করে না বলেই তা বলতে পারে না। এই বিজ্ঞান বরং মনে করে, দেহের অনুকণাগুলির রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলেই ঐ প্রাণশক্তির আবির্ভাব হয়। এ'ছাড়া জড়বিজ্ঞান আর কিছু বলতে পারে না।

হার্বার্ড মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক চার্লস মাইনট 'ওল্ড-এজ—গ্রোথ্‌ এ্যাণ্ড ডেথ্‌' নামক পুস্তকে লিখেছেন:

"দৈহিক উপাদানসমূহের স্বতন্ত্রীকরণের অনিবার্য পরিণাম হ'ল মৃত্যু।

দেহের কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশের নিস্প্রাণতা ঘটলে সারা দেহ প্রাণহীন হয়। কথনো মস্তিষ্কের, কথনো হৃদয়ের, কথনো বা অপর কোনো আভ্যান্তরিক যন্ত্রের এমন জৈবকোষিক রূপান্তর ঘটে যে, সেটি আর নিজের কাজ করতে পারে না, তার ফলে দেহযন্ত্রটি বিকল হয়ে যায়। এই হ'ল মৃত্যুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। কিন্তু এতে মৃত্যুর রহস্যভেদ ও পবিত্রতার হানি একটুও হয় না। এখনো আমরা বলতে পারি না জীবন কি। মৃত্যুসম্বন্ধে তো একেবারে কিছুই বলতে পারি না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে মরণ-বিষয়ে কোন স্পষ্ট জ্ঞানই পাওয়া যায় না। এই বিজ্ঞান মৃত্যুর কারণ আবিষ্কার করবার চেষ্টা ও তার লক্ষণ বর্ণনা করে মাত্র! বিজ্ঞানের মতে, মরণের প্রকৃত লক্ষণ নিরূপণ করা খুবই কঠিন। নাড়ী ও হৃদ্‌যন্ত্রের নিষ্ক্রিয়তা, শ্বাসবন্ধ প্রভৃতি যে সব লক্ষণকে আমরা মৃত্যুর নিদর্শন ব'লে মনে করি, আসলে কিন্তু তা নয়। কারণ, অনেক সময় দেখা যায়, অনেকক্ষণ ধরে হৃদযন্ত্র ও শ্বাস বন্ধ হয়ে থাকার পরও আবার মানুষ উজ্জীবিত হ'য়ে উঠছে। অনেক ক্ষেত্রে মানুষের হৃদ্‌যন্ত্রক্রিয়া বন্ধ থেকেছে আটচল্লিশ ঘণ্টা পর্যন্ত তবু তার পরও মানুষকে বেঁচে উঠতে দেখা গেছে।

কিন্তু আবার ভিন্ন ব্যাপারও দেখা গেছে যেখানে মানুষকে একটি বন্ধ বাক্সের মধ্যে চল্লিশ দিন ধরে সমাহিত অবস্থায় রাখা হয়েছে ও তারপর তাকে জীবন্ত বার ক'রে আনা হয়েছে। সুতরাং মৃত্যুর যথার্থ বা চরমচিহ্ন যে কি তা বলা সুকঠিন। বিজ্ঞানের মতে, পচন ও গলন ছাড়া শরীরের মৃত্যুর লক্ষণ আর অন্য-কিছু নয়। এ'থেকে প্রমাণ হয় যে, মানুষকে মৃত্যুর সংগে সংগেই মাটিতে কবর দেওয়া উচিত নয়। অবশ্য এ' ধরণের অপরিণত সময়ে কবর দেওয়ার নিদর্শনের উল্লেখ প্রতি বৎসর চিকিৎসা-শাস্ত্রীয় পত্রিকায় পাওয়া যায়, আর সে'জন্যই ইউরোপের কোন কোন দেশে আইন প্রবর্তন করা হয়েছে যে, মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই কেহ মৃতদেহটিকে কবর দিতে পারবে না, শরীরে পচন আরম্ভ হ'লে তবে কবর দেওয়া বিহিত। অনেককে সংগে সংগে কবর দেওয়ার জন্য অসময়ে মৃত্যু বরণ করতে দেখা গেছে। সুতরাং মৃত্যু হ'লে সংগে সংগে মৃতদেহকে কবর দেওয়া উচিত নয়। মিশরে মমি-করণের ইতিহাসে দেখা গেছে, অনেককে অপরিণত সময়ে মমি করার জন্য মেরে ফেলা হয়েছে, তারা হয়তো আরো অনেকদিন বেঁচে থাকতে পারতো।

আজকালও দেখা যাচ্ছে, অনেক ব্যক্তি মূর্ছিত কি অচৈতন্য হয়েছে, কিন্তু লোকে তাদের মৃত বলে জ্ঞান করেছে।

আবেশ, বিভোরতা ও তন্ময়তা-অবস্থাকেও মরণের মতো মনে হয়। কিন্তু ওই রকম অবস্থায় আত্মার কি হয়? বিজ্ঞান তো এ' বিষয়ে কিছু বলতে পারে না। কোন-কোন লোক নির্জীব অবস্থায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা থাকতে পারে। কেউ কেউ ইচ্ছা শক্তির দ্বারা হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ করতে পারে। আমেরিকায় একজন হিন্দুযোগসাধকের সংগে আমার পরিচয় হয়েছিল, তিনি ইচ্ছাশক্তির দ্বারা হৃদকম্পন বন্ধ করলে চিকিৎসকেরা তাঁকে পরীক্ষা ক'রে দেখতেন সত্যই তাঁর ফুসফুসের ক্রিয়া থাকত না। চিকিৎসকেরা হতভম্ব হয়ে যেতেন এবং এ-রকম কিভাবে সম্ভব হতে পারে, সে-সম্বন্ধে সেই হিন্দু-যোগীকে নানা রকম প্রশ্ন করতেন। আসলে এটা সম্ভব, কেননা হৃদস্পন্দনও মানুষের ইচ্ছার আজ্ঞাবহ, মানুষমাত্রেই তার ইন্দ্রিয়ের কাজগুলোকে ইচ্ছানু-সারে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। তবে আধুনিক জড়বিজ্ঞান এ'সবের কোন উত্তর দিতে পারে না—কেমন ক'রে তা হতে পারে।

প্রাচীন ব্যাবিলনে মৃতশরীরকে সংরক্ষণ করার যে প্রথা আছে সেটি খ্রীষ্টপূর্ব যুগ থেকে চলে এসেছে এবং এখনো পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্যদেশেই ওই প্রথা অনুসৃত হয়ে আসছে। ভেতরে ও বাইরে ঔষধ প্রয়োগ ও বিভিন্ন আচ্ছাদন দিয়ে মৃতদেহকে কবর দেওয়া প্রথাটির পেছনে এক অলৌকিক বিশ্বাস আছে—মৃত্যুর পর শরীরে আবার প্রাণ ফিরে আসে ও সেই শরীর স্বর্গে গমন করে, কিন্তু শরীর থেকে প্রাণ যদি একবার নির্গত হয় ও শরীরে পচন আরম্ভ হয় তাহলে কবর থেকে উঠে শরীর আবার যাবে কোথা? 'মৃত্যুর পর শরীর যে স্বর্গে উঠে যায়' এই মতবাদটি বিজ্ঞান মোটেই বিশ্বাস করে না, বরং বলে—অসম্ভব কিন্তু তবুও কয়েক শ্রেণীর লোক ঐ জীর্ণ বিশ্বাসকেই আঁকড়ে ধরে থাকে ও ভাবে যে, তাদের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের আত্মা পার্থিব শরীর নিয়ে মৃত্যুর পর কবর থেকে উঠে যায়।

মৃতশরীরের সৎকার করার উৎকৃষ্ট রীতি হলো আগুনে পোড়ানো, এবং এটা স্বাস্থ্যকরও। অর্থাৎ আমার বলার উদ্দেশ্য যে, মৃতদেহকে অগ্নিসৎকার করাটা যেমন স্বাস্থ্যের দিক থেকে কল্যাণকর, তেমনি মানুষের পক্ষেও নিরাপদ। কবর দেওয়ার অর্থই মৃতদেহকে পচিয়ে নষ্ট করা অথচ সেটা হতে

দেওয়া আমাদের পক্ষে কি উচিত? এর চেয়ে বরং যে পাঁচটি ভূতের (ক্ষিতি, অপ: প্রভৃতির) সমবায়ে জড়শরীর সৃষ্টি হয়েছে তাতে তাকে মিশে যেতে দেওয়া উচিত।

অগ্নিসংকারপ্রথা ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। বেদেও এ-প্রথার উল্লেখ পাই[৩] এবং সেখানে অনেক জায়গায় অগ্নিসংকারেরই (ক্রিমেশন্)[৪] বরং বেশী প্রশংসা করা হয়েছে। তবে হিন্দু ছাড়া অন্যান্য জাতিদের ভেতর কবর দেওয়ার বা ঔষধ প্রভৃতির সাহায্যে মৃতদেহকে সতেজ রাখার প্রথাকে স্বীকার করা হয়েছে। সে'সব জাতির ধারণা যে, মরণের পর মৃত-আত্মা পরিশেষে সেই শরীরে ফিরে আসে। মিশরবাসীদের ভেতর এ-ধরনের বিশ্বাস প্রবল ছিল। তাদের ধারণা ছিল যে, শরীরটাকে পচতে না দিয়ে যদি ঠিকভাবে রক্ষা করা যায় তবে আত্মা আবার সেই দেহেই বসবাস করার জন্যে ফিরে আসে, আর শরীরের কোন অংশ যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আত্মার শরীরেও সেই অংশ বিকৃত হয়। তাদের বদ্ধমূল ধারণা যে স্থূল-শরীর-অনুযায়ী আত্মার গড়ন ও আকৃতি হয়।

ভারতবর্ষে হিন্দুরা আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, তবে এ'কথাও তাঁরা সংগে সংগে স্বীকার করেন যে, স্থূলশরীরের তিনি দাস বা অধীন নন, আত্মা সম্পূর্ণ দেহাতিরিক্ত, স্বাধীন ও মৃত্যুহীন। ভারতের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী সে'জন্য মিশরবাসী ও অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের চেয়ে ভিন্ন। হিন্দুদের দৃঢ়বিশ্বাস যে, দেহকে ত্যাগ করেও আত্মার অস্তিত্ব থাকে, স্থূলশরীরের নাশে বা স্থূল-শরীরকে অগ্নিসংকার করলে আত্মার কোনদিন নাশ হয় না। এ'জন্যই হিন্দুরা শরীরের অগ্নিসংকারপ্রথা স্বীকার করেন এবং তাঁদের চোখে এই রীতি স্বাস্থ্যকর ও বৈজ্ঞানিক।

আর এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক আছেন যাঁরা মন ও বুদ্ধিচেতনার সত্তা অস্বীকার করেন না তাঁদের মতে, মানুষের রোগ ও মরণের জন্য এই মন অনেকটা দায়ী।

৩। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে অগ্নিদান বা মৃতদেহে অগ্নিসংকার ও অনগ্নিধান বা কবর দেওয়া এই দু'রকম প্রথারই উল্লেখ আছে। অনেক 'সময় অর্ধদগ্ধ করেও কবর দেওয়ার প্রথা ছিল। ঋগ্বেদের—১৪শ ১৮শ মণ্ডলগুলিতে পিতৃপুরুষ যম, অগ্নি, প্রভৃতির উদ্দেশ্যে ৭২টি মন্ত্রের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের ১৬শ সূক্তের 'মৈনময়ে বৈ দেহো মাহিশোচো' প্রভৃতি ১ম মন্ত্রে কবর দেওয়ার উল্লেখ আছে। আবার ঋগ্বেদের ১৫ সূক্তের "যে অগ্নিদগ্ধ যে অনগ্নিদগ্ধ" প্রভৃতি ১৪শ অগ্নিসংকার ও কবর এই উভয় প্রথারই উল্লেখ পাওয়া যায়।

৪। এ' সম্বন্ধে পরিশিষ্টেও আলোচিত হয়েছে

ডাঃ জন হাণ্টার নামে এক প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ ছিলেন। তাঁর প্রতিভা ছিল অসাধারণ। তিনি ছিলেন বৈজ্ঞানিক, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন মনের শক্তিকে। তবে মনের ক্রিয়াকে তিনি সংযত করতে পারতেন না, রাগ চেপে রাখার শক্তি তাঁর ছিল না। একবার সামান্য কারণে তাঁর অতিশয় রাগ হয়, তার ফলে তিনি মারা যান। রাগ যে সংগে-সংগে মানুষের মৃত্যুর কারণ হতে পারে তার ঐতিহাসিক উদাহরণ আছে। ফরাসী চিকিৎসক টুরটেলি (Tourtelle) দু'টি মহিলাকে দেখেছিলেন রাগের দরুন মারা যেতে। অতিশয় ক্রোধে মানুষের হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে। অল্প রাগেও মানুষের খুব খারাপ রোগ হতে পারে। মা যদি রাগত হয়ে শিশুকে স্তন পান করান তো তার ফল বিষময় হয়। সেই রাগ শিশুর সারা দেহ-মনের ওপর কাজ করে। এটি বহুপরীক্ষিত সত্য।

ক্রোধ যেমন তার নাশক শক্তি দিয়েই দেহ-মনের ক্ষতি করে ও অনর্থ বাধায়, ভয়ও তেমনি। 'আমরা ভয়ে মরে যাই' এ-প্রবাদের পিছনে অর্থ আছে। অতিরিক্ত ভয়ে মানুষের মৃত্যু হতে পারে, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া এবং সংগে সংগে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া অন্য রিপুও আছে, যেমন ঘৃণা ও শোক। শোকও দেহ-মনের অনেক অপকার করতে পারে। ভয়, শোক প্রভৃতি থেকে যখন মরণ ঘটে তখন মনের শক্তিকে অস্বীকার করা যায় কেমন করে? মনের বিভিন্ন অবস্থার প্রভাব দেহের ওপর যদি এমন হ'তে পারে তো মনকে সবচেয়ে শক্তিশালী বস্তু ব'লে স্বীকার করতে বাধে কিসে? তা হলেই দেখা যাচ্ছে, উদার ও বিচক্ষণ বিজ্ঞানীরা দেহের মধ্যে মনকে সবচেয়ে বিস্ময়কর শক্তি ব'লে মনে করেন, গোঁড়া বস্তুবাদীদের মতো তাঁরা নন।

ইতরপ্রাণীদের মরণের ভান করতে দেখা যায়। শেয়াল তাড়িত হয়ে পালাবার পথ না পেলে মাটিতে পড়ে গিয়ে মরণের ভান করে। অপর অনেক পশুদের মধ্যেও এই ভাব দেখা যায়। মত্ততা, মূর্ছা প্রভৃতিতেও মরণের অনুরূপ ভাব হতে দেখা যায়। এ' থেকে এই কথাটুকু বোঝা যাচ্ছে যে বিশেষ-বিশেষ অবস্থায় মন মরণের মতো ভাব সৃষ্টি করতে পারে। বিজ্ঞানীরা এ-থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মনের শক্তির দ্বারা মরণ ঘটানো যায়। তাই সাধারণতঃ যাকে মৃত্যু বলা হয় তা ঘটে দেহের মধ্যে ক্রিয়াশীল সেই সচেতন জীবন্ত শক্তির অভাবের কারণে। এই চেতন প্রাণবস্তু বা শক্তির

বিচ্ছিন্নতাই আনে মৃত্যু। প্রকৃতপক্ষে সচেতন আত্মার প্রাণশক্তি এবং মন ব'লে পদার্থ আছে। এই প্রাণশক্তির সাথে মনের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। মন কোন যন্ত্র ছাড়া কাজ করতে পারে না। দেহকে মন সেই যন্ত্ররূপে তৈরী করে। প্রাকৃতিক পরিবেশ হ'তে বস্তুর অণুকণা সংগ্রহ করে এবং সেগুলিকে প্রাণশক্তি দিয়ে স্পন্দিত করে। প্রাণশক্তি যখন ক্ষীণ হয়ে আসে তখন মন তাকে সঞ্জীবিত ক'রে রাখবার চেষ্টা করে, তাতে সে অক্ষম হলে দেহের কোষ-টিশুগুলির মৃত্যুর সংগে সংগে দেহের মৃত্যু হয়।

অতএব দেখা যাচ্ছে, দেহের ভেতর দুটি মূল-উপাদান আছে : একটি মন, অপরটি প্রাণস্পন্দন, অথবা শরীরের কোষ ও পেশীসমূহের স্পন্দিত অবস্থা। এ'সকলের স্পন্দন কিন্তু মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, মনই তার স্রষ্টা ও নিয়ন্তা। দেহের সকল অংগ-প্রত্যংগের ক্রিয়ার পরিচালক এই মন। এক-একটি স্বতন্ত্র ক্রিয়া জীবন নয়। সকল অংগের ক্রিয়াসমূহের মধ্যে একটা ছন্দ ও সংগতি থাকা চাই, তা না হলে জীবন থাকতে পারে না। কোনখানে কোন যন্ত্র আল্‌গা হয়ে গিয়ে থাকলে এঁটে দিতে হবে, না হ'লে দেহযন্ত্রটি ঠিকমত কাজ করবে না। কিন্তু এই মেরামতের কাজ করবে কে? আত্মসচেতন প্রাণশক্তি পারে সে'কাজ করতে। এই আত্মা বা ব্যক্তিত্ববোধী প্রাণসত্তাই সকল অঙ্গের ক্রিয়াসমূহের মধ্যে সংগতি রক্ষা ক'রে চলে। আত্মসচেতন প্রাণশক্তি অর্থে 'আমি'-বোধী আত্মা : 'আমি দেহ', 'আমি অমুক' ইত্যাদি। এই 'আমি'-বোধই সকল-কিছুকে এক বা সমবেত করতে পারে, তাদের সংহত করে এবং সমস্ত বিচ্ছেদ্য অংশগুলির ভেতর একটা অবিচ্ছেদ্য স্পন্দন এনে পূর্ণসমতা সৃষ্টি করতে পারে, আর এই সংহতিই জীবন। একটি অর্কেষ্ট্রায় একশোটি বাদ্যযন্ত্র থাকতে পারে। সেই একশোটি যন্ত্র পরিচালকের নির্দেশ না মেনে যদি স্বতন্ত্রভাবে চলতে চায় তবে বাদ্যের মধ্যে সংহতি সৃষ্টি হবে না, বরং অসংগতিই আনবে; সেরকম শরীরের যন্ত্রগুলি তাদের পরিচালকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে যদি অসংগতি সৃষ্টি করে তবে তা থেকে বিশৃঙ্খলতা আসে এবং কাজও তাতে কিছু হয় না। এখন আমাদের দৈহিক যন্ত্রগুলির পরিচালক কে, বা নিয়ন্তাই বা কে? রক্ষণশীল বিজ্ঞান এই পরিচালকের কথা হয়তো মানবে না, কিন্তু উদার বিজ্ঞানবুদ্ধি স্বীকার করে এই ব্যবস্থাপক কর্তার কথা। মৃত্যুর সময়ে এই কর্তা (আত্মা) শারীরিক যন্ত্র থেকে নিজেকে মুক্ত করে।

বিভোরতা, তন্ময়তা ও আবেশের সময় আত্মা দেহে ছেড়ে যায়, কিন্তু দেহের বন্ধন সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন ক'রে যায় না। কাজেই এক ধরনের একটি সংযোগ বা বন্ধন থাকেই। প্রাণ বা প্রাণশক্তিই এই সংযোগ বা বন্ধন। সদ্যোজাত শিশুসন্তানের দেহের সংগে যেমন সূতার মতো একটি নাড়ী প্রসূতির গর্ভে সংযোগ রক্ষা করে, তেমনি প্রাণই শরীরের যাবতীয় ক্রিয়ার সংগে যোগ রেখে চলে, অর্থাৎ প্রাণই শরীরকে ক্রিয়াচঞ্চল করে, আর প্রাণের সত্তায়ই শরীর সঞ্জীবিত হয়। কাজেই জড় শরীরও বেঁচে ওঠে যদি প্রাণ তাতে আবার আসে—যদি প্রাণের সম্পর্ক তাতে থাকে। কিন্তু প্রাণের সম্পর্ক বা বন্ধন একেবারে ছিন্ন হ'য়ে গেলে দেহের উজ্জীবন হয় না; সেই অবস্থাকেই 'মরণ' বলা হয়। জীবন হ'তে মরণের তফাৎ এই মাত্র এবং খুব কম লোকই এই তফাৎ বুঝতে পারে।

কিন্তু মানুষের চৈতন্যময় আত্মা যখন মরণের পর হে ছেড়ে যায় তখন তার ফটোগ্রাফ বা আলোকচিত্র নেওয়া যায়। অত্যন্ত সূক্ষ্ম এক ধরনের যন্ত্রও আবিষ্কার হয়েছে—মরণের অব্যবহিত পরে দেহকে ওজন করার জন্য। ঠিক মৃত্যুর সময়ে দেহ থেকে এক প্রকার বাষ্পতুল্য পদার্থ নির্গত হয়ে যায় এবং তাকে ঐ আবিষ্কৃত সূক্ষ্ম যন্ত্রে মাপ ক'রে দেখা গেছে, তার ওজন প্রায় অর্ধেক আউন্স বা এক আউন্সের তিনভাগ।

মরণের সময় দেহ থেকে যে একপ্রকার সূক্ষ্ম-বাষ্পীয় পদার্থ নির্গত হয়ে যায় তা জ্যোতিষ্মান। ঐ জ্যোতিষ্মান পদার্থটির ফটোগ্রাফ বা ছবি তোলা হয়েছে এবং সূক্ষ্মদর্শীরা মরণের সময় দেহ থেকে ওটিকে বার হয়ে যেতেও দেখেছেন। তখন সারা দেহটি এক বিভাময় কুয়াশার পরিমণ্ডলে আচ্ছন্ন হয়। একটি মেয়ের ঘটনার কথা আমার মনে আছে—কয়েক বছর আগে লস্ এঞ্জেল্স-এ তার ভাই মারা যায়। এ'কথাটি আমি শুনেছি অবশ্য তার মার কাছ থেকে। ভাই যখন মারা যাছে মেয়েটি তখন তার মৃত্যুশয্যায় বসে। সে বলে উঠ্‌লো তার মাকে: "মা, মা, দেখ—ভাইয়ের দেহটার চারিদিকে কেমন একটি কুয়াশাময় জিনিস! কি ওটা?" মা কিন্তু তার কিছুই দেখতে পেল না। মেয়েটি বললো: "বাষ্পটা তার ভাইয়ের দেহ থেকেই বেরিয়ে এলো"। বিজ্ঞানীরা এ' বিষয়টি ইউরোপে গবেষণার বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ঐ বস্তুটির নাম দিয়েছেন তাঁরা 'এক্টোপ্লাজম্' বা সূক্ষ্ম-বহিঃসত্তা'। এটি বাষ্পময় বস্তু এবং এর কোন একটি নির্দিষ্ট আকার

নাই। একে দেখতে একখণ্ড ছোট মেঘের মতো, কিন্তু যে-কোন একটা মূর্তি বা আকার এ' নিতে পারে, আর তাই এর ছবিও তোলা যায়। কিন্তু আসলে যে এটি কি বস্তু তা তাঁরা বলতে পারেন না, অথচ এর কোন অস্তিত্বও অস্বীকার করতে পারেন না।

আসলে কথা এই যে, আমাদের দেহ থেকে সকল সময়েই ঐ ধরনের পদার্থ নির্গত হচ্ছে। একে দেখা যায়—বিশেষ ক'রে যখন কোন মিডিয়াম (প্রেতাহ্বায়ক) অচৈতন্য অবস্থায় থাকে। মিডিয়ামকে সহায় ক'রেই প্রেতাত্মারা দেহ ধারণ করে এবং যে-সব মিডিয়ামকে ভিত্তি ক'রে প্রেতাত্মারা মূর্তি পরিগ্রহ করে তাদের দেহ থেকে বেশি ক'রে ঐ এক্টোপ্লাজম্ ক্ষরিত হ'তে থাকে। আমি নিজে প্রেতাহ্বায়ক বৈঠকে ঐ ধরনের এক্টোপ্লাজম্ নির্গত হতে দেখেছি। অবশ্য পেশাদার মিডিয়াম ব্যতীত বক্তিগত বৈঠকেই ওরকম হ'য়ে থাকে। আমি হাত দিয়ে তা দেখছি ও স্পর্শ করেছি। তবে আরো যখন এক্টোপ্লাজম্ স্পর্শ করি তখন এমন নির্দিষ্ট কোন স্পর্শ বা অনুভূতি পাই নি।

একে (এক্টোপ্লাজম্‌কে) ঠিক বর্ণনা করাও যায় না, কিন্তু যখন কোন আকার এ' ধারণ করে তখনই আমাদের রক্ত-মাংসের শরীরের মতো শ'ক্ত ব'লে অনুভূত হয়। তখন যে কোন আকারও এ' ধারণ করতে পারে।

যে সব শক্তি আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে, মরণের সময়ে (দেহত্যাগ করার সময়ে) সে'গুলি একটি কেন্দ্রে একীভূত হয়, আর তারই জন্য আমরা দেখি যে মরণোন্মুখ মানুষের দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়, ইন্দ্রিয়দের অনুভব করার শক্তি কমে যায় এবং ক্রমশঃ সমস্ত দেহটিই নিস্তেজ ও স্থির হ'য়ে আসে। দেখা গেছে, ঠিক এ'সময়েই দেহের সূক্ষ্মশক্তিগুলো সতেজ ও প্রবল হয়ে ওঠে। কোন কোন মরণোন্মুখ মানুষের দূরশ্রবণ ও দূরদৃষ্টিও এ' সময়ে প্রবল হয়। এমন কি সে সময়ে কিংবা মরণের ঠিক অব্যবহিত পরেই প্রেতশরীর নিয়ে তারা নিকটে বা দূর-আত্মীয়দের কাছে হাজির হয় ও আত্মপ্রকাশ করে এবং তাদের নিজেদের খবরও সেই সব আত্মীয়দের দেয়। বিজ্ঞানীরা এ'সব ঘটনা লিপিবদ্ধ ক'রে রেখেছেন। বিখ্যাত কেমিলি ফ্লামাবিয়ন তাঁর 'দি আন্‌নোন'-গ্রন্থে এ'ধরনের সকল রকম খবর লিপিবদ্ধ ক'রে রেখেছেন। তিনি বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে থেকে প্রেতাবতরণের খবর সংগ্রহ করেছেন—যে সমস্ত ঘটনা মরণোন্মুখী মানুষের দেহত্যাগের সময় বা দেহত্যাগের ঠিক কিছু আগে বা পরে সংঘটিত হয়েছে। এ'রকমের পাঁচশত

ঘটনা যদিও যোগাড় করা হয়েছে বটে, কিন্তু সঠিক ও বিশ্বাস্য হিসাবে তাদের মধ্য থেকে কতকগুলিকে মাত্র গ্রহণ করা হয়েছে এবং তিনি তার 'দি আন্নোন'-গ্রন্থে এ'সকল প্রকাশ করেছেন। এখন এসব ঘটনা থেকে প্রমাণ হয় যে, ওগুলি পার্থিব দেহের পরিণতি বা জড়দেহ থেকে উৎপন্ন কোন-কিছু নয়।

'এক্টোপ্লাজম্'-পদার্থটি কম্পনশীল সূক্ষ্ম-জড়কণা দিয়ে এবং ঐ সূক্ষ্ম জড়কণাগুলিই শাশ্বত আত্মার ভিতরের ও জড়দেহের বাইরের আবরণ সৃষ্টি করে। সুতরাং দেখা যায় যে, মানুষের দু'টি দেহ আছে : একটি পার্থিব জড়দেহ ও অপরটি সূক্ষ্ম-বায়বীয় দেহ। এই দু'টি দেহ আমাদের সকলেরই আছে। এখুনি হয়তো সূক্ষ্মদেহটিকে ধরতে বা বুঝতে পারি না, কেননা আমাদের দৃষ্টি ও ইন্দ্রিয়গুলি তৈরী জড়পদার্থগুলিকে ব্যবহার করার জন্য। তাই সূক্ষ্মদেহকে যতক্ষণ না ইন্দ্রিয়ের রাজ্য বা সীমাভুক্ত করতে পারছি ততক্ষণ আমরা তাকে উপলব্ধির উপযুক্ত করতে পারব না। ইন্দ্রিয়ের রাজ্য বা সীমানা নির্ভর করছে জড়কণাগুলির নির্দিষ্ট একটি স্পন্দনাবস্থার ওপর। যেমন, আমরা আলো দেখি—ঠিক তখনই যখন আলোককম্পনগুলি আমাদের দৃষ্টি-রাজ্যের সীমানা-পথে এসে হাজির হয়। আমাদের দৃষ্টি লাল থেকে বেগুনে রঙ্‌গুলি ধরতে পারে, কিন্তু যতটুকু লালরঙের উপযোগী কম্পন হওয়া উচিত তার কিছু কম হলেই আর আমরা লালরঙ চোখ দিয়ে ধরতে পারি না। তাই লালরঙ্ আমাদের দৃষ্টিপথে আসতে গেলে তার কম্পন-সংখ্যা-পরিমাণ ততটুকু হওয়া উচিত এবং তাহলেই চক্ষুরিন্দ্রিয় দিয়ে আমরা তা ধরতে পারি। শব্দের বেলায়ও তাই। এমন অনেক শব্দ আছে যা আমাদের কানে পৌছায় না, কেননা আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় হয়তো ঠিকমতো শক্তিশালী নয়। তেমনি আমরা আমাদের সূক্ষ্মদেহটাকে দেখতে বা স্পর্শ করতে পারি না যতক্ষণ না তা আমাদের দৃষ্টিপথে বা স্পর্শসীমানায় এসে পৌছায়। এই পৌছানকেই আমরা বলি জড়ীকরণ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যকরণ। জড়ীকরণটা হল অত্যন্ত দ্রুত স্পন্দায়মান সূক্ষ্ম পদার্থটিকে নিম্নস্পন্দনযুক্ত স্তরে নামিয়ে আনা—যার জন্য আমরা দেখতে, শুনতে বা স্পর্শ করতে পারি আমাদের পার্থিব ইন্দ্রিয় দিয়ে।

প্রগতিশীল বিজ্ঞানীদের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে বেদান্তদর্শনের বেশ মিল আছে। বিজ্ঞানীরা বলেন, মন ও চেতন জীবাত্মাই নানা রকম রোগ, মরণ ও জড়দেহ সৃষ্টি করার প্রধান কারণ। এ'ধারণা অবশ্য আমরা আমাদের সুপ্রাচীন দর্শনগ্রন্থ বেদান্তেও পাই। সত্য কখনও পুরাতন হয় না। যে সত্য

পাঁচ হাজার বছর আগে আবিষ্কৃত হয়েছে, আজও তা অটুট আছে ও থাকবে, এবং আধুনিক বিজ্ঞানীরা সেই সত্যই আবিষ্কার করবে। কারণ আমাদের মনে রাখা উচিত যে, সত্য কখনও দু'রকম বা বিচিত্র রকমের হয় না, সত্য চিরকালই এক ও অখণ্ড। অবশ্য একটি চরম অবস্থায়ই সত্য নিরপেক্ষ ও পরিপূর্ণ হয়ে বিকাশ লাভ করে, অন্যথা দেশ-কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ হলে তা প্রতীয়মান, প্রাতিভাসিক বা আপেক্ষিক সত্য ব'লে পরিচিত হয়। ঐ পরমসত্যই হয়তো অনেক বছর আগে আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার জন্যও তার কোন পরিবর্তন হয়নি। তার কারণ নিরপেক্ষ সত্য অনন্ত ও পরিবর্তনহীন। বেদান্তে আন্তর-দেহকেই 'সূক্ষ্মদেহ' বলে এবং বেদান্তের মতে এই সূক্ষ্মদেহই আত্মার আন্তর-আবরণ আর পার্থিব জড়দেহটা হ'ল তার বাইরের আবরণ। আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা যখন কোন-একটা কাজ শেষ করে বা নির্দিষ্ট কোন সুখ চরমভাবে অনুভব করে বা তার বাসনা সম্পূর্ণ চরিতার্থ করে তখন তার বহিরাবরণ দেহটা আর ঠিক ঠিক ভাবে কার্যকরী হয় না, অর্থাৎ যথোপযুক্তভাবে কাজে লাগে না বা তার আর কোন উপযোগিতা থাকে না আর তখনই সে তার জীর্ণ অকেজো জড়দেহ ত্যাগ করে ও কাজের উপযোগী নতুন একটা দেহ গ্রহণ করে। যেমন কোন একটা মোটর-যন্ত্র আমরা দু'বছর ব্যবহার করার পর হয়ত দেখি যে সেটা কাজের অনুপযুক্ত হয়ে গেছে এবং তখনই সেটা আমরা পরিত্যাগ ক'রে নতুন একটা মেসিন বা যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করি, কেননা পুরাতন যন্ত্রের কলকব্জাগুলো অকেজো হ'য়ে যায়। ঠিক এ'রকমই দেহ সম্বন্ধে বলা যায়। এজন্য জীবাত্মাকে আমরা দোষ দিতে পারি না কেননা দেহ হ'ল আমাদের জীবাত্মার কর্মোপযোগী উপায় বা যন্ত্রবিশেষ, জীবাত্মা তাকে মাধ্যম বা অবলম্বন করেই তার সমস্ত শক্তির বিকাশ ক'রে, তার জন্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, নানান্ শিক্ষার কৌশল পায় ও নতুন নতুন জ্ঞান অর্জন করে। এ'রকমভাবে চেতন জীবাত্মা পূর্ণবিকাশের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়, ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তর অবস্থায় উপনীত হয় এবং প্রতিটি বিকাশের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করে।

জীবনের এই ধারণা মরণ-রহস্যের ব্যাখ্যায় সহায়তা করবে। যখন জানা গেল যে, মরণ সৃষ্টি করবার বস্তু একটি আছে তখন মরণ তো আর কুহেলিকা-প্রহেলিকাময় রইলো না। মরণ মানে তখন আর ধ্বংস, নাশ বা লোপ

রইলো না, তখন তার মানে হল সমবেত বস্তুসমূহের স্বতন্ত্রীকরণ, অর্থাৎ যে-সব পদার্থের সমবায়ে একটি জীবন রূপ পেয়েছিল সেই পদার্থসমূহ বিশ্লিষ্ট ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। কে বলতে পারে ক্লিওপেট্রার দেহের অণুকণাগুলি আজকের কোন দেহ-গঠনের কাজে লাগেনি? লক্ষ লক্ষ দেহের বস্তুসকল বিশ্লিষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আবার তাই থেকে লক্ষ লক্ষ দেহের সৃষ্টি হচ্ছে নতুন ক'রে। জীবনকে কখনো তরুলতারূপে, কখনো প্রাণীরূপে সৃষ্টি করেই সেই পদার্থগুলি রূপ পাচ্ছে। সুতরং দেখা যাচ্ছে, জীবন-মরণ শুধু আবর্তন মাত্র। কোন-কিছুই ধ্বংস হয় না, কেবল রূপান্তরিত হয়। জীবাত্মার কখনো মৃত্যু হয় না। কারণ, মরলে সে যাবে কোথায়? শূন্যে মিলিয়ে যাবে? না, তা সম্ভব নয়। বিজ্ঞান বলে, একবার যা ছিল, নিত্যকাল তা থাকবে, তার ক্ষয় বা বিলুপ্তি ঘটতে পারে না; দেহেরও তাই পরিবর্তন বা রূপান্তর হয় মাত্র। কিন্তু তার (দেহের) সত্যিকার কোন সত্তা নাই, কারণ তা সর্বদা পরিবর্তনশীল। শৈশব হ'তে কৈশোরে, কৈশোর হ'তে যৌবনে, যৌবন হ'তে প্রৌঢ়ত্বে, প্রৌঢ়ত্ব হ'তে জরায় তো তার কেবলই পরিবর্তন হয়ে চলেছে। এই মুহূর্তে যে শরীর আমাদের আছে, পরমুহূর্তেই তার পরিবর্তন হয়, কাজেই শরীরের পদার্থগুলি ক্রমাগত হ্রাস ও বৃদ্ধি, ক্ষয় ও সৃষ্টির ভেতর দিয়ে বিবর্তিত হ'য়ে থাকে। দেহটিকে তাই ঘূর্ণায়মান জলস্রোতের সঙ্গে তুলনা করা যায়। জড়পদার্থের অণুগুলি ক্রমাগতই ঘুরছে এবং আমাদের দেহটিকে রক্ষা ও পুষ্ট ক'রে চলেছে। অণুগুলির পরিবর্তনের আর বিরাম নাই, অথচ সচঞ্চল অণুগুলি দেহের গঠনভঙ্গি ও আমাদের ব্যক্তিত্ব ঠিক রেখে দেয়।

অবিরাম অবিচ্ছিন্ন পরিবর্তনের মাঝে এমন একটা জিনিষ আছে যা সর্বদা শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয়। আত্মচৈতন্যই সেই অপরিবর্তনীয় বস্তু। দেহ তার উপকরণ বা পরিচ্ছদ। আমাদের দেহের কোন অংশ যদি এক্স-রে বা রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখি, দেখব—হাতের বা দেহের অংশটি কুয়াসাময় পদার্থকণিকায় পরিপূর্ণ এবং চারিদিকে যেন তারা ঝুলছে। সুতরাং যে দেহকে আমরা জড় পদার্থ বলি আসলে সেটা জড় নয়, তা মেঘের বা কুয়াসার মতো এক পদার্থবিশেষ। মৃত্যুর পর আত্মা (জীবাত্মা) পার্থিব লোক ত্যাগ ক'রে অম্বরলোকে গমন করে, সেই চৈতন্যলোক অপর একটি স্তরবিশেষ। যতক্ষণ বেঁচে থাকি ততক্ষণ আমরা বাস করি তিনটি মাত্র স্তরে। সেই তিনটি স্তর ছাড়া ঐন্দ্রিয়িক বিষয়ের বা ইন্দ্রিয়ানুভূতির

বাইরে আর একটি স্তর আছে। পার্থিব স্থূলশরীর সেখানে যেতে পারে না। এমন কি পৃথিবীর বা কোন গ্রহ-নক্ষত্রের গতিরও সেখানে স্থান নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা সেই স্তরে পৌছুতে পারি ততক্ষণ তার কল্পনাও আমরা করতে পারি না। একেই চতুর্থ স্তর (ফোর্থ ডাইমেন্‌সন্) বলে।[৫] এখন প্রশ্ন হ'ল: মানুষের মৃত্যুর পর তার আত্মা যায় কোথায়? মৃত্যুর পর পার্থিব তিনটি স্তরের মায়াকে ছিন্ন ক'রে আত্মা বা জীবাত্মা ঐ চতুর্থ স্তরে গমন করে। অবশ্য স্তরগুলির চক্রের মধ্যে চক্রের স্থিতির মতো তৃতীয়ের সঙ্গে চতুর্থ স্তরের একটা পারস্পরিক সম্পর্ক থাকে।

বিজ্ঞানের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, দেহের অণুকোষগুলি ক্রমাগতই পরিবর্তনশীল, কিন্তু এদের পরিবর্তন আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। সত্যই কি আমরা এদের সম্বন্ধে কিছু জানতে পারি? না, কোন-কিছু বিষয়ই আমরা, সাধারণত জানি না। তবে ইন্দ্রিয় ও পার্থিব বস্তুর সম্পর্ক থেকে মনকে তুলে নিয়ে স্থিরভাবে বসলে চতুর্থ স্তরের স্থির অচঞ্চল অবস্থাকে আমরা অনুভব করতে পারি। তখন ঠিক ঠিক শান্ত অবস্থা আমাদের অনুভূত হয়, নচেৎ ক্রমাগতই পরিবর্তনের স্রোত আমাদের দেহের মধ্যে ছুটে চলে, আমরা সে অবস্থার কথা জানতে পারি না। মরণের পরে জীবাত্মার অবস্থাও তাই; জড়শরীরের কোন পরিবর্তনই জীবাত্মা ঠিক ঠিক ভাবে জানতে পারেন না।

সুতরাং আমাদের শরীর একটি যন্ত্রবিশেষ এবং আত্মার বহির্বাস-মাত্র। বেদান্তের মতে, মানুষ যখন পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে তখন তাকে ঠিক মৃত বলা যায় না। সে পরিবর্তনের পথযাত্রী—একথাই বলা যায়। মৃত্যুর

৫। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে সাধারণত চারটি বিকাশের স্তর ভাগ করা হয়। প্রথম স্তরের (ফার্ষ্ট ডাইমেনসন্) জীবজন্তু…সরীসৃপজাতীয় প্রাণী, যারা বুকে হেঁটে চলে যেমন কেঁচো প্রভৃতি। এই জাতীর জীবরা একটি দিকেই যায় এবং সে দিকে বাধা পেল আর চলে না। (২) দ্বিতীয় স্তরের (সেকেণ্ড ডাইমেনসন্) জীব চতুষ্পদ জাতীয় প্রাণী, যেমন…গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি। তারা দু'টি দিকে যেতে পারে। সম্মুখে বাধা পেলে তারা আবার গতি পরিবর্তন করে ভিন্ন দিকে যেতে পারে। (৩) তৃতীয় স্তরের (থার্ড ডাইমেনসন্) জীব মানুষ ও মানবজাতীয় জীব, যাদের গতি তিন দিকে। অর্থাৎ সামনে বা চতুঃপার্শ্বে বাধা পেলেও তারা উপরের দিক দিয়ে অতিক্রম করতে পারে, কিন্তু তিনটি দিকই বন্ধ এমন একটি ঘরে তাদের আবদ্ধ ক'রে রাখলে আর তারা যেতে পারে না। (৪) চতুর্থ স্তরের (ফোর্থ ডাইমেনসন্) জীব সকল জীবের আত্মা। তার গতি চারিদিকে অর্থাৎ সকল দিকে।

অর্থ পরিবর্তন। এই পরিবর্তন চেতনার একস্তর হ'তে অন্যস্তরে 'বিবর্তন', আর বিদেহী আত্মার এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় 'অবস্থান্তর'। মৃত্যুতে জীবাত্মা জীর্ণবাসের মতো জীর্ণ জড়শরীর ত্যাগ করে। একেই মৃত্যু বলে। ভগবদ্গীতায় (২।২২) এই অবস্থাটিকে সুন্দরভাবে বর্ণনা ক'রে বলা হয়েছে,

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়,
নবানি গৃহ্নানি নরোঽপরাণি,
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।

চতুর্থ অধ্যায়

॥ মরণের পর আত্মা ॥

মরণের পর জীবাত্মার কি হয়—এই প্রশ্ন পৃথিবীর বুকে মানুষের সৃষ্টি হওয়ার পর থেকেই জেগেছে। প্রায় সব জাতি ও সকল সম্প্রদায়ই দেশে দেশে কালে-কালে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রে আপন-আপন ক্ষমতা-অনুসারে তার উত্তর দেবার চেষ্টা করেছে। কারো সমাধানের রূপ পেয়েছে তত্ত্ব ও বিশ্বাসের মধ্যে, কারো পুরাণ ও কাব্যের মধ্যে, কারো দর্শন বা বিজ্ঞানের মধ্যে। ঐ এক প্রশ্নের উত্তর মিলেছে নানা রকমের। পৃথিবীর সমস্ত ধর্মমতই এই সব সমাধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন ও নবীন সমস্ত দর্শন ও বিজ্ঞান জীবনরহস্যের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সমাধান খুঁজে বার করতে পারেনি। অবশেষে নিরাশ হয়ে তারা বলেছে, মরণরহস্য ভেদ করা মানুষের বুদ্ধির সাধ্য নয়। এর ফলে কেউ কেউ হয়ে গেছে একেবারে বস্তুতান্ত্রিক ও প্রত্যক্ষবাদী, কেউ হয়েছে নাস্তিক, কেউ বলেছে যতদিন দেহ থাকে ততদিনই আত্মা থাকে; দেহের মৃত্যুর পর সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও মৃত্যু হয়। কেউ কেউ এমনও সিদ্ধান্ত করেছে যে, বিশিষ্ট সত্তা ব'লে কোন বস্তু নেই, আমাদের জীবন দীপশিখার মতো; দীপ না থাকলে যেমন তার শিখা থাকে না, তেমনি দেহ না থাকলে আত্মাও থাকতে পারে না। দেহ নষ্ট হ'য়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে সব শেষ হ'য়ে যায়, তার আর কোন কিছুই থাকে না। কিন্তু এ'সব কথা শুনে কি মনের সব কৌতূহল-জিজ্ঞাসা থেমে যায়? কোনমতেই না। প্রত্যেক মানুষই অবিনাশী আত্মার সম্বন্ধে জানার স্বাভাবিক ইচ্ছাকে নিবৃত্ত করতে চায়, তারা আত্মসত্তাকে নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছে। তাই ওকথা হাজার বার শুনলেও মন মানতে চায় না যে, মরণের পর মানুষের আর কোন সত্তা থাকবে না। আমাদের বিচার-বুদ্ধিও তৃপ্ত হ'তে চায় না ওতে। আর সান্ত্বনাই বা ওতে কি পাওয়া যায়? কঠোপনিষদে যম বলেছেন:

'অজ্ঞতার অন্ধকারে আছে যে-সব অবোধ লোক, অবিদ্যার অহংকারে যারা মত্ত, পণ্ডিতম্মন্য যারা তারা অন্ধের দ্বারা চালিত অন্ধের মতো'।

ধন-কামনা ও পার্থিব সম্পদ-লালসায় প্রলুব্ধ ও প্রবঞ্চিত অবোধ শিশুর মতো মানুষদের মনে পরলোকের সত্তা অনুভূত হয় না। এরা বলে, এই পৃথিবী ছাড়া পরলোক নামে কোন কিছু নেই।[১]

যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাবের হাজার বছর আগেই একথা উচ্চারিত হয়েছিল ভারতে। ভারতের প্রাচীন ঋষিদের জ্ঞানের মধ্যে অন্যতম বিষয় হচ্ছে আত্মার অমরত্ব। ভারতের প্রাচীনতম রচনা ঋগ্বেদের মধ্যেই আত্মার মরণোত্তর সত্তার ওপর বিশ্বাসের কথা পাওয়া যায়। শুক্লযজুর্বেদের ঈশ-উপনিষদে দেখা যায়ঃ

'হে ঈশ্বর, আমায় বিশ্বের সেই অক্ষয় আলোকের উৎস-স্থানে নিয়ে গিয়ে অমর কর'।[২]

একটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মন্ত্রে আছেঃ যাও যাও, সেই পথে যাও—যে প্রাচীন পথে গেছেন আমাদের পিতৃপুরুষেরা ; সকল পাপ দূরে ফেলে দিয়ে জ্যোতির্ময় দেহে ফিরে যাও, পরে সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হও'।[৩]

বেদে এমন অনেক অনুচ্ছেদ আছে যাতে প্রাচীন আর্যদের আত্মার মরণোত্তর সত্তার বিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে। মৃত্যুর পর মানুষ যেখানে যায় সে স্থানকে প্রাচীনেরা 'পিতৃলোক' বলতেন। সে রাজ্যের রাজা হচ্ছেন যম। যিনি ছিলেন প্রথম মানুষ। তিনি সেখানে গিয়ে অমর হয়েছিলেন।

প্রাচীন আর্য বা হিন্দুরা একটি মাত্র স্বর্গে বিশ্বাস করতেন ; তার নাম তারা দিয়েছিলেন, 'ব্রহ্মলোক' অর্থাৎ প্রজাপতি ব্রহ্মার রাজ্য। হিন্দুদের মধ্যে কর্মবোধ ও নীতিবোধের উদ্বোধন হবার পর থেকে তাঁদের এই বিশ্বাস হ'ল যে, যাঁরা ভাল কাজ করেন তাঁরা তাঁদের কর্মের ফলভোগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে থাকেন। তারপর আবার তাঁদের পৃথিবীতে জন্ম নিতে হয়

১। 'অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরা পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ। দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ় অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥'—কঠ-উপনিষদ ১।১।৫

২। 'ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তঃ বিত্তমোহেন মূঢ়ম্। অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী, পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে॥'—কঠ-উপনিষদ, ১।২।৬

৩। অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্, বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্, যুয়োধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিম্ বিধেম।'—ঈশ-উপনিষদ ১।১৮

প্রেহি প্রেহি পথিভিঃ পূর্ব্যেভিঃ যত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেয়ুঃ উভা রাজানা স্বধয়া মদন্তা যমং পশ্যাসি বরুণং চ দেবম্।'—ঋগ্বেদ ১০।১৪।৭।৮

আপন-আপন কামনা ও কর্ম-অনুসারে। এদের বিশ্বাস ছিল—চন্দ্রলোকেই পিতৃপুরুষদের প্রেত-আত্মারা থাকেন। পৃথিবীতে প্রাণের বীজ ঝরে পড়ে চাঁদ হ'তে। এই ছিল তাঁদের ধারণা। প্রেতাত্মারা যে পথে চন্দ্রলোকে গিয়ে পুণ্যকর্মের ফলস্বরূপ আনন্দ ভোগ করে তাকে বলতেন পিতৃযান।[৪]

কোন লাভের আশা না ক'রে যাঁরা কাজ করেন, যাঁরা শুদ্ধ ও পবিত্র জীবন যাপন করেন তাঁরা যান ব্রহ্মলোকে। বিবর্তন শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা সেখানেই থাকেন। ইতিমধ্যে কেউ যদি আত্মজ্ঞানী হন তা হ'লে তিনি মোক্ষ লাভ করেন, অর্থাৎ তাঁর ব্রহ্মত্ব লাভ হয়। এই ব্রহ্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ ও পরমজ্ঞান, এই জ্ঞানে মানুষের ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্নতা প্রতিপালিত হয়, অনন্তকাল ধ'রে অদ্বিতীয় সত্তায় জ্ঞানী প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

ব্রহ্মা হচ্ছেন দেবতার রাজ্যের অধিপতি। একটি স্বর্গ বা সৃষ্টি শেষ হ'লে তিনিও মুক্ত হ'য়ে যান। নতুন সৃষ্টির প্রারম্ভে আবার একজন নতুন ব্রহ্মার আবির্ভাব হয়। অনন্তকাল ধ'রে এই আবর্তন চল্‌তে থাকে। দেবযান ও পিতৃযান দুটি পথের উল্লেখ উপনিষদে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে —অবশ্য রূপকের ভাষায়। কিভাবে মানুষ মরে গেলে তাদের আত্মা দেবযান অথবা পিতৃযান দিয়ে দেবলোকে ও পিতৃলোকে গমন করে—উপনিষদগুলি সে-সব সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য জীবাত্মাদের এজন্য বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করতে হয় এবং অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন অভিজ্ঞতাও তারা লাভ করে। মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত তারা পৃথিবীতে আবার ফিরে আসে, পুনরায় ঐ দুটি লোকে এভাবে অনন্তকাল ধরে তাদের যাতায়াত চলতেই থাকে। তবে যাঁরা দেবলোকে যাবার পরও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে পারেন না, তাঁরা আবার পৃথিবীতে এসে মহামানব-রূপে জন্মান। পৃথিবীতে এসে তাঁরা আত্মজ্ঞান-লাভের জন্য সাধনা করেন। এই সাধনপন্থাকেই দেবযান বলে। 'দেবযান' অর্থে দেবতাদের (দেবত্ব লাভ করার) পথ।

সচ্চিদানন্দরূপ অনন্ত উৎস থেকে ব্রহ্মা আবির্ভূত হন এবং সেই স্বর্গ বা সৃষ্টির স্রষ্টা ও নিয়ন্তা-রূপে তিনি প্রতিষ্ঠিত হন। একজন ব্রহ্মা যান ও আর একজন আসেন। যাঁরা দয়ালু, পরোপকারী ও ধার্মিক তাঁরাই পিতৃযানে গমন করেন। তাঁদের মরণের পর আত্মা প্রথমে ধূম্রজালের

৪। সম্বৎসরো বৈ প্রজাপতিস্তস্যায়নে দক্ষিণঞ্চোত্তরঞ্চ ; তদ্‌ যে হ বৈ তদিষ্টাপূর্তে কৃতমিত্যুপাসতেঃ তে চান্দ্রমসমেব লোকং অভিজায়ন্তে। তে এব পুনরাবর্তন্তে * *।'—প্রশ্ন-উপনিষৎ ১।৯

ভেতর দিয়ে, তারপর রাত্রির মধ্য দিয়ে, পনের দিন আঁধারের ভেতর ও ছ'মাস দক্ষিণায়নের পথে যান। সেই সময় সূর্য দক্ষিণ দিকে গমন করে। সেখানে থেকে আত্মা পিতৃলোক, পিতৃলোক থেকে চন্দ্রলোকে যায়।

এই সব প্রত্যেক লোকেরই এক-একটি অধিদেবতা আছে। এঁরাই সে-সব স্থানে আগত আত্মাদের দেখিয়ে-শুনিয়ে পরিচয় করিয়ে দেন। সেখানে তাঁদের পরলোকগত আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা হয়। যতদিন বিদেহী আত্মাদের কর্মফলভোগ শেষ না হয় ততদিন তারা সেখানেই থাকে। তার পর যখন সেখান থেকে তারা বিদায় গ্রহণ করে তখন তারা অদৃশ্য সূক্ষ্মদেহ নিয়ে আকাশের মধ্যে দিয়ে বায়ুতে প্রবেশ কয়ে, বায়ু থেকে মেঘ, সেখানে থেকে বৃষ্টি বিন্দুর সঙ্গে তারা পড়ে ধরণীতে, তারপর কোন খাদ্যের সঙ্গে মানব-দেহে প্রবেশ ক'রে আবার তারা জন্ম নেয়।

এইভাবে এ'ক্ষেত্রে যে রীতির কাজ হয় তাকেই আধুনিক বিবর্তনবাদীরা বলেন—'প্রাকৃতিক নির্বাচন' (ন্যাচারল্ সিলেকসন্) এই নিয়মে বিদেহী আত্মা খাদ্যের ভেতর দিয়ে এমন লোকের আশ্রয় গ্রহণ করে যার সাহায্যে সে তার বাসনা চরিতার্থ করার অনুকূল পরিবেশ পায়। এই অবস্থায় সমস্ত মানসিক সত্তার এমন সঙ্কোচ হয় যে, তার আর পূর্বস্মৃতি থাকে না। তারপর আপন-আপন স্বভাব অনুসারে সে সৎ—কি অসৎ হয়।

কিন্তু যারা শুদ্ধ-অন্তঃকরণে ভক্তির সহিত ঈশ্বরের আরাধনা করে, যারা কোন বিনিময়ের আশা না রেখে পরের উপকার করে নিঃস্বার্থ ভাবে এবং ব্যক্তিগত বিশেষ কোন দেবতায় বিশ্বাসী, যারা দ্বৈতবাদী অথবা একেশ্বরবাদী তারা দেবযানে স্বর্গলোকে যায়। উপনিষদে আছে,

'তারা প্রথমে যায় আলোকে, সেখান থেকে দিনে, বর্ধমান অর্ধচন্দ্রে, তারপর ছ'মাসে উত্তরায়ণের পথে, সেখান হ'তে দেবলোকে, তারপর সূর্যে তারপর তড়িৎলোকে; সেখানে এক উচ্চস্তরের জীব এসে তাদের নিয়ে যান ব্রহ্মলোকে এবং এই পর্যায়ের শেষ অবধি সেখান তারা থাকে'।[৫]
তখনো যদি তারা পরমতত্ত্বের উপলব্ধি না করতে পারে তো তাদের ফিরে যেতে হয় পরবর্তী পর্যায়ে।

অনেকে এগুলিকে পৌরাণিকী আখ্যায়িকা ও কবি-কল্পনা মনে করেন। এ-সব বিষয়ে অর্থ যিনি যেমন ভাবেই করুন না কেন, এইটুকু সত্য অন্তত

৫। বৃহদারণ্যক-উপনিষদ ৬ ২ ১৫; ছান্দোগ্য-উপনিষৎ ৫।১০।১; ভগবদ্গীতা ৮।২৪

এ'থেকে পাওয়া যায় যে, প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকেরা উপলব্ধি করেছিলেন আত্মার অমরত্ব। খুব কম ধর্মেই এমন ভাবধারা দেখা যায়। জোরোষ্ট্রীয়, খ্রীষ্ট অথবা ইসলামধর্ম স্বর্গকেই শেষ-গন্তব্য স্থান বলে মনে করে। স্বর্গকে একটা চিরস্থায়ী এবং অক্ষয় স্থান ব'লে কল্পনা করা হয়েছে এই সব ধর্মে। এখানে দুঃখের লেশমাত্র নাই, অনন্তকাল সুখভোগ করা চলে। কিন্তু হিন্দুধর্মে তা হয়নি। হিন্দুধর্মের মতে সব লোক—এমন কি স্বর্গলোকেও কিছুকালের জন্য স্থায়ী হতে পারে—কোটি কোটি বছর তবু তা অপরিবর্তনীয় চিরস্থায়ী নয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন,

'ব্রহ্মলোক থেকে শুরু ক'রে সব লোকই এমন ধরণের স্থান সেখান থেকে ফিরে আসতেই হবে সকলকে; কিন্তু আমাকে যে লাভ ক'রে তার আর পুনর্জন্ম হয় না।'[৬] বেদান্ত এই সব উর্ধ্বলোকের বিশেষ কোন মূল্য দেয় না, তবে একে অস্বীকারও করে না।[৭]

হিন্দুশাস্ত্রে যেমন সিংহাসনারূঢ় ভগবানের উল্লেখ দেখা যায়, জেন্দ্ আবেস্তায়ও তেমনি। হিন্দুরা গোড়ার দিকে নরক বিশ্বাস করতেন না। পার্শীরা কিন্তু করতেন। মৃত্যুর পর আত্মার কি হয় এ-সম্বন্ধে আবেস্তায় উল্লেখ আছে। আবেস্তার এই ধারণাই প্রথমে ইহুদীধর্মে ও পরে ইহুদীদের মাধ্যমে ইসলামধর্মে প্রবেশ লাভ করে। তবে ওল্ড্ 'টেস্টামেণ্ট সে-বিষয়ে কোন কথাই বলে নি। নিউ টেস্টামেণ্টে অবশ্য এমন সব ধারণার উল্লেখ পাওয়া যায় যেগুলি পার্শীদের চিন্তাধারার সঙ্গে মেলে। মনে হয়, পরবর্তীকালে পার্শীদের এই ধারণা ইহুদীদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করেছিল। পার্শীরা বিশ্বাস করে যে, বিচারের শেষদিন আছে এবং পুণ্য যখন পাপকে অভিভূত করে তখনই সকল মানবাত্মার পুনরুত্থান হয়। প্রাচীন হিব্রুরা এ'সব তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তাঁরা মনে করতেন, ঈশ্বরই মানুষকে ফুঁ দিয়ে প্রাণবায়ু দেন, মৃত্যুর পর সেই প্রাণ বা আত্মা ঈশ্বরের কাছে আবার ফিরে যায়। কিন্তু হিব্রুরা যখন পার্শীদের সংস্পর্শে এলো তখন পাপ-পুণ্য ও শেষ বিচারের ধারণা প্রভৃতিও তারা গ্রহণ করলো।

৬। 'আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন, মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। ...গীতা, ৮, অ ১৬

৭। শখ্যায়ণ-আরণ্যক (৩।১০৭) কৌষীতকিব্রাহ্মণ উপনিষদে (১।১-৬) এ'সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে।

মিশরবাসীদের পরলোকে বিশ্বাস ছিল, আত্মাকে তাঁরা বলতেন ছায়ার মতো 'দ্বিতীয় সত্তা' দেহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় সত্তারও নাশ হয়। মিশরবাসীদের মতো চ্যাল্ডিয়াবাসীদেরও অনুরূপ বিশ্বাস ছিল। তাঁরাও মৃত-দেহের পুনরুত্থান স্বীকার করতেন। এই বিশ্বাসই বর্তমান খ্রীষ্টানদের ভেতর পাওয়া যায়।

গ্রীক-দার্শনিকদের মধ্যে পিথাগোরাস, প্লেটো এবং তাঁর শিষ্যরা আত্মার অমরতা ও জন্মান্তরে বিশ্বাস করতেন। আত্মা-সম্বন্ধে প্লেটোর মতামত উপনিষদের মতের অনুরূপ। প্লেটো কিন্তু পাপীদের দণ্ডের একটা স্থান আছে মনে করতেন। যারা অসৎ কাজ করে তারা শাস্তি পায়, তারপর তারা শুদ্ধ হ'য়ে ভাল কাজ করলে তার জন্য পুরস্কার পায়। প্লেটোর বিশ্বাস ছিল যে, মানব-আত্মা নরদেহ অথবা পশুদেহ এ'দুইই গ্রহণ করতে পারে, আর পশুদেহ গ্রহণ করার পরও আবার মানুষের দেহে সে ফিরে যেতে পারে।

এ-সব থেকে এইটুকু বোঝ যাচ্ছে যে, মানুষের মরণোত্তর সত্তাসম্পর্কে নানা অনুমান রয়েছে। বেদান্তের মতে, ধ্বংস অর্থে মৃত্যু, ব'লে কোন কিছু নেই। বেদান্তে 'রূপান্তর' অর্থে মৃত্যুকে স্বীকার করা হয়েছে। এ'রকম মৃত্যু জীবনের নিত্য-সহচর। এমন রূপান্তর বা পরিবর্তন ছাড়া জীবন সম্ভবই নয়। প্রতিমুহূর্তেই আমাদের মৃত্যু হচ্ছে। প্রতি সাত বছর অন্তর দেহের সর্বাঙ্গের আমূল পরিবর্তন হয়ে যায়, তা হ'লেও আমরা কিন্তু বেঁচে থাকি, আমাদের সত্তার মধ্যে কোথাও কোন বিচ্ছেদ ঘটে না, আমাদের স্মরণশক্তি ঠিকই থাকে। কোন পদার্থগত বা রাসায়নিক নিয়মের দ্বারাই আত্মসত্তার এই অবিচ্ছিন্নতার ব্যাখ্যা করা যায় না। বেদান্ত বলে, কোন ভৌতিক অথবা আণবিক গতি হ'তে চিন্তা, বুদ্ধি ও অনুভূতির উৎপত্তি হ'তে পারে না। আমরা যাকে বলি আত্মিক শক্তি অথবা চিন্তাশক্তি, তার দ্বারাই ওটি সম্ভব।

সে-শক্তি কোন ব্যক্তিবিশেষের নয়, সে-শক্তি রয়েছে প্রকৃতির মধ্যে। সমগ্র বিশ্ব একটি প্রাণসত্তার অখণ্ড সমুদ্র; সমস্ত বুদ্ধি ও চেতনার উৎস সেই প্রাণসত্তা। আমাদের ব্যাষ্টিচৈতন্য সেই অনন্ত চৈতন্যের প্রতিবিম্ব বা প্রকাশ। সাগরতরঙ্গের মতো জীবনপ্রবাহের আদি-অন্ত খুঁজে পাওয়া ভার। ব্যক্তিগত জীবনে সেই অসীম জীবন-সমুদ্রের বুকে এক একটা প্রবাহ। সমুদ্রের অসংখ্য তরঙ্গ খেলা করে এবং সমুদ্র

যদি অনন্তকাল ধ'রে থাকৃত তবে তার তরঙ্গের কোনদিন বিরাম হ'ত না অনন্তকাল ধ'রে তার প্রবাহ চল্‌তে, আবার ফিরে আসত যেখান থেকে তার ধারা চলা আরম্ভ করেছিল। আমাদের ব্যষ্টিজীবনও তাই। অনন্ত কালসমুদ্রে আমরা ভেসে চলেছি এবং রচনা করেছি এক একটি বৃত্ত (সার্কেল)। আদি-অন্তহীন অতীত ও ভবিষ্যৎ জীবনধারা দিয়ে আমাদের জীবন তৈরী হচ্ছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকরা এ-ধরনের কোন অনন্ত বৃত্ত বা স্থানের অস্তিত্ব মানতে চান না, তাঁরা মানুষের জাতি বা শ্রেণীসৃষ্টির চিন্তাতেই ভরপুর। তাঁদের অভিমত হ'ল : ব্যষ্টিজীবন থাকলে পৃথিবীতে জাতি বা শ্রেণীর সৃষ্টি হত না। আসলে জাতি বা শ্রেণীটা মানুষেরই মনের বহিরভিব্যক্তি। এটি আমাদেরই চিন্তা বা আলোচনার পরিণতি, কেননা আমরা বিরাট প্রকৃতির প্রজা অথবা প্রকৃতির অপরিহার্য উপাদান। অনন্ত কালসমুদ্রের বুকে ব্যষ্টি প্রাণীজীবনগুলি বীজের আকারে প্রকাশ পায়, তাদের মধ্যে থাকে অনন্ত ভবিষ্যদ্-বিকাশের সম্ভাবনা এবং সেইগুলিই বিচিত্র রূপ নিয়ে অভিব্যক্ত হয় প্রাণীজগতে। একেই বলে প্রকৃতির বিকাশ বা অভিব্যক্তি। নানা সম্ভাব্যতাপূর্ণ এই ব্যষ্টিজীবন বিচিত্ররূপে প্রকাশ পেয়ে চলতে থাকে। যে রীতিতে এই প্রকাশ হয় তাকেই বলে 'বিবর্তন'—যার মানে হচ্ছে 'রূপান্তরসাধন'। পুরানো রূপ ফেলে দিয়ে নতুন রূপ না নিলে প্রকাশ সম্ভব হয় কী করে? এই রূপান্তরই তো মরণ। এই মরণ হয় বিশেষ একটা দেহের বা রূপের, আসল সত্তার নয়। একটি রূপের মরণে নতুন রূপের আবির্ভাব হয়। যার জন্ম হয় মরণ তার হবেই, সেই মরণ হ'তে ফের নতুন জন্ম হয়; এমনি ধারা চলতে থাকে অনন্তকাল ধ'রে।[৮]

বেদান্তের মতে, আত্মার জন্ম নেই, আত্মা শাশ্বত অমর, এর যেরূপ ইচ্ছা সেরূপ দেহ নিতে পারে। বাইরের স্থূলসত্তার কারণ হচ্ছে মনের বিকাশ, আর সেই বিকাশ হচ্ছে তীব্র কামনার ফলে। মানুষের ভবিষ্যৎ জীবন সেই কামনা-বাসনা দ্বারা গঠিত হয়।

বেদান্তে স্বর্গ বা নরকের বিষয় বিশেষ কোন বিচার আলোচনা দেখা যায় না। বেদান্তের মত হচ্ছে এই যে, যাঁরা স্বর্গে যেতে চান তাঁরা স্বর্গ সৃষ্টি ক'রে নিয়ে যেতে পারেন। যিনি নরকের চিন্তা করেন, তিনি নরকই দেখবেন। যাঁরা মনে করেন তাঁরা পাপী তাঁরা সত্যসত্যই পাপী। যাঁর যেমন ভাবনা সিদ্ধিও

৮। 'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।...গীতা'

তার তেমনি। তুমি যা ভাববে তাই হ'য়ে উঠবে। স্বর্গ ও নরক আসলে মানুষের মনেরই বিভিন্ন অবস্থা। বাইরে তাদের কোন স্বকীয় সত্তা নেই, যতকাল অজ্ঞানতা থাকে ততকাল তাদের স্বতন্ত্র সত্তার কথা মনে হয়। কিন্তু পরম সত্যের উপলব্ধি হ'লে আর জন্ম-মৃত্যু ব'লে কোন-কিছু থাকে না। আত্মা তখন বিরাজ করেন আপন মহিমায়।

পঞ্চম অধ্যায়

আত্মার পুনর্জন্ম॥

আত্মার পুনর্জন্ম হ'তে হ'লে তার আগে তার একটা চৈতন্যময় সত্তা থাকা চাই। এই সত্তা স্থূলদেহ হ'তে স্বতন্ত্র। 'আত্মা' বলতে এমন একটা স্বয়ংসচেতন ক্রিয়ার কেন্দ্র বোঝায়—যা আভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক বিষয়ের ওপর চিন্তা করতে পারে এবং সজ্ঞানে জীবনের যাবতীয় ক্রিয়া সম্পাদন করতে পারে। এই আত্মার উৎপত্তি এবং দেহনাশের পরে এক সত্তার বিষয় অতি প্রাচীনকাল থেকে মানুষকে অনুসন্ধিৎসু করেছে। সুপ্রাচীন কাল থেকে সকল দেশের সকল জাতির দার্শনিক ও সত্যদ্রষ্টারা জন্ম-মৃত্যু-রহস্যের সমাধান করতে চেষ্টা করেছেন। বার বার এই প্রশ্ন উঠেছে—কেন মানুষ এবং অপরাপর প্রাণী জন্মায়, আবার কিছুকালের জন্য বেঁচে থেকে কিছু বিস্ময়কর কাজ ক'রে ও কতক কাজ অসমাপ্ত রেখে যেতে বাধ্য হয়? কেন কেউ কেউ অতি অল্প কালের জন্যে মর্ত্যে আসে ও তারা এই পৃথিবীর বিষয় সমূহ ভাল ক'রে জানবার সুযোগ পায় না? প্রশ্ন জাগে, এইসব ব্যাপার কি আকস্মিক—নাকি এ-সবের মধ্যেও কোন নিয়ম আছে? এই সব আবির্ভাব-তিরোভাব বা যাওয়া-আসা কি উদ্দেশ্যহীন, না—এদের পেছনে কোন পরিকল্পনা আছে?

এই সব প্রশ্নের কোন সমাধান না পেলে মানব-মন তৃপ্ত থাকতে পারে না। প্রতীচ্যের জড়বাদী দার্শনিকরা আত্মার অস্তিত্ব কিংবা সৃষ্টির উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে বিশ্বাস করেন না। অচেতন পদার্থ হ'তে চেতনার উদ্ভব হয় যান্ত্রিক নিয়মের ফলে এই তাঁদের মত। তাঁরা বলেন, কোন কোন জীবাত্মা পার্থিব স্থূলশরীর কেউ কেউ সূক্ষ্মশরীর, কেউ কেউ বা মানুষ অথবা পশুশরীর ধারণ ক'রে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে এবং শরীর ধারণ-ক্রিয়াটি সৃষ্টির ধারা অনুযায়ী অণু পরমাণুর সংমিশ্রণে সাধিত হয়। তাঁদের মতে, মরণের পর কোন জীবনের অস্তিত্ব থাকে না, সুতরাং আত্মার সত্তা, তার জন্ম অথবা পুনর্জন্ম বিষয়ে জিজ্ঞাসাও অনর্থক। তবে সত্যানুসন্ধিৎসুদের মন ও-সকল কথায় আশ্বাস পায় না, আর তাই তাদের প্রশ্নও থামে না। অপরপক্ষে দেখানো যায় যে, কেবল জড় অণু ও পরমাণুর সংমিশ্রণ থেকে কখনো চৈতন্য ও

বুদ্ধির সৃষ্টি হয় না—যে চৈতন্য ও বুদ্ধি সকল প্রাণীরই প্রয়োজনীয় বিষয় ও একমাত্র উপাদান।

গতি (motion) গতিরই সৃষ্টি করে, গতি থেকে কখনো ধারণা, অনুভূতি ও চিন্তার জ্ঞাতা বা বোদ্ধার সৃষ্টি হয় না। জ্ঞান বা চৈতন্য যে গতি থেকে সৃষ্টি হয় এ-কথা কেউ প্রমাণ করতে পারেননি। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে, প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর মধ্যে কোথাও কোন অদৃষ্ট বা আকস্মিকতার ঠাঁই নাই, সব কিছুই সার্বভৌমিক কার্যকারণ-সম্পর্কে গ্রথিত।

প্রতিটি ঘটনা—যা অতীতে সংঘটিত হয়েছে, ভবিষ্যতেও যা ঘটবে, তার প্রত্যেকের একটা কারণ থাকেই অকারণে কোন-কিছুই হ'তে পারে না। শূন্য হ'তে শূন্যই সৃষ্টি হয়, অন্য কিছু উৎপন্ন হ'তে পারে না। এই সত্য অস্বীকার করলে আধুনিক বিজ্ঞানের মূলনীতিকে অস্বীকার করতে হয়, আর অস্বীকার করতে হয় প্রাকৃতিক সত্যকে। এই সত্য প্রাণীদের জন্ম-মরণ-বিষয়েও সমান খাটে। কার্য-কারণ-নিয়মটি সকলের মধ্যেই থাকে, এটি কোন আকস্মিক বস্তু নয়। কোন একটি কার্য ঘটলেই আমরা তার কারণ অনুসন্ধান করি। কোন কোন লোক চিন্তা করে যে, কার্যের সংগে কারণের কোন সম্বন্ধ নেই, কেননা কারণ অলৌকিক ও বিশ্বপ্রকৃতির বাইরের জিনিস। কিন্তু তাও কি কখনো সম্ভব হয়? তবে প্রকৃতপক্ষে কার্য ও কারণের মধ্যে সত্যকারের কি সম্পর্ক —চিন্তাশীল মনীষীরাও তা নির্ধারণ করতে পারেন না, অথচ উভয়ের মধ্যে যথার্থ সম্পর্কের জ্ঞানের ওপরই ঐ সমস্যার সমাধান নির্ভর করে।

বৈজ্ঞানিকেরা এই সিদ্ধান্তে পৌছান যে, কোন বস্তুর কারণ তার মধ্যেই নিহিত থাকে, তার বাইরে নয়। গাছের কারণ গাছের ভেতরেই আছে, বাইরে নয়, কেননা 'কারণ' হচ্ছে কার্যের অব্যক্ত, আর কার্য কারণের ব্যক্ত অবস্থা। বীজের মধ্যে গাছ থাকে সুপ্ত অবস্থায়, বাইরের আবেষ্টনী তাকে (বীজকে) জাগিয়ে প্রকাশ করতে সাহায্য করে মাত্র। পরিবেশ যতই শক্তিশালী হোক-না কেন, বটগাছের বীজ হ'তে কিছুতেই অন্য কোন গাছ হ'তে পারে না। সুতরাং কার্যে যা দেখা যায়, কারণের মধ্যে তাই থাকতে বাধ্য।

অধুনিক বিজ্ঞানের মতে, একটি জীবনকণিকা বা প্রাণপঙ্ক বিবর্তিত হ'য়ে মানুষের রূপ ধারণ করতে পারে। তা যদি হয় তো বুঝবে, সেই জীবন-কণিকাটির মধ্যে মানুষের সব-কিছুরই অব্যক্ত আকারে আছে। সেই

জীবনকণিকার মধ্যে থাকে অদৃশ্য অতিসূক্ষ্ম শক্তিকেন্দ্র। তাঁর নিজস্ব কোন রূপ নেই; তা মানুষ—কি পশু যে-কোন প্রাণীর রূপ নিতে পারে। জীবন-কণিকাগুলির জীবনী এবং মানসিক শক্তি আছে।

ক্ষোদিষ্ঠ প্রাণীসমাজের শরীরক্রিয়া নিরীক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, অণুতম প্রাণশক্তির মধ্যেও ধীশক্তি বলে একটি জিনিস আছে। এদের মধ্যে অবশ্য সে-শক্তির প্রকাশ ঘটে অতি স্থূলভাবে। এই প্রকাশরীতি কাজ করে সেই নিয়মে—যা স্থূলবস্তুজগতকে নিয়ন্ত্রিত করে। স্থূলদেহের বিলোপ বা রূপান্তর ঘটার সঙ্গে সঙ্গে ঐ শক্তিপুঞ্জ সূক্ষ্ম-জীবনসত্তার মধ্যে অনুস্যুত হ'য়ে থাকে, পরে উপযুক্ত পরিবেশ অনুসারে এই শক্তিপুঞ্জের জাগরণ ও বিকাশ ঘটে।

জীবনের এই সব বীজাণুকে নানা রকমের নাম দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় দার্শনিকরা এদের 'সূক্ষ্মশরীর' ব'লে থাকেন। এই সূক্ষ্মশরীর কার্য-কারণ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নিয়ম অনুসারে পৃথিবীতে কিংবা অন্য কোনখানে আবির্ভূত হয়।

স্থূলশরীরে জীবনের পুনরাবির্ভাবকেই 'প্রকাশ' (অভিব্যক্তি) বলে। বেদান্তে একেই পুনর্জন্মবাদ বলে। 'পুনর্জন্ম' বেদান্তের মতে ঠিক আত্মার দেহান্তরগ্রহণ নয়। প্রতীচ্য দার্শনিকদের দেহান্তরবাদের অর্থ একটু স্বতন্ত্র, তাঁদের অর্থ মৃত্যুর পর আত্মার এক দেহ হতে অন্য দেহে গমন। এই মতে, আত্মা কিছুকাল একটি দেহে থাকার পর মৃত্যু হ'লে আবার অপর দেহে আশ্রয় করে। আত্মা তখন মানুষ অথবা পশুর দেহ অবলম্বন করতেও পারে। যারা ভাল কাজ করে তারা হয় মনুষ্য, কিংবা দেবদূতের রূপ গ্রহণ করে; আর যারা মন্দ কাজ করে তারা পশুশরীর গ্রহণ করে। তারপর আবার তারা মনুষ্য অথবা উচ্চতর জীবের দেহ পেতে পারে। এই মতে, আত্মা কেবল দেহ হতে দেহান্তরে ঘোরাফেরা করে। এতে আত্মার বিবর্তন বা অগ্রগতি তথা উন্নতির কোন কথা নেই। এই মতে, আত্মশক্তির গুণ ও পরিমাণ স্থির এবং অপরিবর্তনশীল; আপন স্বভাব ও বাসনা অনুসারে দেহনির্বাচন ও দেহপ্রাপ্তি ঘটে। কার্য-কারণরীতি অথবা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ানীতির নিয়মের কথা এই অভিমতের মধ্যে ধরা হয়নি। প্রাচীন মিশরের অধিবাসীদের বিশ্বাস ছিল যে, মৃত্যুর পর জীবাত্মা হাজার হাজার বছর ধরে এক দেহ হ'তে অন্য দেহে ঘুরতে থাকে।

পিথাগোরাস প্লেটো এবং এঁদের অনুগামীরা এই মত বিশ্বাস করতেন। পিথাগোরাস বলেছেন : 'মরণের পর চৈতন্যসত্তা দেহবন্ধন হ'তে মুক্তি পেয়ে সূক্ষ্মদেহ দিয়ে প্রেতলোকে যায়। তারপর যতকাল এই পৃথিবীর অন্য কোন দেহে তাকে পাঠানো না হয় ততকাল সে সেখানেই থাকে। পৌনঃপুনিক শুদ্ধির পর তাকে আবার দেবতাদের মধ্যে আসতে দেওয়া হয়, সে তখন তার আদিম ও সনাতন উৎসে ফিরে আসে।'

প্লেটোরও ছিল এই অভিমত। রূপকের আশ্রয়ে তিনি তাঁর 'ফিউড্রাস' নামক গ্রন্থে বলেছেন : 'সকল প্রাণীর অধীশ্বর জিয়ুস তাঁর উড়ন্ত রথ চালিয়ে সকলকে আদেশ দিয়ে ও সকলের উপর কর্তৃত্ব ক'রে বেড়ান। * * আত্মা যখন সত্যদৃষ্টি হারিয়ে ফেলে তখন তার পতন হয়, তার বহিরাবরণ সব খসে পড়ে। তাকে তখন আবার মর্ত্যে এসে বার বার নর কি পশুদেহে জন্ম নিতে হয়।'

প্লেটো বলেছেন, দশ হাজার বছর পরে একটি বিদেহী আত্মা আবার যেখানে তার চলা শেষ করেছিল ঠিক সেখানে সে ফিরে আসে, কেননা এর কম সময়ের মধ্যে তার ডানা জন্মায় না। প্রথম এক হাজার বছর পরে ভাল ও মন্দ উভয় আত্মারাই তাদের পুনর্জন্মগ্রহণের অনুকূলে পরিবেশ নির্বাচন করে। তারা আগেকার জন্মে ভাল ও মন্দ কাজের ফলগুলি সৃষ্টি করেছিল। তদনুসারে শরীর ধারণ করে, তাদের প্রকৃতিও তদনুযায়ী হয়। কোন কোন আত্মা আবার মনুষ্যজন্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে পশুশরীরই নির্বাচন করে ; তারা সেজন্য সিংহ, ব্যাঘ্র, ঈগলপক্ষী অথবা অন্যান্য পশুদের শরীরেও জন্ম গ্রহণ করে। কিন্তু অপর কতকগুলি আবার মনুষ্য-শরীর ধারণ করে তাদের পূর্ব-পূর্ব কামনাগুলিকে চরিতার্থ করার জন্য। এই কাহিনী যদিও পৌরাণিক ব'লে মনে হয়, তবু এর ভিতর দিয়েই পুনর্জন্মবাদের রহস্য বোঝা যাবে।

ভারতে প্রাচীনকাল হ'তে দেহান্তরবাদ চলে এসেছে, কিন্তু ভারতীয় মতের সঙ্গে প্লেটোর মতের তফাৎ আছে। ভারতের হিন্দুরা একথা কখন মনে করেনি যে আত্মা আপন ইচ্ছা অনুসারে দেহ গ্রহণ করতে পারে। তাঁদের মত ছিল এই যে আত্মা তার কর্ম অনুযায়ী দেহ গ্রহণ করতে বাধ্য : ভাল কাজ করলে সে পায় উচ্চ প্রাণীর দেহ, মন্দ কাজ করলে পায় ইতর প্রাণীর দেহ। আজও অবশ্য গ্রীসের কেহ কেহ দেহান্তরবাদ বিশ্বাস করেন।

তাঁদের ধারণা—মরণের পর আত্মা কিছুকালের জন্য পশুদেহ অবলম্বন ক'রে থাকে, তারপর কর্মফল ক্ষয় হ'লে আবার সে স্বর্গে যায় অন্তত কিছুকালের জন্য। কিন্তু যুক্তিবাদী যাঁরা তাঁরা একথা মানেন না যে মানুষের আত্মা পশুদেহে আবার ফিরে যায়। তাঁরা অবশ্য পুনর্জন্মে অর্থাৎ পুনরায় সেই শরীর গ্রহণের কথায় বিশ্বাস করেন।

'পুনর্জন্মবাদ' বিবর্তনবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। সূক্ষ্ম প্রাণবীজ কতকগুলি বাসনা চরিতার্থ ও কর্মের অনুষ্ঠান করবার জন্য দেহ ধারণ করে। মানবীয় আত্মা পশুদেহ ধারণ করে না। বিবর্তনবাদের নিয়ম অনুসারে সে মানবীয় স্তরেই থাকে; তাকে নিচে নামতে হয় না: চেতনার নিম্নস্তর হতে উচ্চ স্তরে জীবাত্মা যায় জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার সঞ্চয় করতে করতে। একথা অবশ্য সত্য যে, উপনিষদে মানবীয় আত্মার অধঃপতন পশ্চাদ্বর্তনের কথা বলা হয়েছে, তার অর্থ এই নয় যে, জীবাত্মাকে পশুদেহ ধারণ করতে হবে। যে আত্মা মানবীয় শক্তি লাভ করছে, সে পশুদেহ পছন্দ করবে—এটা কেমন অসংগত কথা বলে মনে হয় না কি? একটা ছোট আধারে কি বড় জিনিস ধরে? এই হতে পারে যে, মানুষের দেহ নিয়েও পশুর মতন জীবাত্মা জীবনযাপন করতে পারে। আত্মার এই যে পশুস্বভাব—এ' হয় অসৎ চিন্তা ও কাজের ফলে। এই চিন্তা ও কাজের ফল ফলতে বাধ্য। কর্মের ফল অবশ্যই ভোক্তব্য; তা অপরিহার্য ও অনিবার্য। কিন্তু এই যে পশুস্বভাব জীবাত্মা লাভ করে তাও সাময়িক; এই অবস্থায় থেকে আত্মা অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সঞ্চয় ক'রে সেই অবস্থা থেকে সে আবার উচ্চস্তরে যায়। ভুলের জন্যই মানুষ অসৎ কর্ম করে, আর অজ্ঞানতাবশতঃ সেই ভুল হয়। ভুল না করে এমন মানুষ জন্মায় না। এই ভুল থেকেই আরো শিক্ষা লাভ হয়; একটা জন্মে সব অভিজ্ঞতালাভ করা অসম্ভব ব'লে আরও জন্মের দরকার হয়; অবশ্য একথা আমরা বিশ্বাস না করে পারি না। কাজে কাজেই পুনর্জন্মবাদ মানতে হয়।

বৌদ্ধ-দার্শনিকদের পুনরাবর্তনবাদ একটু স্বতন্ত্র। তাঁরা আত্মার নিত্যতা মানেন না। তাঁরা বলেন, মরণের পর প্রাণসত্তা অন্য রকমের রূপ নিয়ে আসে তবে, সে প্রাণসত্তা একই লোকের নয়। এই মতে কিন্তু কার্য-কারণে নিয়ম রক্ষিত হ'বার অবকাশ থাকে না। জীব যে কাজ করে তার ফল ভোগ করবার জন্য তাকে—একই ব্যক্তিকে পুনর্জন্ম নিতে হয়। তা না হলে একজন কাজ করবে অপরজন তার ফল ভোগ করবে—এ কথাটা তেমন

যৌক্তিক মনে হয় না। এতে নিয়ম বলে কোন জিনিষ থাকতে পারে না। যাঁরা পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস করে না তারা হয় একজন্মবাদের—না হয় উত্তরাধিকার নিয়মে বিশ্বাস করেন। কিন্তু এই দুই মতবাদ দিয়ে মানব-মনের সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। একজন্মবাদের দ্বারা বোঝানো যায় না—কেন ব্যষ্টিসত্তার আবির্ভাব হয়, আর কেনই বা কিছুকালের জন্য থেকে জীব অন্য কোথাও আবার যায় তা জানা যায় না।

এঁরা জীবনের উদ্দেশ্যবিষয়ে সচেতন ব'লে মনে হয় না। জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান লাভ করা। তাঁরা বোঝাতে পারেন না যে, কেন শিশু অবস্থায় জীবকে মারা যেতে হয়। খৃষ্টান ও ইসলাম ধর্মেও একজন্মবাদ স্বীকার করা হয়। তবে এদের মধ্যে যে কার্য-কারণ সম্পর্কের নিয়ম উপেক্ষিত হয় সে কথা আগেই বলা হয়েছে।

জীবন-মরণের যথার্থ রহস্য ভেদ করতে হ'লে জীবনের নিত্যতা স্বীকার করাই সুবিধা। আত্মা যদি বর্তমানে থাকে তো সে আগেও ছিল, আর পরেও থাকবে।

সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের যে জ্ঞান মানুষের মনে হয় তা কালবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। ঠিকভাবে বিচার করলে দেখা যায়, কালের কোন শুদ্ধ ও স্বতন্ত্র সত্তা নেই; কাল হচ্ছে অবিদ্যা বা মায়ার কার্য। মরণের পর কালবোধ লোপ পায়, যেমন পায় নিদ্রার সময়। নিদ্রার পর জাগরণের যেমন নব চেতনা অনুভূত হয়, মরণের পর নতুন জীবনও তেমনি হয়। নিদ্রা তার পূর্ব পরবর্তীকালের ব্যবধান ঘটালেও ব্যক্তির সত্তার ছেদ বা ক্রমভঙ্গ ঘটায় না। আত্মার পুনর্জন্ম হ'লেও তার নিত্যতা নষ্ট হয় না। বেদান্তের মতে, জীর্ণ বস্ত্রের মতো জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে নতুন বসন পরিধানের মতো আত্মা নবীন দেহ ধারণ করে। কতকগুলি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যই তাকে তা করতে হয়। পুনর্জন্মবাদের সাহায্যে পৃথিবীর অধিকাংশ লোক মরণ-রহস্যের সমাধান-সূত্রের সন্ধান পেয়ে আশ্বস্ত হয়। প্রতীচ্য দেশে প্লেটো, প্লটিনাস, কাণ্ট, শেলিং, ফিকৃটে, শোপেনহাওয়ার, লেসিং ব্রুনো, গেটে প্রভৃতি দার্শনিকগণ; ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, টেনিসন প্রভৃতি কবিগণ ডাঃ জুলিয়াস মুয়েলের, ডাঃ ডোনের, রাকার্ট প্রভৃতি দেহতাত্ত্বিকগণ দেহান্তর দেহান্তরবাদে অথবা পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রাচীন দার্শনিক অরিগেন পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস করতেন। এই একমাত্র সিদ্ধান্ত যা এ-বিষয়ে

মানব-মনের যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে এবং বৈজ্ঞানিক রীতিতে ব্যাখ্যা করতে পারে।

একজন্মবাদ ও বংশপরম্পরানীতি যদি পুনর্জন্মরহস্য ভেদ করতে না পারে তবে আমাদের অন্য কোন নীতি গ্রহণ কর্তে হবে। এই মত খ্রীষ্টানদের মধ্যেও এমনভাবে অনুপ্রবেশ করেছিল যে, জাস্‌টিনিয়ানকে ৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কন্‌স্টান্টিনোপ্‌লের পরিষদে এক আইন ক'রে ওর বিস্তারের সম্ভাবনাকে রোধ কর্বার চেষ্টা করতে হয়। আইনটি এই—

'যে কেউ আত্মার পুনর্জন্ম-সম্বন্ধে পৌরাণিক ব্যাখ্যা সমর্থন ও সেই সূত্রে বিশ্বাস করে যে, আত্মা মৃত্যুর পর ফিরে আসে, তাকে ঈশ্বর ও চার্চের অভিশাপ ভোগ করতে হয়।'

পুনর্জন্মবাদে যাঁরা বিশ্বাসী নন তাঁরা উত্তরাধিকারসূত্রের সাহায্যে জীবন-মরণ-রহস্যের মর্ম বোঝাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতে কি সকল জিজ্ঞাসার উত্তর মেলে? একটি উদাহরণ ধরা যাক্‌ঃ একটি পঁচিশ বছরের যুবকের কতকগুলি উল্লেখযোগ্য গুণ বা প্রতিভা আছে? এ'বিষয়ে হয়তো তার মিল আছে তার পিতামহের সংগে। উত্তরাধিকারসূত্রের সমর্থকরা বলবেন, সে ঐ গুণগুলি পেয়েছে তার পিতামহের কাছ থেকে। সকল প্রাণীর প্রাণ-সত্তার অণুতম অবস্থায়ও ঐগুলি তার মধ্যে ছিল। কিন্তু তা কি অসংগত বলে মনে হয় না। অণু-পরমাণু-আকারের প্রানসত্তাগুলি জেলির মতো বস্তু, সেগুলির আয়তন পিনের মাথায় যতটুকু জায়গা থাকে তার চেয়েও ছোট। অবশ্য দূরবীণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখলেও অণুবীজগুলির কোন্‌টা কুকুর, কোন্‌টা বিড়াল, কোন্‌টা পাখী বা কোন্‌টা গাছের তা বোঝা যাবে না, কিন্তু তা হ'লেও ঐ ক্ষুদ্রায়তন অণুগুলির মধ্যেই যাবতীয় বৈশিষ্ট্য সূক্ষ্ম আকারে নিহিত থাকে।[১] কোন ভ্রূণের মস্তিষ্ক ও স্নায়ুকেন্দ্র গঠিত হবার আগে থেকে কোন শিশু বা যুবকের মধ্যে সঙ্গীতের প্রতিভা ও শক্তি সূক্ষ্ম-সংস্কারের আকারে প্রাণ-অণুর মধ্যে সুপ্ত থাকে, সেই প্রতিভা ও শক্তিই সংক্রমিত হয় অণুকোষে তার পিতামহের ভেতর দিয়ে। আসলে একটি মানুষের সকল-কিছু প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি যে একটি অণুর মধ্যে নিহিত থাকে একথা কি সম্ভব ব'লে মনে হয় না?

১। বিজ্ঞানও বলে, সৃষ্ট বা ব্যক্ত অবস্থার কোন জিনিসেরই ধ্বংশ হয় না, সমস্তই সূক্ষ্ম বা অব্যক্ত আকারে থাকে। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁর 'পুনর্জন্মবাদ'-গ্রন্থে এ'সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন।

অণুকোষে যখন মস্তিষ্ক, মুখ বা নাক তৈরী হয়নি তখনই মানুষ হ'লে তার নাক বিকৃত হবে—কি বাঁকা হবে তার সংস্কার মানুষের মধ্যে সুপ্ত থাকে। অনেক বৈজ্ঞানিক আছেন, যাঁরা বংশপরম্পরাধারা বা উত্তরাধিকারসূত্র স্বীকার করেন, কিন্তু এটি তাঁরা নির্ধারণ করতে পারেন না যে, কিভাবে একটিমাত্র অণুকোষে বা প্রাণবীজে পিতা, পিতামহ, মাতা ও মাতামহের এদের সকল রকম দৈহিক ও মানসিক সংস্কারগুলি সঞ্চিত হ'য়ে থাকতে পারে।

মানুষের শরীরে লক্ষ লক্ষ অণুকোষ পরিব্যাপ্ত থাকে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, কী ধরনের বা কী প্রকৃতির সেই অণুকোষগুলি আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে সকল রকম শক্তি ও প্রবৃত্তিকে ফুটিয়ে তুলতে পারে? সত্যই বিজ্ঞানী-মনের কাছেও এ-সমস্যা জটিল হ'য়ে আছে।

উত্তরাধিকারসূত্রের বিপক্ষেও যুক্তি আছে। এ'কথা মনে রাখতে হবে যে, কারো মধ্যে উত্তরাধিকারসূত্র পাবার প্রবণতা থাকলে তবে সে সেই সূত্র পায়, নইলে নয়। কিন্তু উত্তরাধিকারসূত্রকে যদি সত্য বলে ধরাও যায় তবে তাতে কি প্রমাণ হয় না যে জন্মের পূর্বে আণবিক-সত্তায় তার বিকাশ-সম্ভাবনা নিহিত ছিল? জীবের পূর্বসত্তার কথা হ'তে এ-কথার তাহলে পার্থক্য হয় কিসে?

উত্তরাধিকারসূত্রের সাহায্যে প্রতিভা ও বহু অলৌকিক শক্তি বা জ্ঞানের কারণ-রহস্য ভেদ করা যায় না, কিন্তু আত্মার পুনর্জন্মবাদ অথবা দেহান্তর-বাদের সাহায্যে ভাল ভাবেই তা করা যায়। মেষপালক মঙ্গিমামালা পাঁচ বছর বয়সে গণনাযন্ত্রের মতো গণনা ক'রে যেতে পারত। সাত বছরের শিশু জেরাব কালবার্ণ না লিখে দুরূহতম গাণিতিক প্রশ্নসমূহের উত্তর দিত। বিখ্যাত সংগীতকার মোজার্টের বয়স যখন চার বছর তখন তিনি একটি 'অপেরা' রচনা করেছিলেন। টম্ নামে অন্ধ নিগ্রো বালক ছিল। সে ছিল ক্রীতদাস। একদিন হঠাৎ পিয়ানোতে গানের সুর বাজাতে থাকে। সেই সংগীত সে কোনদিন আগে কারো কাছে শোনেনি বা শেখেনি। বুদ্ধি তার তেমন বেশী কিছু ছিল না, কিন্তু সংগীতে সে ছিল ওস্তাদ। নিজেই সে সংগীত রচনা করতে পারতো। উত্তরাধিকার-নিয়মের দ্বারা কি এই সকল ঘটনার ব্যাখ্যা করা যায়? অনেকে বলেন, পূর্বপুরুষের থেকে সঞ্চিত ও অর্জিত বুদ্ধিসমষ্টির ফলেই প্রতিভাশালী ব্যক্তির আবির্ভাব হয়। কিন্তু শেক্সপীয়র, যীশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধ অথবা শঙ্করাচার্যের কুলজী ঘাঁটলে তাঁদের মধ্যে প্রতিভাশালী হবার এমন কোন শক্তির খোঁজ মেলে না।

গ্যালিলিতে তখন অনেক মেষপালকই ছিল, তাই একমাত্র যীশুই তাঁর পিতামাতা কিংবা আত্মীয়স্বজন হতে মেষপালকের গুণধর্ম পান নি। বুদ্ধের সময় ভারতে তো আরো অনেক রাজকুমার ছিলেন, কিন্তু রাজকুমার শাক্যসিংহই একমাত্র বুদ্ধ হতে পেরেছিলেন। কেমন ক'রে তা হ'ল? উত্তরাধিকার সূত্রের নিয়ম দিয়ে কি এ-সব ব্যাপারের হদিস পাওয়া সম্ভব হয়? না, হয় না।

আমাদের আত্মসত্তার অস্তিত্ব যদি একবার স্বীকৃত হ'য়ে থাকে তা কখনই বিলুপ্ত হ'তে পারে না। আজ যা আছে, তা আগে ছিল না—কি পরে থাকবে না, এমন কথা ভাবতেই পারা যায় না। এই দেহের আগে আত্মা কোথায় ছিল কেউ বলতে পারে না। আত্মার আদি-অন্ত খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য।

পুনর্জন্মবাদে যাঁরা বিশ্বাসী নন তাঁরা এ-বিষয়ে দু-একটি আপত্তি তোলেন। তার একটি হচ্ছে এই: আমরা যদি আগে ছিলাম তো আমাদের সে-কথা মনে পড়ে না কেন? কিন্তু এই জীবনের সবকথাই কি আমাদের মনে থাকে? শৈশব ও কৈশোরে মানুষ যে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তার সব কিছুই কি মনে থাকে? তা ছাড়া এমন মানুষ থাকতে পারে যাঁরা অতীতের সব কিছু মনে করতে পারেন। প্রাচীন ভারতে এমন সব যোগী ছিলেন। প্রাচীন গ্রীস থেকে দার্শনিকেরা ভারতে আসতেন হিন্দুযোগীদের কাছে ঐ সব বিদ্যা শিখতে।

কেউ কেউ ভাবেন, অতীত ও ভবিষ্যৎ জানতে পারলে বুঝি জীবনে খুব সুবিধা হয়, কিন্তু তা কি ঠিক? যদি জানা যায় যে, কয়েক দিন পরে একটা কিছু মন্দ ঘটবে জীবনে, তা হ'লে কি আর মন স্থির রেখে অন্য কাজ করতে পারা যায়? অতীত বিষয়েও সেই কথা খাটে। অতীতের চিন্তায় অনেক সময়ে উদ্যম নষ্ট হ'য়ে বর্তমান উপেক্ষিত ও অপব্যবহৃত হয়। তাতে জীবনও নষ্ট হয় বই কি? বর্তমানকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের তৈরী ও উন্নত ক'রে তোলাই মানুষের কর্তব্য। এমনি ক'রে কাজ করতে করতে একটা সময় আসবে যখন দিব্যজ্ঞানের উদয় হবে আমাদের মধ্যে, তখন অতীত-ভবিষ্যতের বিশাল চিত্র চোখের সুমুখে উদ্‌ঘাটিত হ'লে শ্রীকৃষ্ণের মতো বলতে পারা যাবে: 'তুমি ও আমি বহুজন্মের মধ্য দিয়ে এসেছি; সে-সব তোমার জানা নেই, আমি কিন্তু সবই জানি।'[২]

২। 'বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥'—গীতা ৪।৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

॥ আত্মা ও তার অদৃষ্ট ॥

আত্মা ও তার অদৃষ্ট-সম্বন্ধে প্রশ্ন সহজেই সকল মনে জেগে থাকে। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকল মনকে কোন প্রশ্নই এমন ভাবে স্পর্শ করে না, কোন সমস্যাই মানব-মনকে এতো ভাবায় না। প্রাচীনকাল থেকে মুনি, ঋষি, দার্শনিক ও চিন্তাশীলরা এই প্রশ্নের সমাধান করবার চেষ্টা ক'রে এসেছেন নানাভাবে। সেই চেষ্টার ফলে ঐ বিষয়ে নানা মতবাদ গড়ে উঠেছে। কেউ বলেন, দেহ নিরপেক্ষ আত্মা ব'লে কোন-কিছু নেই ; কেউ-কেউ আবার আত্মা ব'লে কোন বস্তুকেই স্বীকার করেন না। যাঁরা দেহ-নিরপেক্ষ আত্মায় বিশ্বাসী তাঁরা এর নিত্যতায় বিশ্বাস করেন। যাঁরা আত্মায় অথবা দেহ-নিরপেক্ষ আত্মায় বিশ্বাস করেন না তাঁরা ঐ সমাধানে তুষ্ট হন না। এমন কতিপয় লোক আছে যারা নিশ্চিত ভাবে বিশ্বাস করে যে, তাঁদের আত্মা ব'লে কোন জিনিষ নেই, কিন্তু মানব-সমাজের সব ধর্মই আত্মার অমরত্বে আস্থা স্থাপন করার নির্দেশ দেয় এবং শিক্ষা দেয় যে, মৃত্যুর পরও আত্মা থাকে, মৃত্যুর পর ইহা ভাল কর্মের জন্য স্বর্গসুখ অথবা মন্দ কর্মের জন্য শাস্তি ভোগ করে। কিন্তু এই সকল ধারণার প্রতিষ্ঠা হ'ল প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ বা শ্রেষ্ঠ মুনিঋষিদের বা সত্যদ্রষ্টাদের গ্রন্থ ও বাণীর ওপর।

খ্রীষ্টানদের ভেতর সাধারণ বিশ্বাস যে, আত্মার অমরত্ব বা অমর জীবন যীশুখ্রীষ্টই সৃষ্টি করেছেন, সুতরাং যীশুখ্রীষ্টের জন্মাবার আগে আত্মার অমরত্ব বিষয়ে বিশ্বাস পৃথিবীতে ছিল না এবং যে কেউ অমরত্ব বা অমর জীবন লাভ করবে তাকেই যীশুখ্রীষ্টের সাহায্য নিতে হবে, নিজে নিজে পারবে না। কিন্তু যখন আমরা খ্রীষ্টপূর্ব যুগের ধর্মসকল ও শাস্ত্রগুলি পড়ি তখন দেখি যে, আত্মার অমরত্ব বা অমর জীবন বিষয়ে বিশ্বাস প্রাচীন ইজিপ্ট, চাল্‌ডিয়া, ভারত, রোম, গ্রীস, পারস্য প্রভৃতি দেশের লোকের মধ্যে সর্বোতোভাবে ছিল। সুতরাং পৃথিবীর প্রাচীন ধর্মগুলির আলোচনা করলে খ্রীষ্টানধর্মে যে বলা হয়েছে—একমাত্র যীশুখ্রীষ্টই শাশ্বত জীবন মানুষকে এনে দিতে পারে এবং যীশুর অনুগ্রহ ছাড়া স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা যায় না সেই সমস্ত মিথ্যা প্রমাণ হয়ে যায়। হ'তে পারে, যে কয়েকটি ইহুদীজাতি ধর্মশাস্ত্র বিশ্বাস করতো না বা সে-সব বিষয়ে

সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল, ভগবান যীশু তাদের চেতনার উদ্বোধন করেছিলেন, কিন্তু তাই ব'লে একমাত্র তিনিই সর্বপ্রথমে পৃথিবীতে মানুষের জীবনে শাশ্বত আলোকের সন্ধান দিয়েছিলেন একথা কে স্বীকার করবে ?

যদিও বেশীর ভাগ ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করেন যে, অমর আত্মার অস্তিত্ব আছে, মৃত্যুর পরেও আত্মার নাশ হয় না, আত্মা অক্ষত অবস্থায় থাকে ; তবুও প্রগতিশীল পণ্ডিতরা ধর্মশাস্ত্রে এ'সকল মতবাদের প্রামাণ্য বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান ক'রে তাঁরা নাকি সিদ্ধান্ত করেছেন, আত্মা ও পার্থিব জড়শরীর একই জিনিস, কিংবা আত্মা দেহের কোন শক্তি বা উপাদানের পরিণতিবিশেষ, দেহ ছাড়া আত্মার-কোন পৃথক অস্তিত্ব নেই। তাঁদের সিদ্ধান্তের সপক্ষে তাঁদের সুদৃঢ় যুক্তিও আছে।

তাঁদের মতে, বৈজ্ঞানিকরাও দেহ ছাড়া আত্মার পৃথক সত্তা আছে কিনা তা জানার জন্য গবেষণা করেছেন এবং এই বিরাট রহস্যের সমাধানের জন্য তাঁরা কোন চেষ্টা করতেই বাকী রাখেন নি। যতরকম সূক্ষ্ম যন্ত্র আবিষ্কার করা হয়েছে সেগুলি তাঁরা কাজে লাগিয়েছেন মৃত্যুর পর মস্তিষ্ক থেকে কোন্ জিনিস বার হয়ে যায় তা দেখার জন্য। জীবজন্তুর মাথায় অস্ত্রোপচার ক'রে তাঁরা দেখেছেন। মানুষ যখন মরে যায় তখনও সতর্কভাবে সযত্নে তাঁরা পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন কোন্ জিনিসটি দেহকে ছেড়ে চলে যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁদের সকল রকম চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। জীবন-মৃত্যু-রহস্যের সমাধান করতে কম চেষ্টা মানুষ করেনি, কিন্তু সমস্ত পরিশ্রমই তাদের বিফল হয়েছে, আর সে'জন্যই অনেক লোক আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে অবিশ্বাসী, নাস্তিক ও জড়বাদী। সে'জন্যই প্রত্যক্ষের বাইরে কোন জিনিসকে বিশ্বাস করতে তারা চায়নি, আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যুক্তি দেখালেও তারা শোনেনি, বরং জড় থেকেই চৈতন্যের উদ্ভব হয়েছে একথা বিশ্বাস করেন। নাস্তিক ও জড়বাদীরা বলেন— চৈতন্য, জ্ঞান ও মন সব-কিছুকেই সৃষ্টি করেছে দেহ, দেহ ছাড়া আত্মার পৃথক অস্তিত্ব নেই, দেহ যতদিন থাকবে ততদিন আত্মা থাকবে, দেহের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে আত্মারও মৃত্যু হবে, কেননা মৃত্যুর পর চেতনাত্ম আত্মা আলাদা-ভাবে যে দেহ থেকে বেরিয়ে যায় তা তাঁরা কখনো চোখ দিয়ে দেখেন নি। তবে এও ঠিক যে, জড়প্রকৃতি থেকে চৈতন্য বা বুদ্ধি সৃষ্টি হয়েছে একথা আজ পর্যন্ত কেউ প্রমাণ করতে পারেনি।

সত্যকার কথা এই যে, দেহ-ব্যতিরিক্ত অথচ দেহকে নিয়ন্ত্রিত করছে

দেহের সকল-কিছুর ওপর কর্তৃত্ব ক'রে তাদের কর্মপ্রেরণা দিচ্ছে এমন আত্মার অস্তিত্ব যদি আমরা স্বীকার করি তবে নৈতিক, মনোবৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক কতকগুলি প্রশ্নের সম্মুখীন আমাদের হ'তে হয়, কেননা ঐ ধরণের সচেতন আত্মাকে স্বীকার না করার অর্থ হল নৈতিক নিয়মনীতিকে অচল ক'রে দেওয়া ও সঙ্গে সঙ্গে আমরা হয়ে দাঁড়াই জড় যন্ত্রবিশেষ ছাড়া অন্য-কিছু নয়। জীবন যদি দীপশিখার মতো নিয়ে যায় তো সেই জীবনের জন্য এতো সংগ্রাম করা কেন? কেন এতো দুঃখ-কষ্ট ভোগ করা তার জন্য? স্থূলদেহ লোপ পাবার সঙ্গে-সঙ্গে যদি সত্তাই নষ্ট হয় তো মানুষ ধর্মজীবন যাপন করবে কেন? কেন তবে আমরা প্রত্যেককে হত্যা করি না, প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের হত্যা ক'রে তাদের কাছ থেকে সব-কিছু অপহরণ করি না? ভবিষ্যৎ যা হয় হবে। প্রত্যেক লোকই তাহলে পুরোদস্তুর স্বার্থপর হয়ে পড়বে এবং নৈতিক মানও তাদের খর্ব হবে। আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করলে মানুষের শিক্ষাদীক্ষা, চরিত্রগঠন প্রভৃতি আর দরকারী বলে অনুভূত হবে না। তাহলে এ-যাবৎ মানবসমাজ যে-সব কৃষ্টি ও শিল্পনীতির মূল্যবোধ নিরূপণ করেছে তা নষ্ট হয়ে যাবে। স্ত্রী-পুত্রের প্রতি যে সাধারণ স্বার্থগন্ধহীন মমতা ও ভালবাসা তাও প্রতারিত ও লাঞ্ছিত হবে, আর তাহলে এই বিশ্বসংসারে শুধু কি আমরা উদ্দেশ্য ও দায়ীত্ববিহীন খেলাই খেলে যাবো? না, তা কখনো হয় না; কেননা তাই যদি হয় তবে সাংসারিক জঞ্জালরূপ দুঃখ-কষ্টকে এড়াবার জন্য আমাদের আত্মহত্যা করতে হয়, ধর্মশাস্ত্রগুলিকে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিয়ে—দেবদেবীর মন্দির ভেঙ্গে ধূলিসাৎ করে দিতে হয়। তখন আমরা বাস করব সাধারণ পশুর মতো ইন্দ্রিয়ের জগতে ঘুরে বেড়িয়ে। আর আত্মা যদি শাশ্বত ও অমর নাই হয় তবে ধর্মজীবন যাপন কিংবা ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদান করারই বা যৌক্তিকতা কোথায়?

দেহসম্পর্কহীন পৃথক আত্মার সত্তা যারা বিশ্বাস করে না, নৈতিক প্রশ্নের সমস্যা তাদের কাছে এসে দাঁড়াবেই। মনোবিজ্ঞানের বেলায়ও তাই। আত্মা বা মন সম্বন্ধে জীর্ণ বস্তুতান্ত্রিক মতবাদ তো এখন একরকম অচল বল্লেই হয়; তাছাড়া এই মত ধীমানের কাছে কোনদিনই তা আদরণীয় নয়।

আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করেলে মস্তিষ্কের চির-সক্রিয়তা এবং আত্মসচেতনতা বিষয়ের ব্যাখ্যা করা দুরূহ। কোন শক্তি ভাবনা, কল্পনা ও স্মৃতিশক্তির সৃষ্টি করে তা বোঝা যাবে না! জীবের যে দর্শন-শ্রবণ-স্পর্শনের অনুভূতি

তা কি ইথারের স্পন্দনের সৃষ্টি হতে পারে ? কোন ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে কি ঐ সব সৃষ্টি করা যায় ? অসম্ভব, অসাধ্য। তাই একমাত্র আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করলে ঐ-সব সমস্যার সমাধান হতে পারে।

জড়বস্তু কিংবা তড়িৎ পদার্থ থেকে চৈতন্যের সৃষ্টি হয়নি। সারা বিশ্ব-সৃষ্টিকে বিশ্লেষণ করতে এই তিনটি আদিম ও মৌলিক বস্তুই পাওয়া যাবে : প্রথম, পদার্থ ; দ্বিতীয়, জ্ঞান বা শক্তি : তৃতীয়, চৈতন্য। এ'গুলির মধ্যে মূলপদার্থ অপরিবর্তনীয় ও অক্ষয়। মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা থেকেও জানা গেছে যে, পদার্থ শক্তি দ্বারা কোনদিন সৃষ্টি হয়নি। পদার্থ অক্ষয় ও অসৃজনীয়। বস্তুত পদার্থ ও শক্তি চৈতন্য-সংরক্ষিত হয়েই চলতে থাকে। পদার্থ ও শক্তিসংরক্ষণ যদি সত্য হয় তবে সাধারণতই প্রশ্ন ওঠে যে, কেমন ক'রে তৃতীয় পদার্থটির মাধ্যমে আমরা জগতের সকল-কিছুর জ্ঞানলাভ করি তাও সংরক্ষিত হয় না ? সুতরাং পদার্থ জ্ঞান সংরক্ষিত হলে তারাও শাশ্বত ও অপরিণামী হিসাবে গণ্য হবে। আমরা সকল-কিছু পদার্থকে জানি একমাত্র চৈতন্য বা বুদ্ধির মাধ্যমে। এদের ছাড়া আর কোন শক্তির সাহায্যে কি আমরা তাদের জানতে পারি ? না, পদার্থ ও শক্তি বিষয়ে অভিজ্ঞতাও আমাদের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। আসল কথা এই যে, পদার্থ ও শক্তি সংরক্ষিত ও শাশ্বত হলে আমাদের জ্ঞানও শাশ্বত ও সংরক্ষিত হবে : অর্থাৎ যদি পদার্থ প্রভৃতি বস্তু সংরক্ষিত ও অক্ষয় হয়ে থাকতে পারে তো চৈতন্যেরও তা হতে বাধা কি ?

মনে রাখা উচিত যে, সৃষ্টির অর্ধেকটা পদার্থ ও জ্ঞান নিয়ে বাস্তব বিশ্ব, আর বাকী অর্ধেকটা চৈতন্যময় বিশ্ব। আমরা যদি মুহূর্তে অজ্ঞান হয়ে যাই তো কোন-কিছুরই সত্তা আমাদের কাছে থাকবে না। আমাদের কাছে সব-কিছুরই প্রতীতি ও অনুভূতি চৈতন্যের জন্যে।

একথা তা'হলে বেশ স্পষ্টই বোঝা যায় যে, বস্তু ও জ্ঞানের সত্তা-নির্ভর করে ব্যষ্টিচেতনার ওপর, সুতরাং পদার্থ কিংবা জ্ঞানের সংরক্ষণ হতে হলে ব্যষ্টি-চেতনারও সংরক্ষণ হতে হয়। বিশ্বের বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ ক'রে মূল-নীতির কথা অবগত হ'লে বোঝা যাবে যে, পদার্থ ও জ্ঞানের মতো বুদ্ধি ও চৈতন্য সংরক্ষিত হয়, আর তা যদি হয় তো ব্যষ্টিচৈতন্যও সংরক্ষিত না হয়ে যায় না। কাজে কাজেই সকল চৈতন্যের আধার ও উৎস যে আত্মা তা স্বীকার করতে হয়, করলে সব ঝামেলাও চুকে যায়।

কিন্তু আত্মার অমরত্বের কথা মেনে নিলেও দেহ যে পরিবর্তনশীল তা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাহলে আত্মার স্থায়িত্ব দেহের মধ্যে নেই একথা বোঝা যাচ্ছে। তবে স্থায়িত্ব কিসের? সে স্থায়িত্ব হ'বে আত্মার বা আত্ম-চেতনার। এই আত্মচেতনাই টিকে থাকে দেহ ক্ষয় হয়ে যাবার পরও।

আত্মার অবিচ্ছিন্নতা ও নিত্যতা স্বীকৃত না হয় হ'ল, কিন্তু এর লক্ষ্য কি? আধুনিক বিজ্ঞান এর জবাব দিতে পারে না। উত্তর দেওয়া অতো সহজও নয়। বেদান্তের উত্তর এই বিষয়-সর্বজনগ্রাহ্য ও সর্বপ্রকার সংকীর্ণতাবর্জিত। বেদান্তের মতে, আত্মা যে স্থূল জড়দেহ উৎপন্ন করে তা হতে ভিন্ন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। এই আত্মার মধ্যেই আছে প্রাণশক্তি, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়শক্তি। এই আত্মাই পিতামাতার মাধ্যমে দেহ সৃষ্টি করে।

এখন প্রশ্ন এই যে, আত্মা যদি মরণের পরেও থাকে তো তার ব্যক্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্য থাকে—না যায়? বেদান্তের মতে, তার বৈশিষ্ট্য থাকে। দেহান্তে আত্মা বুঝতে পারে কোথায় সে ছিল, কে ছিল তার জনক-জননী। আধুনিক অধ্যাত্মতত্ত্ব মরণের পর আত্মার ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্বের কথা প্রমাণ করেছে। আধ্যাত্মিক জীবনে যাঁরা অগ্রসর হয়েছেন তাঁরা পার্থিব সম্পর্কের কথা ভেবে মুহ্যমান হন না, তাঁরা আরো উন্নত অবস্থায় যেতে ইচ্ছা করেন। বেদান্তের মতে—স্বর্গ অনেক আছে। ব্যক্তিসত্তাময় আত্মা যে-কোন লোকে যেতে পারে। কিন্তু যাঁরা উচ্চস্তরের অধ্যাত্মজীবন কামনা করেন তাঁরা অনন্ত ও অখণ্ড ব্রহ্মের সঙ্গে না মিশে-যাওয়া অবধি কেবলই চলতে থাকেন।

স্বর্গ-সম্বন্ধে খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের অভিমত এক রকম। এই মতে স্বর্গ হচ্ছে অনন্ত সুখ ও গৌরবের স্থান। ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণদের জন্যই এই স্থান। আর নরক হচ্ছে, দুরাত্মাদের চিরকালের মতো শাস্তির ও কষ্টের স্থান। বেদান্তের মতে কিন্তু তা নয়। বেদান্তের মতে, যে-সব আত্মার পার্থিব সামগ্রীর কামনা আছে মর্তে তাদের ফিরে আসতেই হবে। মানবাত্মার লক্ষ্য তাঁর চিন্তাভাবনা কামনা-বাসনার দ্বারাই নিরূপিত হয়। আসলে ভাবনা-কামনা দ্বারাই আমরা আমাদের লক্ষ্য নির্ধারণ করি। আমাদের বর্তমান সত্তা আমাদের অতীতের আশা-লালসা ও জীবনের কর্মময় পরিণতি। ঈশ্বর আমাদের অবস্থার জন্য দায়ী নন, দায়ী আমরা নিজেরা। জীবনের এই মূলসূত্রটি জানলে আমরা ভাবী ক্রমোন্নত অবস্থায় উপনীত হবার জন্য চেষ্টা করতে পারি। মোটকথা আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদের হাতেই, এই হচ্ছে বেদান্তের একটি সিদ্ধান্ত।

যারা সৎ ও মহৎ কাজ ক'রে ধার্মিকের জীবন-যাপন করেন তাঁদেরও ফিরে এসে জন্ম নিতে হয় এই ধরণীতে। অবশ্য তারপর তাঁরা উন্নত ও মহত্তর চিন্তা-ভাবনা দ্বারা উচ্চস্তরে উঠে যাবার পথ ক'রে নিতে পারেন। যাদের রীতিপ্রকৃতি নীচ ও ইতর তাদের জন্ম নিতে হবে জড়বুদ্ধি জীব-রূপে। যতদিন না তাদের মধ্যে জাগছে মহদ্‌ভাবনা ও দিব্যচিন্তা ততদিন তাদের থাকতে হবে এই মর্ত্যে। মহত্তর ভাবনার উন্মেষনা ও সাধনার দ্বারা তারা অবশ্য শ্রেষ্ঠ লোকের পথে যাত্রা করতে পারে।[১]

সুতরাং বেদান্তের সিদ্ধান্ত ও পথনির্দেশ অনুযায়ী আমরা পরিষ্কার একটা ধারণা করতে পারি—কি আমাদের জীবনে পালনীয় ও করণীয়, কি করলে আমরা চরমলক্ষ্যে, পরমতম পরিণতিতে পৌঁছতে পারি। আশা ও বিশ্বাস নিয়ে সৎ ও মহৎ কাজ ক'রে এবং আমাদের চরিত্র গঠন ক'রে আমরা শাশ্বত সুখ-শান্তি-আনন্দের অধিকারী হ'তে পারি।

১। স্বামী অভেদানন্দ : 'পাথ অব্ রিয়েলিজেসন্', পৃঃ ১৭৩-১৯৮ দ্রষ্টব্য।

সপ্তম অধ্যায়

॥ পূর্বজীবন ও পুনর্জন্ম ॥

পার্থিব জীবনের জন্ম-মরণ-রহস্যের নিয়মটি বড়ই বিস্ময়কর। প্রাচীনকাল থেকে দার্শনিকরা এর তত্ত্ব ও রহস্যের উদ্‌ঘাটন করেছেন, তবুও এর যথার্থ সমাধান হ'ল না—যা সকলকে একটা একান্ত তৃপ্তি দিতে পারে। পুনঃপুনঃ একথাই সকল মানুষের মনে জেগেছে কেন এতো অল্প সময়ের জন্য মানুষ পৃথিবীতে আসে? কেউ কয়েক সপ্তাহ, কেউ কয়েক মাস, কেউ বা কয়েক বছর মাত্র সংসারে থেকে, আবার চিরদিনের জন্য চলে যায়, অথচ শত শত বাসনা থাকে অপূর্ণ হয়ে মনের ভেতর, তাদের আর চরিতার্থ করার তারা সুযোগ-সুবিধা পায় না? কেন এরকম হয়? কেনই বা কোন কোন লোক খুব কম—আবার কোন কোন লোক দীর্ঘ সময় পৃথিবীতে বেঁচে থাকে? মানুষের এই আসা-যাওয়া কি আকস্মিক? মানুষের আত্মা কি উদ্দেশ্যবিহীনভাবে আসে, কোন প্রাকৃতিক নিয়মানুবর্তিতার কি সে ধার ধারে না? অথবা নিশ্চয়ই কোন নিয়ম আছে এই জীবন-মৃত্যু-রহস্যের পিছনে? এই সব প্রশ্ন মনে ওঠে এবং প্রত্যেককেই তার সমাধান করতে হয়, না হ'লে কিছুতেই নিবৃত্ত তারা হয় না। মন চায় এ'সকল জানতে এবং আমাদের জানাও উচিত, জন্ম-মৃত্যু এ' রহস্য ভেদ আমাদের করা কর্তব্য।

বস্তুতান্ত্রিক জড়বাদী বৈজ্ঞানিকরা আত্মার সত্তায় বিশ্বাস করেন না। তাঁদের মতে জীবনসত্তা কতকগুলি পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফল। আত্মার মধ্যে নেই কোন সচেতন পরিকল্পনার স্থান, যান্ত্রিক নিয়মের ফলেই তার উৎপত্তি হয়। অনেকে জীবনকে আকস্মিক কতকগুলি শক্তিরস সমাবেশ ব'লে মনে করেন। তাঁরা বলেন, পদার্থ-বিবর্তনের প্রাকৃতিক নিয়মেই হয় তার আবির্ভাব। তাঁদের মতে আত্মা ব'লে চৈতন্যসত্তা ব'লে কোন স্বতন্ত্র সত্তার অস্তিত্ব নাই। তাঁদের মতে মরণের সাথে-সাথে জীবনগঠন উপাদানসমূহের বিভাজন ও বিনাশ ঘটে থাকে।

কিন্তু এই সকলের সমাধানে সকলের মন তৃপ্ত হয় না, কারণ ওতে জীবন-মরণের সকল প্রশ্নের উত্তর মেলে না। পদার্থ যে বুদ্ধিকে সৃষ্টি করতে পারে না এ' আমরা মনে-মনে জানি। পদার্থ থেকে ধীশক্তির উৎপত্তি আমরা দেখতে পাইনা। বৈজ্ঞানিকের পক্ষেও তা দেখানো অতি দুরূহ। বৈজ্ঞানিক বরং

দেখতে পারেন যে গতি গতিরই সৃষ্টি করেছে, অন্য-কিছু নয়। বুদ্ধি বা আত্মা তো আর গতি নয়, অথবা গতির পরিণতিও নয়। চৈতন্য বা আত্মা এই গতির জ্ঞাতা, চাইকি সব-কিছুরই জ্ঞাতা। গতি বা কোন ক্রিয়া জ্ঞাতাকে সৃষ্টি করে না। জ্ঞাতাই স্বয়ং মস্তিষ্কের কোষসমূহের ক্রিয়ানিচয়কে অনুভূতি, ধারণা, ভাবনা ও অভিজ্ঞতায় পরিণত করে। ঐ ক্রিয়াপরিণতিগুলি হচ্ছে সচেতন আত্মার সজীব ধর্মকর্ম। এই আত্মাই তো মনকে নিয়মিত বা নিয়ন্ত্রিত করে। ডাঃ টমসন্ তাঁর 'ব্রেন এণ্ড পারসোনালিটি'-গ্রন্থে দেখিয়েছেন, মস্তিষ্ক হচ্ছে একটি যন্ত্র বা উপকরণ, আর ব্যক্তিত্ব, মন বা আত্মা সচেতন সত্তা—যা আধিপত্য ক'রে থাকে মস্তিষ্কের ওপর। মস্তিষ্ককে একটি বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ব্যক্তিত্ব হচ্ছে শিল্পী। ডাঃ টমসন মস্তিষ্ককে একটি বেহালার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন, বেহালা নিজে নিজে কোন সঙ্গীতের সৃষ্টি করতে পারে না, সঙ্গীত-সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন একজন সঙ্গীতকার। সঙ্গীত বেহালাযন্ত্রে থাকে না, থাকে সঙ্গীতশিল্পীর মনে। শিল্পী সেই সঙ্গীতকেই বাহিরে মূর্ত করেন তারের ঝঙ্কারে। ঠিক এমনি করেই ব্যক্তিত্ব কাজ করে স্নায়ুতন্ত্র ও মস্তিষ্কের কোষগুলির ওপর, যেন কতকটা স্বতন্ত্রভাবেই প্রতিফলিত হয়ে সৃষ্টি করে সুরসাম্য কিংবা বৈষম্য। সঙ্গীতকার যদি কুশলী, সুশিক্ষিত ও সুনিপুণ না হন তো সুরসাম্যের (কন্‌কর্ড) পরিবর্তে সৃষ্টি করেন বৈষম্যের (ডিস্‌কর্ড)—যেমন করে শিশুরা বেহালা নিয়ে বাজাতে গিয়ে। যাইহোক এইভাবে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তবে দেখবো যে, চেতনসত্তাচিন্তা নায়ক আত্মা আমাদের মস্তিষ্ক ক্রিয়ার পরিণতি নয়, তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও অনৈসর্গিক পদার্থ, অথচ স্বয়ংসিদ্ধ, স্বাধীন ও বিশিষ্ট, আপন এলাকার সকল বস্তুশক্তির ওপর তার শাসন ক্ষমতা বিদ্যমান। যদি আমরা অনুভব করি যে, চিন্তা, বাসনা ও ভাবের আধার-স্বরূপ আত্মা বলে কিছু আছে তবে তার সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগবে—কে সেই আত্মা? কোথায় তার বাস? প্রকৃতির বিশাল ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ করলেই দেখা যাবে যে, সর্বত্র কার্য-কারণ-সম্পর্কের নিয়ম বিদ্যমান। কার্য ও কারণের নীতিই সব-কিছু নিয়ন্ত্রিত করছে। প্রতিটি ঘটনার পিছনে অবশ্যই একটি করে কারণ থাকবে। এই কার্য-কারণনীতিকে অস্বীকার করলে শুধু প্রকৃতি বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বকেই অস্বীকার করা হবে। শূন্য থেকে কিছুরই উদ্ভব হ'তে পারে না। তাহলে যে-আমরা এখন আছি সেই আমরা আগেও ছিলাম,

কেননা আমরা অকারণে হঠাৎ শূন্য থেকে আবির্ভূত হ'তে পারি না। জীবন মরণের সব-কিছুরই কোন-না কোন কারণ থাকবেই, তা সে জ্ঞাতই হোক আর অজ্ঞাতই হোক। কারণ আছে এ'কথা উপলব্ধি করলে মনে জাগে সেই কারণ সন্ধানের ইচ্ছা ও চেষ্টা। মন তখন জানতে চায়—এই যে অনন্ত বিশ্ব, কি তার মূলকারণ? সে থাকে কোথায়? সে কারণ কি আমাদের বাইরে অবস্থিত, না আমাদের মধ্যেই সীমায়িত? এ সমস্যার সমাধান হওয়া কঠিন। বহুসংখ্যক বৈজ্ঞানিক কার্য-কারণ-ঘটিত এই উপলব্ধি করতে অসমর্থ হয়েছেন। কিন্তু জগতের নিত্যনৈমিত্তিক সমস্যাগুলোর পক্ষেও এই কার্য ও কারণের সম্বন্ধ কি তা স্পষ্ট করে জানা প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক বলেন, কোন কারণ তার বাইরে থাকে না, আসলে তার মধ্যেই নিহিত থাকে। বৃক্ষের কারণ যেমন বৃক্ষের মধ্যে থাকে, মানুষের কারণ তেমনি মানুষের মধ্যেই আছে। কার্য ও কারণে তফাৎ শুধু কার্য-কারণের পরিণত রূপমাত্র। বৃক্ষের পরিপূর্ণ রূপ বর্তমান থাকে বীজের অভ্যন্তরে অদৃশ্য অবস্থায় ও প্রচ্ছন্ন আকারে। পারিপার্শ্বিকতার সহায়তায় বীজের মধ্যে যা থাকে প্রচ্ছন্ন তাই পরিণত হয় বাস্তব রূপে, পরিণত হয় সত্যে, পরিণত হয় প্রত্যক্ষীভূত আকারে। পারিপার্শ্বিকতা এমন কোন ক্ষমতা দান করে না—যা বীজে আগে থেকে থাকে না, তা শুধু যথাযথ সাহায্য করে অব্যক্ত বৃক্ষকে ব্যক্ত হ'তে। এই ঘটনাটি, পরিষ্কার ক'রে বুঝতে পারলে দেখা যাবে যে, সৃষ্টি পারিপার্শ্বিকতা থেকে আসে না, সৃষ্টির শক্তি নিহিত থাকে বীজস্বরূপ বিরাট প্রকৃতিতে।

বৃক্ষে রূপান্তরিত হবার আগে পর্যন্ত বৃক্ষের বীজ থাকে কারণাকারে। এই সত্যকে অনুসরণ ক'রে আমাদের নিজেদের ক্ষেত্রেও চলতে হয়, যেহেতু কারণ আমাদের মধ্যেই অবস্থিত। এমন কি সেই কারণ? সেই কারণ এমন একটি-কিছু যাতে অন্তর্নিহিত থাকে মানুষের সকল বৈচিত্র্য ও জীবনের অধ্যায়ে যেগুলি ওঠে ফুটে। ঐ কারণেই থাকে সকল শক্তির উৎস এবং মন, চিন্তা, ইচ্ছা ও বৌদ্ধিক শক্তির অবস্থিতি। যেমন একটি ওকগাছের বীজে থাকে সেই গাছের নিগূঢ় বৈশিষ্ট্য। কোন পারিপার্শ্বিকতা ঐ বৈশিষ্ট্যকে পরিবর্তিত করতে পারে না—যাতে ওকের বীজটি পরিণত হতে পারে চেষ্টনাট্‌-গাছে। অতএব মানুষেরও সকল বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত থাকে তার কারণাবস্থায়। কারণাবস্থাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, যেমন বীজের মধ্যে গাছকে দেখা যায় না।

একটি সরষের বীজ একটি 'বট'-বীজের প্রায় সমতুল্য এবং বটের বীজটি

দেখলে ধারণাও করা যায় না যে তার মধ্যেই থাকে এক সুদীর্ঘ মাইলব্যাপী শত শত ডাল-পালা ও পঁচাত্তর কি একশোটি ঝুরি-সমন্বিত বটের অস্তিত্ব। এ'রকম বটবৃক্ষ ক'লকাতা বোটানিক্যাল গার্ডেনে আছে। এর ঝুরিগুলিই এখন এক একটি গুঁড়িতে পরিণত হয়েছে। সে'টি হয়তো হাজার বছর বেঁচে থাকবে। ঐ রকম একটি গাছ এখানেও "মারিপোষা গ্রোভ"-এ আছে। এ'গুলি এক একটি বিশেষ বীজের মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল, অপর কোন বীজই ঐ প্রকার বৃক্ষের জন্ম দিতে সমর্থ হতো না। বটের সকল বৈশিষ্ট্য তার বীজের মধ্যেই থাকে। সেই রকমই থাকে অদৃশ্য বীজ, থাকে 'এ্যামিওবা, 'বায়োপ্লাজম্', বা 'প্রোটোপ্লাজম্' বলা হয়,—যা পরে রূপান্তরিত হয় মানবদেহে, আর তাতেই থাকে অদৃশ্যভাবে মানুষের সকল শক্তি। যদি আমরা এই তথ্যকে অস্বীকার করি তো সেই চরমভ্রান্তিকেই মেনে নেওয়া হবে যে, শূন্য থেকে কিছু-না-কিছু সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্যকে বৈজ্ঞানিকরা যা উপলব্ধি করেছেন তা হ'ল—পরিশেষে যা-কিছু রূপায়িত হয় বা সত্তা রূপে পাওয়া যায়, প্রারম্ভেও তার সত্তা থাকে। পরিশেষে যদি আব্রাহাম লিঙ্কন, শেক্সপীয়ার বা প্লেটোর মতো ব্যক্তিকে দেখা যায় তো বুঝতে হবে ঐ বিশেষ বিশেষ গুণাবলী অদৃশ্য অবস্থায় লুকিয়ে ছিল সেই বীজের মধ্যেই—যা থেকে উদ্ভূত হয়েছেন ঐ সকল মনীষী। সেটি হ'ল 'প্রাণবীজ'। এঁকে বীজও বলা যেতে পারে, আবার অপর যে কোন নামেও ডাকা চলে—নামে কিছুমাত্র পার্থক্য আনে না। লিব্‌নিজ একেই বলেছেন 'মোনাড্', অন্য বৈজ্ঞানিকরা বলেন 'প্রাণবীজ'। বেদান্তদর্শনে বলা হ'য়েছে 'সূক্ষ্মশরীর'। সূক্ষ্মশরীর অদৃশ্য বীজ বা "প্রাণবিন্দু"। এতেই থাকে মন, বুদ্ধি, যৌক্তিকতাচিন্তাশক্তি, ইচ্ছাশক্তি এবং শ্রবণ, দর্শন, ঘ্রাণ, আস্বাদ ও স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়শক্তি। এ'ই সমস্ত শক্তি ছাড়াও সূক্ষ্মশরীরে থাকে প্রারব্ধ বা পূর্বজন্মের সংস্কার। 'ব্যোম' (ইথার) এবং অতিসূক্ষ্ম পদার্থ এক শক্তি দ্বারা কেন্দ্রীভূত হ'লে গঠিত হয় সূক্ষ্মশরীর। এই শক্তিকেই বলা হয় 'প্রাণশক্তি' বা 'জীবনীশক্তি'।

সূক্ষ্মশরীরই প্রকৃত মানবসত্তা। সূক্ষ্মশরীরই মানুষের আকারে রূপান্তরিত হয় এবং ভোগের জন্য সৃষ্টি করে অবয়বের। যেমন একটি কাঁকড়া বা ঝিনুক তৈরী করে তার 'বর্ণ' আপন ইচ্ছা ও ভোগের জন্য, তেমনি সূক্ষ্মশরীর মানুষেরই হোক অথবা পশুরই হোক, ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী 'আকার' ধারণ করে। মানুষ মানুষের শরীর গঠন করে, আবার ঐ ইচ্ছা যদি কোন

পশুবিশেষের হয় তো তা গঠন করে সেই পশুদেহ। এর বিশেষ কোন আকৃতি থাকে না, যে কোন আকার সে নিতে পারে। এই সূক্ষ্মশরীরেই প্রাণীর সকল কিছু-বর্তমান থাকে, সে'জন্য আমাদের বাইরে থেকে কিছুই গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় না, সব-কিছুই আমাদের সূক্ষ্মশরীরের মধ্যে থাকে। তার মাঝে থাকে অনন্তশক্তি এবং অনন্ত সম্ভাবনা। মৃত্যুকালে ব্যক্তিবিশেষ তার সকল শক্তিকে সংকুচিত করে এবং সেই সমস্তই আবার কেন্দ্রীভূত হ'য়ে থাকে "হৃদবিন্দুর"-র (প্রাণবিন্দু—নিউক্লিয়স্) মধ্যে। সেই "প্রাণবিন্দু" সংরক্ষিত ক'রে রাখে প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়শক্তি এবং ব্যক্তিগত জীবনের সকল সংস্কার এবং অভিজ্ঞতা। কালে অনুকূল পরিবেশ এলে ঐ প্রাণবিন্দুই অপর দেহ ধারণ করে। পিতামাতা এই দেহ-গঠনের সহায়ক মাত্র, তা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের সাহায্যেই প্রকৃতির নিয়মকে রক্ষা ক'রে দেহ গঠনে সমর্থ হয় সূক্ষ্মশরীর। মাতাপিতা আত্মাকে সৃষ্টি করেন না। বাস্তবপক্ষে তাঁরা তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী শিশুর জন্ম দিতে পারেন না। তা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যতক্ষণ পর্যন্ত না আত্মা মাতাপিতার অভ্যন্তরে আবির্ভূত হয় এবং প্রাণবীজটিকে লালন করে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের জন্ম অসম্ভাব্যই থাকে। এই সূক্ষ্মশরীর জলকণার মতো। জলকণা যেমন সাগরে জলের আকারে অবস্থান করতে পারে, আবার অদৃশ্য বাষ্পাকারে মেঘের রূপ ধারণ ক'রে বৃষ্টির জলবিন্দুর আকারে ঝরেও পড়ে। এরপরও তা কাদায় পরিণত হতে পারে, বরফেও রূপান্তরিত হয় যা সহজেই বহন করা চলে। এই জলকণা কখনো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, সে দৃষ্ট বা অদৃশ্য হতে পারে, কিন্তু ঐ অবস্থাভেদের দরুণ জলকণার কোন পরিবর্তন হয় না, তা বরাবরই একরকম থাকে। সূক্ষ্মশরীরের এই জলকণা চিরাগত কালের বুকে বহুপূর্বে উত্থিত হয়েছে অসীম জীবনসমুদ্র হতে। এর মাঝেই সংরক্ষিত থাকে বোধিরূপে পরমাত্মার প্রতিফলন। এই সত্তা এই জড়জগতেও আবির্ভূত হতে পারে, আবার অপর গ্রহেও যেতে পারে। আলোকের মতো গতিশক্তিবিশিষ্ট এই সত্তা আলোকের পথেই ব্যোম-তরঙ্গের (ইথারতরঙ্গে) কম্পনের সাহায্যে এক হ'তে অন্য গ্রহে যাতায়াত করতে পারে সূক্ষ্মশরীর মানবাকারে এই পৃথিবীতে অবস্থান করতে পারে, মৃত্যুর পর স্বর্গ বা অপর গ্রহেও যেতে পারে, আবার অদৃশ্য অবস্থায়ও থাকতে পারে যথাযথ পরিবেশ না পাওয়া পর্যন্ত। তারপর আকর্ষিত হয় স্বীয় বাসনানুযায়ী। এই পন্থাটি একটি রীতির দ্বারা পরিচালিত হয়। এই রীতিকেই বলা হয়

'পুনর্জন্মরীতি', অর্থাৎ সূক্ষ্ম হ'তে স্থূল ও বাস্তব দেহের রূপান্তর। এই রীতি অপরিহার্য। আমাদের চাওয়া না-চাওয়া বা আমাদের মানা না-মানাতে এই রীতির কার্যকারীতার কোন ব্যাঘাত ঘটে না। যে শক্তি আমাদের এই মূহূর্তে এই পরিমণ্ডলে এনেছে সেই শক্তিই আবার আমাদের এখানে এই ধরণীতে নিয়ে আসবে। তাকে প্রতিরোধ করবে কে? যতক্ষণ না আমরা এই নিয়মকে জান্‌ছি এবং এর পারে যাচ্ছি ততক্ষণ তোমার বা আমার কারো ইচ্ছাই একে রোধ করতে পারে না। তোমরা বলতে পার যে, আমরা একে অস্বীকার করি, এ'রকম ব্যাপার বিশ্বাস করতে চাই না, তাতে কিছু আসে যায় না অজ্ঞ ব্যক্তি বলতে পারে আমি মাধ্যাকর্ষণে বিশ্বাস করি না, কিন্তু তা সত্বেও তার দেহটি সম্পূর্ণরূপে মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা ধৃত থাকে। মাধ্যাকর্ষণ ছাড়া আমরা বাঁচতেই পারি না। অজ্ঞও এই মাধ্যাকর্ষণ ছাড়া বাঁচতে পারে না। যদি এই কেন্দ্রমুখী আকর্ষণ না ধরে রাখতো তো দেহের অণু-পরমাণুগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে উড়ে বেড়াতো। আত্মা কখনোই ধরাপৃষ্ঠে বিশিষ্ট আকার নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারতো না—যদি না এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তাকে পৃথিবীর সাথে ধরে রাখতো। তবুও সে শক্তিকে অস্বীকার করতে পারে, কিন্তু সেই অস্বীকৃতি তার এই নিয়ম সম্বন্ধে অজ্ঞানতাকে ব্যক্ত করা ছাড়া শক্তির আর কোন ক্ষতি করবে না। ঠিক এমনি করেই যদি কেউ পুনর্জন্ম অস্বীকার করে তো তা তার অজ্ঞানতাকেই প্রকাশ করবে, কেননা এতে জানা যাবে যে, সে এই নিয়ম বা রীতিটি মোটেই জানে না।

যাঁরা পুনর্জন্মবাদ মানেন না তাঁরা একজন্মবাদেই আস্থাবান। তাঁদের বিশ্বাস যে, ব্যষ্টি-আত্মা সর্বপ্রথম শূন্য হতেই সৃষ্ট। তাঁদের কেউ কেউ বলেন, এই-ব্যষ্টি আত্মা শাশ্বতভাবেই বর্তমান থাকবে। এখন কি ক'রে তা সম্ভবপর হ'তে পারে? যে কোন পদার্থ হোক না কেন যদি একদিকে তার আরম্ভের সূত্রপাত হয় তো অপরদিকে তাই আবার শাশ্বত হবে কেমন ক'রে? এ একেবারেই অবাস্তর। যার আরম্ভ আছে তার শেষও থাকবে। যদি বিশ্বাস করা হয় যে, শূন্য হতে প্রসূত আত্মা শাশ্বত, তবে বুঝতে হবে যে, তা শূন্য হতে সৃষ্ট হয়নি, আগে ছিল তার অস্তিত্ব। আদি বাইবেলে (জেনেসিস্) প্রথম অধ্যায়ে পাওয়া যায়, ঈশ্বর তাঁর নিজের অনুকরণে মানুষকে সৃষ্টি করেন দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাওয়া যায়, তিনি পৃথিবীর ধূলি হতে মানুষকে সৃষ্টি করেন এবং নাকের মধ্যে ফুঁ দিয়ে প্রাণবায়ু সঞ্চার করেন। এর দু'টি ব্যাখ্যা

আছে। ব্যাখ্যা দু'টি পুরাকালে ফিনিসিয়ান্‌দের মাঝে প্রচলিত ছিল এবং প্রাচীন ইহুদি ও জেনেরিস্‌-প্রণেতারা তা মানতেন, তাই দু'টি অধ্যায়ের তারা সঙ্কলন করেন। ব্যাখ্যা বা গল্পদু'টি তার সম্পূর্ণ পৃথক। কোনটিকে মানা যায়?

যদি ভগবান নিজের প্রতিচ্ছায়া হতেই মানুষকে সৃষ্টি ক'রে থাকেন তো কি ক'রে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন এই প্রশ্ন হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হ'ল ধরণীর ধূলি হ'তে হয়েছে সৃষ্টি। কিন্তু পৃথিবী জড়বিশেষ এবং চেতনাহীন পদার্থ। এ'সমস্ত জটিলতা ঐ ধরণের ব্যাখ্যা পড়ার পর যা আমাদের মনে উদিত হয় তার কোন মীমাংসা হয় না—যদি না আমরা মানি যে আত্মা, বুদ্ধি বা বোধি কখনোই সৃষ্ট হয়নি, সৃষ্ট হয়েছে শুধু দেহ—তাও ক্রমবিকাশের মাধ্যমে। প্রাণবায়ু যেমন সৃষ্ট হয়নি, মনকেও তেমনি কোনদিন সৃষ্টি করা হয়নি। আত্মাও জড়পদার্থ হ'তে কখনো সৃষ্ট নয়। আত্মাতেই সংরক্ষিত থাকে ঈশ্বরের প্রতিফলন বা পরমাত্মার প্রতিচ্ছায়া। বেদান্ত ব্যাখ্যা করেছে এটি অপর ভাষায় যে, আত্মাই সংরক্ষণ করে পরমাত্মার প্রতিবিম্ব—যা হ'ল চিন্ময়সত্তা। একজন্মবাদ বা শূন্যবাদ (শূন্য হতে আত্মার সৃষ্টি) দ্বারা কিছুই ব্যাখ্যা করা যায় না, কেননা ঈশ্বর যদি শূন্য হতেই আত্মার সৃষ্টি করেন তো কেনই বা তিনি এই বিচিত্র-চরিত্রের অবতারণা করেছেন? কেউ বা জন্মগ্রহণ করেছেন উপভোগ করতে, তাদের প্রতিভা প্রকট করতে, ও তাদের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতাকে ব্যক্ত করতে। অন্যেরা তাদের অজ্ঞানতা—তাদের দুর্বলতাকে আঁকড়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করছে না। এ'সকল বস্তুর কি ব্যাখ্যা হ'তে পারে? এক ব্যক্তির পাঁচটি সন্তানের একজন হ'তে পারে খুনী, একজন হয়তো বা প্রতিভাবান, আর একজন শিল্পী। এই অসমতা এবং অনৈক্যের কারণ কি? ঈশ্বর যদি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দৈহিক জন্মের সাথে সকলকে গড়ে থাকেন তো এর জন্য দায়ী কে? নিশ্চয়ই মাতাপিতা নয়—ঈশ্বর স্বয়ং। কেন তিনি সকলকে উন্নততর ক'রে গড়তে পারেন নি? এ'সব প্রশ্ন আমাদের মধ্যে আসবেই আর তাদের সামাধান করারও চেষ্টা আমাদের করতে হবে।

তারপর আরও একটি প্রশ্ন ওঠে, কেন মাত্র কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহের সংক্ষিপ্ত জীবন যাপন করতে শিশু জন্মগ্রহণ করে? কেনই বা তারা চলে যায় বিপুল বিশ্বের কিছু শিক্ষা করার বা কোন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার সুযোগ পাবার আগেই। কে দায়ী এর জন্যে? কি হয় পরে এই শিশুগুলির? বেশ না হয় এ'তথ্য স্বীকার করা গেল যে, তারা স্বর্গে যায় ও সেখানে অবিচ্ছিন্ন

জীবনের আনন্দ উপভোগ করে। যারা এই তথ্যে আস্থাবান তাদের পক্ষে উচিত প্রার্থনা,—যেন কোন-কিছু ক্ষতি করার আগেই তাদের সন্তানদের মৃত্যু হয় এবং উচিত একান্তভাবে ধন্যবাদ দেওয়া ঈশ্বরকে যখন কবরের আবরণে ঢাকা পড়ে তাদের সন্তানদের ছোট শরীরগুলি। আমার যদি ছোট শিশু থাকতো এবং আমি যদি এই মতবাদের প্রতি কিছুমাত্র আস্থাবান হতাম তাহলে নিশ্চয়ই আমি ঐ কাজ করতাম। কেন তারা এই কষ্ট—এই দুর্দশা ভোগ করবে। শৈশবে মৃত্যু হলে যদি স্বর্গে যাওয়া যায় তো আমাদের বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো। এ'জন্যই এই মতবাদকে অযৌক্তিক ও অবাস্তর বলে মনে হয়, এর দ্বারা কোন-কিছুর মীমাংসা করাও যায় না। যদি নিয়তি বা কৃপাবাদকে মানা যায় তাহলেও বেশী সুবিধা হবে না। যদি আমরা অদৃষ্টের ফেরে বা পূর্বনিয়ন্ত্রণ অনুযায়ী কাজ করি, পূর্বনির্দেশানুযায়ীই যদি খুনী খুন করে, স্রষ্টার বিধি অনুযায়ী তার ইচ্ছার পূর্বে যদি হত্যার আয়োজন শেষ হ'য়ে থাকেতো তবে হত্যার জন্য তাকে ফাঁসি দেওয়া হয় কেন? আমাদের উচিত স্রষ্টাকে ফাঁসি দেওয়া, যেহেতু তিনিই এ'কাজের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী। কাজেই এ'থেকে আমরা কোন সমাধানই পাই না।

বংশগত ব'লে আর একটা কথাও প্রচলিত আছে, কিন্তু বংশগত ব'লেও কি সকল অসমতা ও অনৈক্যের ব্যাখ্যা করা চলে? তা চলে না। প্রতিভা বা অসাধারণত্বের কোন ব্যাখ্যা এর দ্বারা চলে না। এই পোলীয় (পোলিশ,) দাবা-খেলোয়াড় বালকটির উদাহরণ নেওয়া যাক্ না। সে তো মাত্র আট বছরের ছেলে, সে বোধহয় এখন নিউইয়র্কেই আছে। সে খেলতে আরম্ভ করে মাত্র পাঁচ বছর বয়সে। আর এরই মধ্যে লণ্ডন ও প্যারীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী খেলোয়াড়দের সে পরাজিত করেছে একসাথে তেত্রিশ রকমের খেলে। কি মনশক্তির সে উত্তরাধিকারী! তার অন্য ভাইবোনগুলি তো এ'রকম অসাধারণ নয়। তার বাবা মাও কিছু অসাধারণ নয়। তাহলে বংশগত বলে এর ব্যাখ্যা কি ক'রে করা যায়? বিখ্যাত জার্মান কবি গেটের কথাই ধরা যাক্। তিনি ছিলেন অশীতিপর বৃদ্ধ কবি ও দার্শনিক। দশ বছর বয়সে তিনি গ্রীক ও অপরাপর যোলটি ভাষায় সিদ্ধ হয়েছিলেন। কলম্বিয়াতেও একজন ছিলেন তিনি বারটির বেশী ভাষা আয়ত্ব করেছেন আর তাঁর শিক্ষকের চেয়েও সেগুলিতে তিনি পারদর্শী। বংশগত ব'লে এই অসাধারণত্ব ও প্রতিভার ব্যাখ্যা করা চলে না। কিন্তু অপর একটি

মতবাদ আছে যার দ্বারা এ' সকলের মীমাংসা করা যায়। একজনের জীবনে যা-কিছু শক্তির বিকাশ হয় তা থাকে তার মধ্যে তার জন্মমুহূর্তেই পূর্বজন্মের সংস্কার-রূপে। যে-কোন প্রতিভার বা ক্ষমতার পরিচয় একজনের ব্যক্তিগত জীবনে পাওয়া যায় তা হ'ল তার আত্মোপলব্ধ শক্তির বহির্বিকাশ। আমি নিউ ইয়র্কে একটি ছ'বছয়ের মেয়েকে দেখেছি সে পিয়ানোয় বাক্, বিঠোফেন্ প্রভৃতি সঙ্গীতকারদের অনেক শক্ত শক্ত বাদ্যযন্ত্র অতি স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে শুদ্ধভাবে বাজাতে পারতো—যা শুনলেই আশ্চর্য হতে হোতো। সে অতি কষ্টে বাজনার সপ্তকের নাগাল পেতো, তবু দ্রুতভাবে কি সুন্দর পরিবেশনই না সে করতে পারতো। তার মা তার সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু তিনি বা মেয়েটির কেউই সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন না। কাজেই বংশগত গুণ বলে তার বর্ণনা করা চলে না। কিন্তু আমরা সহজেই এর ব্যাখ্যা করতে পারি। পূর্ব-পূর্ব জন্মে সে ছিল সঙ্গীতজ্ঞ। জন্মে জন্মে সে আয়ত্ত করেছে সঙ্গীতকে, তাই ঐ ছোট্ট বয়সে ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক নিয়েও সে আর একটি সঙ্গীতকারের অবয়ব সৃষ্টি করেছে। তার ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক সঙ্গীতকে উপলব্ধি করার পক্ষে যথেষ্ট নয়, তবু তার সঙ্গীতসংস্কারযুক্ত আত্মা মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন ক'রে মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রে ঝংকার তুলেছে সুরের, সৃষ্টি করেছ অপূর্ব সঙ্গীত। এইটিই হ'ল একমাত্র বিচারপূর্ণ সমাধান।

যদি কর্মফলরূপ প্রাক্তনকে অস্বীকার করা হয় তবে আত্মার অমরত্বকে মানা যায় না। অমরত্বের মানে এ'নয় যে, তার আদি আছে, কিন্তু অন্ত নাই। প্রাক্তন ব্যক্ত করে অনাদি অতীতকে, এবং অমরত্ব অন্তহীন ভবিষ্যৎকে। শাশ্বত জীবনের অর্ধেককে স্বীকার ক'রে বাকি অর্ধেককে অস্বীকার করা যায় না, তাতে উভয়ই অসম্পূর্ণ থাকে। আত্মা কোনদিন জন্মায়নি, কোনদিন শূন্য হ'তে সৃষ্টি হয়নি,—এই হ'ল সর্বোৎকৃষ্ট মতবাদ এবং সবচেয়ে সন্তোষজনকও বটে। আমরা শূন্য থেকে আসিনি, জন্মের প্রারম্ভে আমাদের সব-কিছুই ছিল—এ'চিন্তা তো অনেক আরামপ্রদ। আমরা ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি, সুতরাং সকল ক্ষমতারও অধিকারী। ঈশ্বর ভুঁইফোড়ের মত হঠাৎ আবির্ভূত হন নি; তিনি অনন্ত। স্বভাবতই তাই আমাদের দেহাতীত আত্মার জীবন ঈশ্বরের মতোই অনন্ত। এইভাবে যদি আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, কত মহান, ও কত শ্রেষ্ঠতর সৌন্দর্যের অধিকারী আমরা, তাহলেই বুঝতে পারবো যে, মৃত্যুর দ্বারা আমরা জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হ'তে পারি না।

বরং এটাই বলা যায় যে, যদি আমাদের ইচ্ছা ও বাসনা থাকে, আর সেই বাসনা যদি জগতে পরিপূর্ণ হবার হয় তো আবার আমরা এই জগতেই ফিরে আসবো। যদি আমাদের বাসনার পরিবর্তন হয় তো অন্য জগতে যাবো। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক্ যে আমার মাইকেল এ্যাঞ্জেলার মতো শিল্পী হবার বাসনা আছে, এ'ই জীবনে আমি তা হ'তে পারলাম না, তবুও আমার সেই বাসনা রইলো সুপ্ত আত্মারই মধ্যে। কাজেই সে বাসনা কি তাহলে অপূর্ণ এবং বিফল হবে? না, কোন বাধাই তার পরিপূর্ণতাকে প্রতিরোধ করতে পারবে না। সেই বাসনা আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে যথাযথ পরিবেশের মধ্যে যাতে আমি শিশুকাল হতেই যথার্থ শিল্পী-মনোবৃত্তি নিয়ে নিজেকে গঠন করতে চেষ্টা করবো, কোন-কিছুই আমাকে রোধ করতে পারবে না। যতক্ষণ আমার সেই বাসনা প্রবল থাকবে ততক্ষণ আমি শিল্পী হবার জন্য সচেষ্ট থাকবো; যতক্ষণ না সুদক্ষ শিল্পী হ'তে পারি ততক্ষণ আমি চেষ্টা করেই যাব। এই হ'ল প্রকৃতির নিয়ম। সে'জন্য যে ইচ্ছাই আমরা করি না কেন, সে ইচ্ছা যদি প্রবল হয় তো তা আমাদের ভবিষ্যৎ গঠন করে, আর আমাদের তদনুযায়ী গ্রহণের উপযুক্ত করে নেয়। এই কথাই পাওয়া যায় শ্রীমদ্ভগবদগীতায়। গীতা বলে, যে বাসনা জীবদ্দশায় অত্যন্ত প্রবল হয়, মৃত্যুকালেও তা অব্যাহত থাকে। সেই বাসনার ছাঁচেই সৃষ্ট হয় সূক্ষ্মশরীর, আর তার থেকেই নির্ধারিত হয় আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন।[১] আমাদের ভবিষ্যতে আমরা কোন্ রূপ প্রাপ্ত হবো এটি তাই জানার সুযোগ দেয়। আমরা আমাদের চিন্তা, আমাদের ধর্ম ও আমাদের ইচ্ছার দ্বারাই আমাদের ভবিষ্যৎকে সৃষ্টি করি। যদি কারু ইচ্ছা হয় যে সে বড় একজন রাজনীতিজ্ঞ হবে, তবে সে নিশ্চয়ই হতে পারবে। ত্রাণকর্তা হ'তে চাইলে ত্রাণকর্তাই হবে, শিল্পী হতে ইচ্ছা হলে শিল্পীই হবে, কেননা মানুষের জীবন শাশ্বত, কাজেই হতাশ হবার কোন কারণ নেই। এ' জীবনের শ্রেষ্ঠতম শিল্পী হতে না পারলে শত শত জীবন ভবিষ্যতে আসবে, তখনই পূর্ণ হবে ইচ্ছা। এক বাসনা পূর্ণ হলে অপর একটি বাসনা জাগে। অনন্ত সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ আত্মা, অনন্ত তাই তার অভিব্যক্তি।

প্লেটো, পিথাগোরাস ও প্লেটোর মতানুবর্তী দার্শনিকদের এবং ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ,

১। যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্॥
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥—গীতা

টেনিসন, ওয়াল্ট হুইটম্যান প্রভৃতি কবিদের জন্ম-মৃত্যু সম্বন্ধীয় বহু সমস্যারই সমাধান করেছে এই জন্মান্তরবাদ। কবি হুইটম্যান বলেছেন,

বহু মরণের পর তুমি অবশেষ
করেছো গণনা তোমায় জীবন,
এতো সুনিশ্চিত—আগে বহুবার
মরণের আমি করেছি বরণ॥[২]

এমার্সনের মতো তিনিও ভারতের বেদান্তদর্শন অধ্যয়ন ক'রেই জন্মান্তরের প্রতি আস্থাবান হয়েছিলেন। বেদান্ত ছাড়া আর কোন শাস্ত্রে এ'বিষয়ে এত দৃঢ়ধারণা পাওয়া যায় না। অবশ্য প্লেটো প্রভৃতি মনীষীরা ভারতবর্ষ, মিশর ও পারস্য হ'তেই তাঁদের ধারণা পেয়েছেন। পূর্বজন্ম ও জন্মান্তরের এই গুপ্তরহস্য হিন্দুরা সভ্যতার অরুণোদয়েই জেনেছিলেন। পরে এই ধারণা ছড়িয়ে পড়েছিল প্রাচীন খ্রীষ্টানদের মধ্যে। জস্‌টিনিয়ানের সময় পর্যন্ত এই মতবাদই প্রচলিত ছিল, কিন্তু কন্‌স্টানটিনোপল-এর সভায় ৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকেই যে এই মতবাদে বিশ্বাস রাখতো তাকেই দোষী সাব্যস্ত করা হ'ত। ঐ সভায় তিনি বলেছেন, যে কেউ এই বিস্ময়কর (রহস্যজনক) পূর্বজন্ম বিশ্বাস করে সে ঈশ্বরের অভিশপ্ত হোক্।

সেই অবধি চার্চ এই মতবাদ স্বীকার করেনি—যদিও বাইবেলের উভয় অংশেই এ' তথ্য আছে, কেননা এতে তাদের 'স্যাল্‌ভেসন' বা মুক্তিবাদ-প্রচারের পক্ষে অসুবিধা হয়। কিন্তু এই গোঁড়ামির বাইরেও অনেকে আছেন যাঁরা এই সত্য মানেন। জাপানী, বৌদ্ধ, হিন্দু ও সকলদেশের কবি ও চিন্তাশীল মনীষীরাই তার নিদর্শন। অতএব জন্মান্তরবাদ হ'ল যুক্তিপূর্ণ সমাধান, এর থেকে বৈষম্য, অনৈক্য বিকাশরহস্য এবং অসাধারণত্বের সুমীমাংসা হয়।

কিন্তু একজন্মবাদ বা বংশানুক্রমবাদে জীবনসমস্যার কোন ব্যাখ্যা এবং সমাধানই করতে পারে না। কেউ কেউ পূর্বজন্ম জন্মান্তরবাদ মানেন না তা স্মরণাতীত ব'লে। ছেলেবেলার কথা মনে থাকে না তাই ব'লে কি বলা হবে যে, ছেলেবেলার অস্তিত্ব থাকে না। ছেলেবেলাকার পুঙ্খানুপুঙ্খধারার স্মৃতি থাকে না ঠিকই, কিন্তু সেই সময়ে অর্জিত অভিজ্ঞতা হতে সংগৃহীত জ্ঞানই

২। As to you Life, I reckon you are the leaving of many a death. No doubt I have died myself to ten thousand times before.'

পূর্ণাবয়ব মানুষের উপাদান। সে জ্ঞানই সৃষ্টি করে পরিবাধত মানবকে। স্মৃতি ক্ষণস্থায়ী; কখনো থাকে শক্তিশালী, কখনো অতি-দুর্বল। কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের অনেকে এর ওপর ভিন্ন আলোকপাত করেছেন। তাঁরা আমাদের জানান যে, বিগত জীবনের আত্মীয়তার নিবিড় সম্পর্ক, অবস্থা ও সব-কিছুই থাকে নিহত আত্মার মধ্যে সংস্কার বা স্মৃতির আকারে, সুতরাং মানুষের ভেতর স্মৃতি থাকে সংরক্ষিত। অলিভার-লজের ছেলে রেমণ্ডের ব্যাপারই যদি ধরা যায় তা'হলে দেখা যাবে সে কি ক'রে মারা গিয়েছিল সে-সব কথা তার মনে আছে। সে তার বাবা-মার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ক'রে তার মৃত্যুরহস্যের সব কথা বলেছে ও এর থেকে বোঝা যায় আমাদের স্মৃতি আত্মায় সংরক্ষিত থাকে সকল সময়েই, নষ্ট হয় কেবল যন্ত্র বা মস্তিষ্ক, নষ্ট হয়ে যায় স্নায়ুতন্ত্রী। স্মৃতি মস্তিষ্কের ক্রিয়ার ফল নয়, পরন্তু মনেরই শক্তিবিশেষ, তাই যতদিন আমাদের মন থাকবে ততদিন স্মৃতিও থাকবে সঞ্চিত, সুতরাং স্মৃতির বিশেষ প্রাধান্য নেই। একথা কিন্তু সত্য নয়। অতীতের স্মৃতি বর্তমানকে প্রভাবিত করে, তার অপব্যয় করতেও প্ররোচনা যোগায়—সেটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। যেমন মনে করুন যে, একজন তার অতীতের ঘটনা জানে ও বোঝে এবং জানে যে, অতীতের অসৎকর্মই তার বর্তমান জীবনের দুর্ভোগের কারণ—সর্বদাই এই চিন্তা করতে গিয়ে সে বর্তমানের সকল সুযোগ-সুবিধা হারায়। সুতরাং সে করে তার অপব্যয়। তার জীবনে ঘটবে যে দুর্ভাগ্য তাকে কি ক'রে জয় করা যায় সেই চিন্তা করতে গিয়ে যে, সে কোন কাজই ক'রে উঠতে পারে না। এমনকি ভালো খাবার পেলেও সে না পারবে খেতে, তাছাড়া না পারবে নিশ্চিত মনে ঘুমোতে। এজন্যই বেদান্তদর্শন বলেছেন: "অতীতের চিন্তা ত্যাগ ক'রে বর্তমানকে গড়ে তোল—যাতে ভবিষ্যৎ জীবন ভাল হয়"। অবশ্য এমন পন্থাও আছে যার দ্বারা আমরা আমাদের অতীতকে জানতে পারি, কেননা জীবিতাবস্থার সকল অভিজ্ঞতাই যে সঞ্চিত থাকে জীবাত্মার মাঝে, তা আগেও উল্লেখ করেছি। মনের অবচেতন স্তরে সমস্ত সংস্কার একীভূতভাবে থাকে। আবার এমন ঘটনাও ঘটে—যেমন দুই প্রেমিকের মধ্যে প্রথম দৃষ্টিতেই হয় প্রেমের সঞ্চার। এখানে বলতে পারি যে, দুটি আত্মার মধ্যে ভালোবাসা ছিল আগে থেকেই, সেটাই তাদের মনে পড়ে, আর তারা অনুভব করে যেন তাদের পরস্পরের মধ্যে আগেও মিলন ও ভালবাসা ছিল। ভালবাসা কোন মোহ নয়, তা

হ'ল দুটি আত্মার আকর্ষণ। তার কার্যক্ষেত্র জড়জগতে নয়, তার বিকাশ আত্মার মাঝে, কেননা ভালোবাসা বা প্রেমের পরিপূর্ণ রূপই ঈশ্বর। প্রেম একটি অপার্থিব শক্তি, এবং তা দুটি আত্মার মাঝে স্বর্গীয় আকর্ষণ। যদি কোন পুরুষ আর নারীর মাঝে সত্যিকারের ভালোবাসা থাকে তো সে ভালবাসা মৃত্যুর পরেও থাকবে, দেহের নাশ তার প্রতিরোধ করতে পারবে না। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে, সে ভালোবাসা হওয়া চাই পারস্পরিক। যদি স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসে তো সে ভালোবাসাই হয় পারস্পরিক ও অপার্থিব। কিন্তু কেউ যদি একজনকে ভালোবাসে, আবার সেইজন অপরকেও ভালোবাসে তো তাদের পুনর্মিলনের কোন সম্ভাবনা সেই—যতক্ষণ না উভয়ে উভয়ের প্রতি নিবিড় আকর্ষণ অনুভব করেছে। সেইজন্য পারস্পরিক ভালবাসাকে জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন। এই পারস্পরিক অবিচ্ছেদ্য ভালোবাসা অনন্তকাল বেঁধে রাখবে প্রেমিককে তার প্রিয়জন বা প্রিয়বান্ধবীর সাথে। এতে বিচ্ছেদের কোন স্থান নেই, কাজেই প্রিয়জন হতে বিচ্ছিন্ন হবার ভয়ে ভীত হবার কোন কারণ নেই। যদি তুমি জগৎ থেকে চলে যাবার পর তোমার প্রিয়জন আবার জগতে ফিরে আসে (জন্মগ্রহণ করে) তো তুমিও আবার জন্ম নেবে, আর দু'জনেই আস্বাদন করবে নিঃস্বার্থ স্বর্গীয় প্রেমের মধুময় ফল।

অতএব অনুশীলন করলে দেখা যাবে যে, পূর্ব ও পর জন্ম দুইই চলেছে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা ক'রে। তারাই জীবন-মৃত্যুর সকল সমস্যা ও রহস্যের সমাধান ক'রে জানিয়ে দেয় যে, আমরাই আমাদের অদৃষ্টের স্রষ্টা, আমাদের বর্তমান জীবন আমাদেরই অতীত জীবনের ফল। আমরা বিশ্বাস করি আর না-করি তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু আমরা শাশ্বত একটি প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। আত্মা ইচ্ছা করলে অতীতের সমস্তই মনে করতে পারে, কেননা চৈতন্যের স্তরে ভাসমান হলে অতীত ও ভবিষ্যৎকে চিরবর্তমান রূপেই দেখা যায়। সুতরাং যিনি চৈতন্যের স্তরে পৌছতে পেরেছেন তাঁর সে দৃষ্টি-হয় যে দৃষ্টির মাধ্যমে অতীত ও ভবিষ্যতের সাথে সাথে বিগত অভিজ্ঞতাকে বর্তমানের ঘটনা-পারম্পর্যের মধ্যে দেখা যায়। যিনি উপলব্ধি করতে পারেন যে, জীবন অনন্ত ও শাশ্বত। তিনি পার্থিব জীবনের সুখদুঃখ, রোগভোগ কোন-কিছুকেই গ্রাহ্য করেন না, কেননা এই মরজগতের জীবন অতীব সংক্ষিপ্ত—

ক্ষণস্থায়ী, তাই অনন্ত জীবনের দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে আমাদের জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই, আমরা সত্যিকারের জন্মমৃত্যুহীন অমর। প্রকৃত-পক্ষেই আমরা জন্ম-মৃত্যুরহিত, আমরা শাশ্বত ও অনাদি বিশ্বপ্রকৃতির অংশ—যে প্রকৃতি বা শক্তিকে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন নামে ও রূপে লোকে আরাধনা করে।

অষ্টম অধ্যায়

॥ অমরতা ও পূর্বজন্মবাদ ॥

বেদান্তের একটি মূলসূত্র হচ্ছে মানবাত্মার অমরতা। বেদান্তের নির্দেশানুযায়ী বলা হয়, প্রত্যেক মানুষের আত্মাই স্বভাবতঃ অমর। মরজগতের দৃষ্টিভঙ্গিতে যতই আমাদের জীবন পঙ্কিল বা পাপপূর্ণ বলে মনে হোক না কেন, দেহের মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব থাকবেই॥ আত্মার ধ্বংস নেই, তা' শূন্যে বিলীন হ'য়ে যায় না, কিংবা বিকাশের পথ হ'তে সরেও দাঁড়ায় না।

এখানেই বেদান্তের ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর দ্বৈতবাদী ধর্মমতের পার্থক্য। দ্বৈতভাবসম্পন্ন ধর্মমতগুলির সিদ্ধান্তই যে, ঈশ্বরের নির্বাচিত কয়েকটিই কেবল অমর জীবন লাভ করতে পারবে, অপরাপর আত্মার হবে ধ্বংস। অনেক প্রাচীনপন্থী গোঁড়া খ্রীষ্টান দেবতাত্ত্বিকদের অভিমত যে, অমরত্ব বা নিত্যতা আত্মার স্বভাব ও ধর্ম নয়, তা একটি বিশেষ দান এবং সেটি নির্ভর করে বর্তমান জীবনের যথাযথ ব্যবহারের ওপর। তাঁরা মনে করেন, অমরতাকে লাভ করা যায় সদ্‌গুণ, সৎকার্য, নৈতিক জীবন ও যীশুখ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসের পুরস্কারস্বরূপ। এখানে আমরা প্রশ্ন করতে পারি, এখন কে এটা মীমাংসা করবে যে, পুণ্যের কত পরিমাণ ওপরে নৈতিক সদ্‌গুণের অধিকারী হবে বা সৎকার্য করবে যাতে ক'রে মানুষ অমরত্ব জীবনে লাভ করে? এর মান কি নির্ণয় করা যায়?

সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে দেখা যায়, তাঁদের এই আপেক্ষিক অমরত্ব কোন যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, বরং এর দ্বারা ঈশ্বরকে প্রতিপন্ন করা হয়েছে ক্ষমতাশীল পিতারূপে, আর পক্ষপাতী ও অবিচারকরূপে। কি ক'রে এ'কথা ভাবা যায় যে, ন্যায়বান পক্ষপাতিত্বহীন ক্ষমাশালী পিতা তাঁর কয়েকটি সন্তানকে অমরতা দেবেন, আর বাকীদের করবেন বঞ্চিত' ও নিঃস্ব তাদের ভুলভ্রান্তি ও অসমর্থতার জন্য। বেদান্তের ধর্মমত এই গোঁড়ামীকে স্বীকার করে না, বরং বেদান্তমতে অমরতা একমাত্র উন্নততমেরই পুরস্কার বা আশীর্বাদ নয়, কেননা শাস্তি বা পুরস্কার আমাদের স্বয়ংকৃতকর্মের প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কিছু নয়। মানুষের প্রতিটি কর্মই স্থান ও কালের দ্বারা সীমায়িত এবং অনিত্য. তাই কর্মই অনন্ত ক্রিয়াশীল শাশ্বত জীবন গড়ে তুলতে পারে
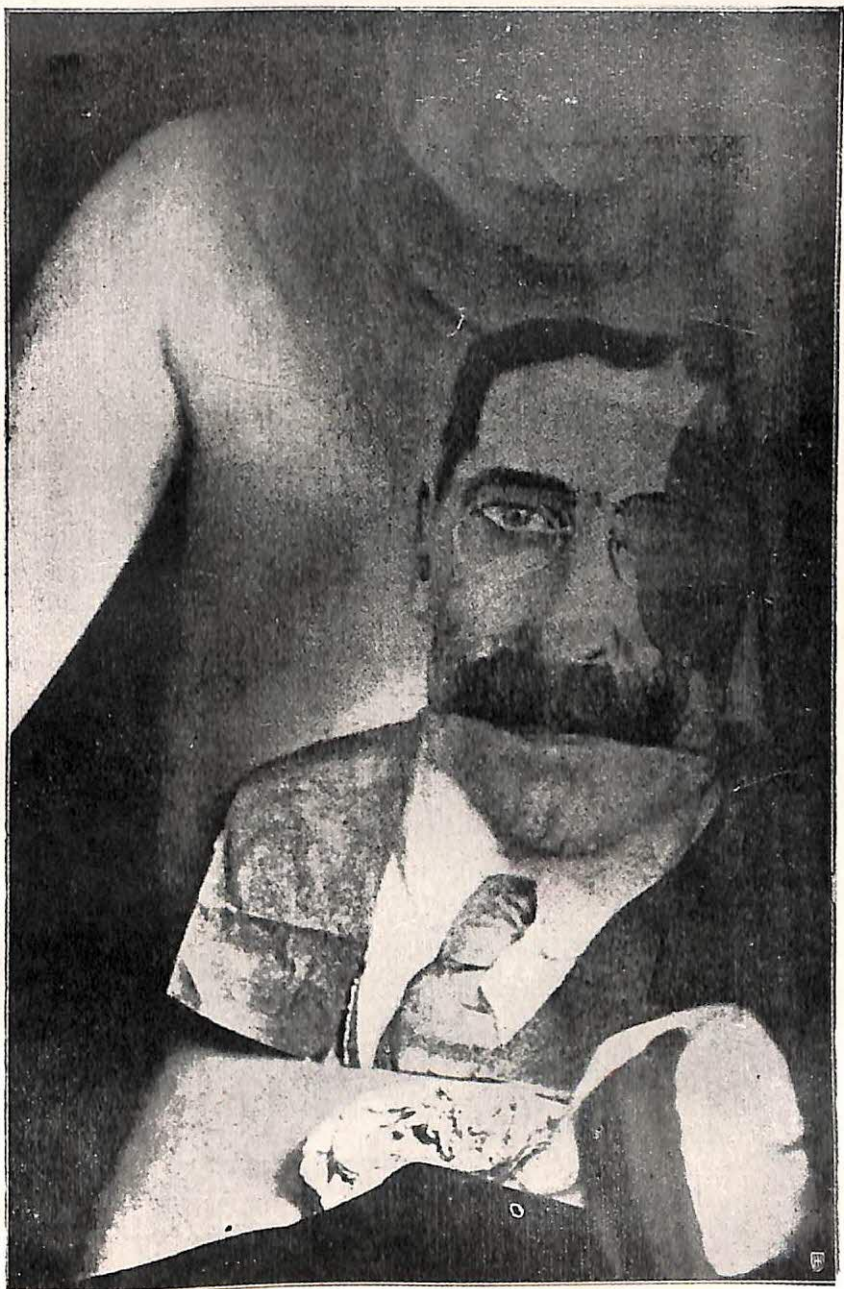
চশমা-পরিহিত বিদেহী-আত্মা ও মিডিয়াম।

মিডিয়ামের সাহায্যে বিদেহী-আত্মার আবির্ভাব।

বিদেহী আত্মা-কর্তৃক অঙ্কিত যীশুখৃষ্টের ছবি।

অধ্যাপক ক্রুক্স দেখাচ্ছেন বিদেহী-আত্মা ও মিডিয়াম পরস্পর পৃথক।
(এস. ড্রিজিন-অঙ্কিত)

বিদেহী-আত্মা ও মিডিয়ামের আলোকচিত্র।

এক্টোপ্লাজেমের সাহায্য নিয়ে বিদেহী-আত্মার প্রকাশ।

বিদেহী-আত্মা স্বামী যোগানন্দজীর আত্মার হস্তরেখা (শ্লেটে)।

এক্টোপ্লাজমের সহায়তায় বিদেহী-আত্মার মুখের অভিব্যক্তি।

বিদেহী-আত্মা ও এক্টোপ্লাজম্ ।

না। মানুষের দেহগত বা মনোগত কোন কর্ম যতই পুণ্যময় বা সৎ হোক না কেন তা স্থান ও কালের সীমা ছাড়িয়ে শাশ্বত ব'লে দাবী করতে পারে না। সেটি তা হলে কার্য ও পারম্পর্যের রীতিবিরুদ্ধ হবে। কার্য ও কারণের পারম্পর্য অনুযায়ী প্রত্যেক কর্মই প্রকৃতিতে ও গুণে কারণের সমান হ'তে বাধ্য।

আর একটি বিশেষ দিক থেকে বেদান্ত-সমর্থিত অমরতার ধারণা খ্রীষ্টানদের ধারণার সাথে মেলে না। জন্মের সময়ে প্রত্যেকটি আত্মার সৃষ্টি হয় বিশেষ-ভাবে—এ' মতবাদই খ্রীষ্টানধর্ম বিশ্বাস করে, আর সে'জন্য দেহের জন্মের আগে মানবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না, কিন্তু তবুও মৃত্যুর পর অন্তত ভবিষ্যতের বুকে আত্মার চলমানতাকে তারা মানে। তবে এই তত্ত্ব কোন যুক্তিপূর্ণ ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় এবং কোন প্রাকৃত ঘটনাও একে সমর্থন করতে সাক্ষ্য দেয় না। সৃষ্টি আছে অথচ ধ্বংস নেই—কোন বস্তুর পক্ষেই এটা সম্ভবপর নয়। এমন কোন বস্তুর সন্ধান আজও পাওয়া যায়নি যা থেকে একটি বিশেষ সময়ে জন্মলাভ করেছে অবিনশ্বরতা। এমন একটি লাঠির কথা কি কল্পনা করা সম্ভব যার এক প্রান্ত থাকে আমাদের হাতে (অন্ত), আর অপর প্রান্ত সীমাহীন অনন্ত? এ' একেবারেই অসম্ভব। একদিকে স্থান ও কালের দ্বারা সীমায়িত, আর অন্যদিকে স্থান ও কাল-নিরপেক্ষ অসীম-অনন্ত--এমন কোন পদার্থের কথা চিন্তা করাও যায় না। যদি কোন বাস্তব পদার্থের বিষয়েই এ'ভাবে চিন্তা করা না যায় তবে আত্মার সম্বন্ধে এ'রকম চিন্তা কি করে আসে? আত্মার সম্বন্ধে এমন ধারণা করা যায় না যে, জন্মের সময় একটি বিশেষ ক্ষণে ও বিশেষ স্থানে তা জন্মলাভ করে আর মৃত্যুর সময় তা অনন্ত ভবিষ্যৎ ও সীমাহীন কালের বুকে থাকে অটুট হয়ে। সুতরাং অমরতা অর্থে শাশ্বত সত্তাকেই বোঝায় তা দেহগত জন্মের পূর্বাপর সকল সময়েই পরিবর্তিত থাকে। আমরা যদি আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করি তাহলে আমাদের মানতেই হবে তার পূর্বসত্তা বা অস্তিত্বকে, কেননা জন্মালেই মৃত্যু অনিবার্য, কোন জিনিস আরম্ভ হ'লেই তা শেষ হবে—এই হ'ল প্রকৃতির নিয়ম। আমরা এর বিরুদ্ধে যেতে পারবো না কোনদিন।

প্রকৃতির নিয়ম সর্বদাই সাম্য এবং সার্বজনীনতার অনুগামী। তার মাঝে ব্যতিক্রমের স্থান নেই। যাকে আমরা ব্যতিক্রম বলে ধরি তাও আমাদের অজানা ও অগোচর কোন নিয়মের দ্বারা পরিচালিত। যেকোন পদার্থ যার

জন্ম আছে তা মৃত্যুর অধিগত ; যার আরম্ভ আছে তার শেষও থাকবে। আমরা যদি অনন্ত বা ভবিষ্যতের অমরতাকে সত্য ক'রে তুলতে চাই তাহলে আমাদের অতীতের অমরতা বা 'অনাদি সত্তা'-কেও মানতে হবে। এখন কেউ কেউ বলতে পারেন যে, আমাদের পূর্বজন্ম কি ক'রে সম্ভবপর হতে পারে ? কিন্তু যদি আমাদের বর্তমান সত্তা বা অস্তিত্বকে স্বীকার করতে হয় এবং স্বীকার করতে হয় যে, আমরা শূন্য হতে উদ্ভূত হইনি তাহলেই প্রাক্‌সত্তা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা হবে। এ'জন্যই বেদান্ত প্রাক্‌সত্তা ও অমরতা এই উভয়ের প্রতিই সমান আস্থাবান, উভয়কেই সে মেনে নিয়েছে। প্রাক্‌সত্তা বা পূর্বজন্মকে স্বীকার না করলে অমরত্ববাদ থাকবে অসম্পূর্ণ ও অশুদ্ধ। কোন তথ্যই ভবিষ্যতের অনন্ত জীবনের প্রয়োজনীয়তাকে প্রমাণ করতে পারবে না যদি-না সে প্রমাণ করতে চায় অতীতের জীবনের প্রয়োজনীয়তাকে। পূর্বজন্মকে যদি নিষ্প্রয়োজন বলা হয়, পরজন্মকেও তাহলে অপ্রয়োজন বলতে হবে। আমাদের ছাড়া যদি জগতের প্রবাহ এতদিন বর্তমানে চলে থাকে তো ভবিষ্যতেই বা আমাদের ছাড়া চলবে না কেন ? শাশ্বত জীবনের তাহলে প্রয়োজনীয়তা কই ? আমাদের সত্তা বা অস্তিত্ব যদি হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে থাকে তাহলে হঠাৎ তা লোপও পাবে। এই ক্ষণভঙ্গুরতা হ'তে আমাদের রক্ষা করবে কে ? বেদান্তে যথার্থ অমরতা অর্থে অতীত ও ভবিষ্যৎ এই উভয় কালেরই অনন্ত সত্তাকে বুঝায়। প্রাকসত্তা ও অমরতা দুইই জড়িয়ে আছে ওতঃপ্রোতভাবে, একেকে বাদ দিয়ে অপরকে স্বীকার করা চলে না। তা না হলে বিচারের পরিপ্রেক্ষণে আমাদের ভ্রান্তি ঘটবে। আমাদের অভিমত যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয়ে তার ভিত্তি গড়ে উঠবে ভুল-ধারণার ওপর। বেদান্তের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, যে, প্রত্যেক ব্যষ্টি আত্মারই দেহগত জন্মের পূর্বে অস্তিত্ব থাকে। আমরা যদি বিশ্বাস করতে চাই মরণের পরেও আমাদের অস্তিত্ব থাকবে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে জন্মের আগেও আমাদের অস্তিত্ব ছিল। আমরা আদিতে শূন্য হতে উদ্ভূত হইনি এবং আমাদের বর্তমান জীবন অতীত ও ভবিষ্যতের সঙ্গম মাত্র। আমরা একথা না জানতে পারি, আমাদের পূর্বজীবনের স্মৃতিও না থাকতে পারে, কিন্তু তথাপি আমাদের সত্তা ছিল ঠিক এখন যেমন আছে।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, যদি দেহগত জন্মের আগেও আমাদের অস্তিত্ব থাকে তো সেকথা আমরা মনে করতে পারি না কেন ? প্রাক্‌সত্তার বিরুদ্ধে

এইটিই হ'ল সবচেয়ে প্রবল প্রতিবাদ—যা প্রায়ই ওঠে। অনেকে অতীত আত্মার সত্তাকে অস্বীকার করেন অতীত ঘটনাকে স্মরণ করতে পারেন না বলেই। অপরেরা যাঁরা আবার স্মৃতিকেই জীবনের মানদণ্ড ধরেন তাঁরা বলেন যদি মৃত্যুকালে আমাদের স্মৃতির নাশ হয় তো আমাদের বিনাশ হবে, সুতরাং আমি অমর হতে পারি না। তাঁদের মতে স্মৃতিই জীবনের 'মান', সুতরাং যদি মনেই না আনতে পারি তো আগের 'আমি' আর এই 'আমি' যে এক তার প্রমাণ কি?

এর উত্তরে পতঞ্জলি বলেন, আমাদের ভিন্ন ভিন্ন জন্মকে মনে করা যায়। যাঁরা রাজযোগ পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয় একথা স্মরণ করতে পারবেন। ঋষি পতঞ্জলি বলেছেন,

সংস্কারসাক্ষাৎকারণাৎ পূর্বজাতিজ্ঞানম্।[১]

এখানে 'সংস্কার' অর্থে প্রাক্-অভিজ্ঞতার ছাপ—যা আমাদের মনের অবচেতন-স্তরে থাকে সংরক্ষিত, এর কখনোই বিনাশ নাই। প্রাক্তন অভিজ্ঞতাকে চৈতন্যের মাধ্যমে উত্থিত করা বা জাগ্রত করা ছাড়া 'স্মৃতি' আর কিছুই নয়। রাজযোগী অবচেতন-মনের সুপ্ত সংস্কারের ওপর প্রবল মনঃসংযোগ ক'রে তাঁর বিগত জীবনপরম্পরার ঘটনাপুঞ্জকে স্মরণে আনতে পারেন। ভারতে এমন অনেক উদাহরণ পাওয়া যায় যেখানে যোগী শুধু তাঁর নিজের অতীত-জীবনকেই জানেন এমন নয়, অপরের জীবনের কথাও অভ্রান্তরূপে বলে দেন। ভগবান বুদ্ধ তাঁর পাঁচশো জন্মের কথা স্মরণ করতে পারতেন ব'লে শোনা যায়। শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলেছেন—হে অর্জুন, তুমি ও আমি দুজনেই বহুজন্মের মধ্য দিয়ে এসেছি, তুমি তা জানো না কিন্তু আমি সকলগুলিকেই জানি।[২] এর থেকে বোঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণ সকল-কিছু মনে করতে পারতেন, কেননা তিনি ছিলেন জাতিস্মর যোগী, কিন্তু অর্জুন পারতেন না, তাঁর সে শক্তি (যোগবল) ছিল না বলেই।

আমাদের অপ্রকট আত্মা বা অবচেতন-মন হ'ল বিভিন্ন জীবনের অভিজ্ঞতা-প্রসূত সংস্কারের ভাণ্ডার। তারা (সংস্কার) সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হয় সেখানেই যাকে বেদান্তে বলা হয় চিত্ত। 'চিত্ত' অর্থে ঐ অপ্রকট আত্মা

১। পাতঞ্জলদর্শন ৩.৮
২। বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ।
—ভগবদ্গীতা ৪।৫

বা সকল সংস্কারের ভাণ্ডাররূপী অবচেতন-মন। ঐ সংস্কার সুপ্তই থাকে যতক্ষণ না অনুকূল পরিস্থিতি ও ইচ্ছা তাদের জাগিয়ে তুলে নিয়ে আসে মনের চেতন-স্তরে।

এখানে একটি উদাহরণ দেওয়া যাক্ঃ একটি আলোহীন ঘরে লণ্ঠনের আলোকের সাহায্যে পর্দায় ছবি ফেলা হচ্ছে। ঘরটি সম্পূর্ণ অন্ধকার। আমরা ছবি দেখছি। ধরুন জানলা খুলেদেওয়া হ'ল যাতে মধ্যাহ্নের সূর্যরশ্মি এসে পড়ে পর্দার গায়ে, তখনো কি ছবি দেখা যাবে? যাবে না, কেননা অধিকতর দীপ্তিমান্ সূর্যের আলোকবন্যা লণ্ঠনের আলো ও ছবিকে নিষ্প্রভ করবে। আমাদের চোখে অদৃশ্য হলেও পর্দার গায়ে ছবিগুলির অস্তিত্বকে কিন্তু আমরা অস্বীকার করতে পারবো না। সেই রকম অবচেতন-মনের পর্দায় আমাদের পূর্বজীবনের বিভিন্ন ঘটনা সুপ্ত ও অদৃশ্য থাকতে পারে, কিন্তু তাদের অস্তিত্ব থাকেই।

এখনই প্রশ্ন হতে পারে—কেন তবে তারা আমাদের কাছে অদৃশ্য থাকে? তার উত্তর হ'লঃ ইন্দ্রিয়চেতনার অধিকতর শক্তিশালী আলোক তাদের নিষ্প্রভ ক'রে রাখে বলেই বহির্জগতের সংযোগ ছিন্ন করে আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারকে বন্ধ করে ও অন্তঃকরণের নিগূঢ়তম স্তরে চৈতন্যালোক ও মানসিক রশ্মির প্রতিফলনের দ্বারা আমরা আমাদের পূর্বজীবনকে জানতে ও তাঁর সকল অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করতে পারি। যাঁরা অতীত জীবনকে স্মরণ করতে ইচ্ছুক তাঁদের স্মৃতিশক্তিকে বর্ধিত করার জন্য রাজযোগ অভ্যাস ও ইন্দ্রিয়দ্বারকে রুদ্ধ ক'রে মনঃসংযোগ শিক্ষা করা উচিত। আত্মসংযমের দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযত ক'রে মনঃসংযোগশক্তিকে প্রকাশে সাহায্য ও পুষ্ট করতে হয়।

মনে করতে পারি আর নাই পারি, সহজাত ও সুপ্ত সংস্কারই চরিত্র-সংগঠনের প্রধান উপাদান। এরাই আমাদের সকল অসাম্য ও সকল বৈচিত্র্যের কারণ। অসাধারণ ও প্রতিভাশালী চরিত্রগুলির সমালোচনা করলে পূর্বজন্মবাদকে অস্বীকার করা যায় না। জীবাত্মার পূর্বজীবনের অভিজ্ঞতারই বর্তমান জীবনে হয় অভিব্যক্ত। পূর্ব-পূর্ব জীবনে সংগৃহীত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান যদি আমাদের থাকে তো প্রত্যেকটি বিশেষ বিশেষ ঘটনা—যাদের মাধ্যমে সে জ্ঞান অর্জন করা হয়েছে—সেই জ্ঞানার্জনের সংগ্রামকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মনে করা বা না করাতে বিশেষ-কিছু এসে যায় না। বিশেষ বস্তু বা ঘটনাটি হয়তো আমাদের মনে না আসতে পারে, কিন্তু তাতে আমরা জ্ঞান হতে ভ্রষ্ট হবো না। এখন বর্তমান জীবনের আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, আমাদের

এ' জীবনে কিছু-না-কিছু অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হয়েছে। বিশেষ বিশেষ ঘটনা বা কর্মসংগ্রাম,—যার মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতাটি লাভ করা হয়েছে তার বিস্মরণ ঘটতে পারে, কিন্তু ঐ অভিজ্ঞতা গড়ে তুলেছে চরিত্র, এবং বিচিত্র পন্থায় তা রূপায়িত করেছে মানবকে। সেই অভিজ্ঞতা কি ক'রে হ'ল তা স্মরণ করার জন্য ঘটনাপুঞ্জের পুনরাবৃত্তির আর প্রয়োজন হয় না। লব্ধ জ্ঞানই যথেষ্ট।

আমরা আমাদের মাঝে এমন লোক দেখি যারা অদ্ভুত শক্তি নিয়ে জন্মায়। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক্ 'আত্মসংযমশক্তি'-কে। একজন জন্ম হ'তেই প্রবল আত্মসংযমশক্তি নিয়ে জন্মায়, আর একজন হয়তো বহু বছরের কঠোর সাধনায়ও তা আয়ত্ত করতে পারে না। এই পার্থক্যের কারণ কি? ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব আত্মানুভূতি নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মাত্র চার বছর বয়সে তিনি পৌছাতে পেরেছিলেন সে সমাধির উচ্চস্তরে—যে স্তর যে-কোন যোগীর পক্ষে অত্যন্ত দুরধিগম্য। এক বৃদ্ধ অপূর্ব ক্ষমতাশালী যোগী একবার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে এসেছিলেন তাঁকে দেখতে। একদিন তিনি বললেন: 'আমি চল্লিশ বছর সাধনা ক'রে যে অবস্থা আয়ত্ত করতে পেরেছি তা আপনার কাছে সেই অবস্থা কতো স্বাভাবিক।' বেদান্তদর্শনের ভাষ্যকার শংকরাচার্য যখন ভাষ্য রচনা করেন তখন তাঁর বয়স মাত্র বারো। সেই ভাষ্যের অর্থ পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারেন আজও এমন দার্শনিক ও চিন্তাশীল জগতে খুব কমই আছেন। সে'গুলি এতোই প্রচ্ছন্ন এবং এতোই গভীর যে, সাধারণ মন তা গ্রহণ করতেই পারে না। এ'রকম বহু ঘটনাই পূর্বজন্মের যথার্থতার নিদর্শন দেয়। অতীত স্মৃতির উপর নির্ভর না ক'রেই পূর্ব-পূর্ব জীবনের সুপ্ত অভিজ্ঞতা ও সংস্কার গড়ে তোলে মানুষের চরিত্র। আমাদের মনে না করাতে বা আমাদের বিশেষ ঘটনার স্মৃতিচ্যুতিতে আত্মার অগ্রগতি প্রতিরুদ্ধ হতে পারে না স্মৃতিগত দুর্বলতা সত্ত্বেও আত্মার অগ্রগতি ক্রমশঃ চলবেই।

প্রত্যেক ব্যষ্টি আত্মারই অবচেতন-মনের অন্তরালে লুকানো থাকে এই অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। দুটি প্রেমিকের ঘটনার কথাই ধরা যাক্। ভালোবাসা কি? দুই আত্মার পারস্পরিক আকর্ষণই ভালোবাসা। এই ভালোবাসা বা এই প্রেমের দেহগত মৃত্যুর সাথেই মৃত্যু হয় না। প্রকৃত প্রেম মৃত্যুর পরও বৃদ্ধি পেতে থাকে ও দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হতে থাকে। ঘটনাপারম্পর্যে এই প্রেমটি দু'টি আত্মাকে সংবদ্ধ ক'রে তাদের এক করে। একমাত্র পূর্বজন্মবাদই বলে দিতে পারে—কেন প্রথম দৃষ্টিতে দুটি ভিন্ন আত্মা উভয়ে উভয়কে চিনতে

পারে এবং আবদ্ধ হয় চিরবন্ধুত্বের সূত্রে। পারস্পরিক ভালোবাসা ক্রমশঃ হতে থাকে পুষ্ট, হতে থাকে শক্তিশালী এবং পরিশেষে প্রেমিকদের করে সংবদ্ধ—তারা যেখানেই থাক্ তাতে কিছু যায় আসে না। অতএব বেদান্ত বলে না যে, দেহের সমাপ্তিতেই আত্মার ভালোবাসার আকর্ষণের সমাপ্তি হয়। আত্মাও যেমন অমর, তার সম্পর্কও তেমনই অমর। কিন্তু আমাদের ভুললে চলবে না যে, ঐ ভালোবাসা এবং সম্বন্ধ পারস্পরিক হওয়া আবশ্যক। তুমি যদি একজনকে ভালোবাসো অথচ সে তোমাকে ভালোবাসে না—সেখানে ভালোবাসা হয় একপাক্ষিক, ঐ ভালবাসা আত্মাকে একীভূত করতে পারে না। বেদান্তের আলোকে আমরা জানতে পারি, অমরত্ব অর্থে যেমন অনন্ত ভবিষ্যৎ-সত্তাকেই বোঝায়, প্রাক্‌সত্তা বললেও তেমন অনাদি অতীত জীবনকেই বোঝা যায়। এদের একটিকে ছাড়া অপরের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। এদের এক একটি আমাদের আত্মিক জীবনের অর্ধাংশকে ব্যক্ত করে, আর দু'টি অংশের মিলনেই আসে সম্পূর্ণতা। এটাই হ'ল অনন্ত আধিভৌতিক জীবন। এ' আগেও ছিল জন্মরহিত, সুতরাং চিরদিনই থাকবে জন্মরহিত। অতীত জীবনের ফল হল আমাদের বর্তমান জীবন আর এই বর্তমান জীবনের ফলই রূপ নেবে ভবিষ্যৎ জীবন। কিছুই নষ্ট হবে না।

আধুনিক প্রেততত্ত্ব ভবিষ্যতের ওপর কিছুটা আলোকপাত করার ফলে জানা যায়, বিচ্ছিন্ন প্রেতাত্মাও তাদের অতীত সম্পর্ককে মনে রাখে। এর থেকে দেখা যাচ্ছে, স্মৃতি সম্পূর্ণরূপে দৈহিক যন্ত্রপাতির ওপরই নির্ভর করে না, আসলে তা ফেরে জীবাত্মার সাথে সাথে। দেহগত যন্ত্রের ধ্বংস আছে এবং দেহের সাহায্যে কেবল প্রচ্ছন্ন আত্মা তার অধিগত ক্ষমতাকে পুনর্বিকশিত করে মাত্র। এইজন্য আমাদের বর্তমান জীবনকে বলা হচ্ছে অতীত জীবনের ফল। অতীতের সকল সংস্কার ও অভিজ্ঞতা এতে সঞ্চিত থাকে, কেবল বিশেষ পরিস্থিতিতেই তারা মনের চেতনাস্তরে আনে। কিন্তু অমরত্বের অর্থ এই নয় যে, আমরা স্বর্গে গিয়ে অনন্ত সুখভোগ করবো আর অসৎ কর্মের শাস্তিস্বরূপ অনন্ত নরক ভোগ করবো।

বেদান্ত অন্যভাবে 'অমরতা' অর্থে বলেছে 'আত্মার অগ্রগতি'—নিম্ন হ'তে উচ্চস্তরে ক্রমবিবর্তন। বেদান্তের মতে, প্রত্যেক ব্যষ্টি আত্মার মাঝে যে সুপ্তশক্তি থাকে—বিভিন্ন স্তর ও অবস্থার মধ্য দিয়ে আত্মার অগ্রগতির সাথে সাথে সেগুলিও পরিবর্ধিত হ'তে থাকে যতক্ষন না তারা বিশুদ্ধ ও সিদ্ধ

অবস্থায় পৌঁছায়। চরমলক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য ও চরমশক্তিকে আয়ত্ত করার উদ্দেশ্যে আত্মা বিভিন্ন স্তর ও জীবনের বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতার পর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রে চলে। যে কারণ আমাদের বিকাশের এই স্তর নিয়ে এসেছে, সেই কারণই আমাদের নিয়ে আসবে আবার ভবিষ্যতের বুকে এই ধরণীর ধূলিতে। মৃত্যুর পরও সেই কারণ যদি বর্তমান থাকে তাহলে কোন-কিছুরই আমাদের পার্থিব জগতে পুনঃপ্রত্যাবর্তনকে রোধ করতে পারে না, আমাদের উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা পূর্ণ হবেই। এই ধারণা থেকে জীবাত্মার পুনর্জন্মবাদের সৃষ্টি। প্রাক্‌সত্তা ও অমরতারূপ অন্তত দেহাতীত জীবনের সত্যের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে এই মতবাদ। আত্মার গতি, তা স্বর্গেই হোক আর কোন শাস্তিভোগের জন্য অধস্তরেই হোক—নির্ভর করে সম্পূর্ণরূপে আমাদের চিন্তা ও কর্মগত ফলাফলের ওপর। কিন্তু সেই স্থিতি চিরস্থায়ী নয়, তা শুধু যতক্ষণ না ফলভোগের শেষ হয় ততক্ষণের জন্যই সাময়িকভাবে থাকে মাত্র। কর্ম ও চিন্তানুযায়ী ফলভোগের শেষ না হওয়া পর্যন্ত আত্মা আবার এই জগতে ফিরে আসে আরও শক্তি, আরও জ্ঞানলাভ করতে গন্তব্যে পৌঁছানোর বা সিদ্ধিলাভের উদ্দেশ্যে। স্বর্গকে বেদান্ত অনন্ত বলে স্বীকার করে না, আত্মার এমন শক্তি আছে যার সাহায্যে সে স্বর্গেরও পারে সকল ক্ষণিক ভোগের ঊর্ধ্বে যেতে পারে। কেন আমরা একটি সীমাবদ্ধ স্থানেই বা থাকবো? যদি এই স্থানে—এই পৃথিবীতেই আমাদের ফিরে আসতে ইচ্ছা না হয় তো স্বর্গে গিয়েও আমরা সন্তুষ্ট থাকতে পারবো না! এমন সময় আসবে যখন আমরা সকলের পারে যাবার জন্য সচেষ্ট হবো, চেষ্টা করবো সিদ্ধ হ'তে, সর্বত্যাগী হতে সর্ববিৎ হ'তে। বেদান্তে এইজন্যে বলা হয়েছে—

"শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি স্বর্গও ক্ষণস্থায়ী ও সান্ত। স্বর্গ ও জগতের মাঝে যে ব্যবধানের রাজত্ব তা শুধু ব্যষ্টি আত্মার প্রাতিভাসিক বৃদ্ধি ও অগ্রগতির সহায়তা করে। যারা সেখানে যায় এবং অবস্থান করে তারা জন্ম ও পুনর্জন্ম বন্ধন হতে মুক্ত নয়। তারা আবার ফিরে আসবে। কিন্তু যাঁরা সিদ্ধ হন তাঁরা সকল রকম স্বর্গকেও অতিক্রম ক'রে যান অনির্বাণ চৈতন্যলোকে, উপভোগ করেন অনন্ত জীবনের সার্থকতা এবং চিরদিনের জন্য লাভ করেন পরিশুদ্ধিতা।[৩]

৩। ভগবদ্গীতা ৮।১৬।২৭

নবম অধ্যায়

॥ বিজ্ঞান ও অমরতা ॥

খ্রীষ্টানসমাজে সাধারণের বিশ্বাস যে, যীশুখ্রীষ্টই অমরত্ব এবং অনন্তজীবনের প্রবর্তক। তাঁকে আশ্রয় করা ছাড়া অমরতা লাভের আর অন্য কোন পথ নেই। অনন্ত জীবনের ধারণা ঈশ্বরের এই মহিমাময় পুত্রের আবির্ভাব ঘটার আগে ছিল না। কিন্তু তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অনুশীলনকারীরা সহজেই দেখতে পাবেন যে, এই অমরত্বের ধারণা খ্রীষ্টান যুগের বহু পূর্বে হিন্দু, মিশরীয়, চ্যালডীয় প্রভৃতি প্রাচীন জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। আর্য্য-জাতির বিভিন্ন শাখা যেমন জোরোষ্ট্রীয়, গ্রীসীয়, রোমীয়, স্ক্যাণ্ডিনেভীয় এদের মধ্যেও ঐ ধারণার প্রচলন ছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব বারো হতে আট হাজার বছরের মধ্যকার প্রাচীনতম নথিপত্র নিয়ে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, প্রাচীনতম নথিতেও দেহের পুনর্বিকাশের ওপর বিশ্বাসের প্রমাণ আছে, কিন্তু জড় ও আত্মা এ' দুটির ভিন্ন অস্তিত্বরূপে দ্বৈত ধারণার উৎপত্তি হওয়ার সাথে সাথে আনুষ্ঠানিক পুরোহিতের ও মিশরের চিন্তাশীলরা এই অপক্ক স্থূল পুনর্বিকাশের ধারণাকে নাকচ ক'রে দেন। তবে সংস্কারাচ্ছন্ন সাধারণ লোকেরা স্থূলদেহের পুনর্বিকাশেই আস্থাবান রয়ে গিয়েছিল আজও যেমন এ'ধরনের অনেকের সন্ধান পাওয়া যায় গোঁড়া খ্রীষ্টানদের মধ্যে। এই ধারণা তাঁদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে আছে। অজ্ঞ শ্রেণীর লোকেরা এখনো বিশ্বাস করে না যে, আত্মা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে এবং দেহ ব্যতীত তার অস্তিত্ব থাকতে পারে। বাস্তবিকই স্থূল জড়পদার্থের প্রতি আমাদের এমন এক আকর্ষণ থাকে যে, আমরাও মুহূর্তের জন্য ভাবতেও পারি না দেহ ছাড়া আমাদের জীবনযাত্রা চলতে পারে বা দেহ বিনা আমাদের অস্তিত্ব থাকতে পারে। কত যত্ন করেই না তাই দেহকে সুবেশিত করা হচ্ছে, কতো সুন্দর জিনিস ও উৎকৃষ্ট খাদ্যসম্ভারের দ্বারা তার পরিপোষণ করা হচ্ছে।

খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০ শতকের প্রাচীন মিশরীয়দের লেখা থেকে পাই : "আত্মা যাবে স্বর্গে আর দেহ জগতে; স্বর্গ পাবে তোমার আত্মা, জগতে থাকবে তোমার দেহ"। মনে রাখতে হবে, খ্রীষ্টের জন্মের ৩৫০০ বছর

আগেও এই কথা উচ্চারিত হয়েছিল মিশরীয় চিন্তাশীলদের মুখ হ'তে, তা লিখে রাখাও হয়েছিল এবং তারা বিশ্বাস করতো যে, ক্রিয়াকলাকুশলীদের আত্মা স্বর্গে গিয়ে পান-ভোজন ও সুখের মধ্যে কাটাবে, তারা লাভ করবে হাল্কা বায়বীয় ও কর্মঠ দেহ আর সেই জন্যে তাদের খাদ্য পানীয়ের প্রয়োজন। এই ধারণা ও যুক্তির বশবর্তী হ'য়ে মৃতের আত্মীয় ও বন্ধুরা কবরে খাদ্য রেখে দিতেন। সময় সময় তাঁরা রক্ষাকবচ বা ঐ জাতীয় তুক্‌তাক্‌ করা জিনিস দিয়ে আসতেন—যাতে দুষ্টপ্রভাব থেকে মৃতাত্মা নিজেকে রক্ষা করতে পারে। আবার এমন সব লেখা পাওয়া যায় যে'সবে বলা হয়েছে : 'মৃতের আত্মা স্বর্গে যায় এবং শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে'। তারা শ্বেতবস্ত্র পরিধান ক'রে শান্তিময় ক্ষেত্রে ভ্রমণ করে, দেবতাদের সঙ্গে বিহার করে এবং খাদ্য গ্রহণ করে। এ জগতের অনুরূপ খাল; জলপথ, নৌকা, ঘোড়া, রথ—এক কথায় সকল-কিছুই স্বর্গে পাওয়া যায়। ঐ সুখভোগ, আরাম এবং আনন্দ চিরস্থায়ী। মিশরীদের ধারণায় এই হ'ল অমরত্ব। আসলে আমরা ইহজীবনে যা চরমসুখ ব'লে মনে করি সেই সুখের অনন্ত উপভোগকেই তারা অমরত্ব আখ্যা দিয়েছিল। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, 'অনন্ত' মানে লক্ষ বা কোটি কোটি বছর নয়,—'অন্তহীন কাল'। অনন্তের অর্থ কি ধরবে 'অন্তহীন কালের সুখভোগ'? 'ইলিসিয়ানস্‌-ফিল্ড'-এর প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যেও অনুরূপ বিশ্বাস পাওয়া যায়। নিষ্ঠাবান যাঁরা—সেখানে যান, তাঁরা অনন্তকাল সুখভোগ করেন। প্রত্যেক পরলোকগামী ব্যক্তি এ'জগতে যে সুখ কামনা করতেন, যে জীবিকা পছন্দ করতেন তাই ভোগ করেন সেখানে। সুইডেনবার্গের লোকদেরও এইরকম বিশ্বাস ছিল এবং আজও অনেক চার্চের এই বিশ্বাস আছে। খুব বেশীদিন—হয়নি নিউ ইয়র্কের একজন ধর্মযাজক এক সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখেছিলেন যাতে তিনি বলেছিলেন : "এই পৃথিবীতে আমাদের যেমন যেমন কর্ম হবে স্বর্গেও ঠিক তেমনি কর্ম থাকবে। আমরা কোনভাবেই তার অদলবদল করতে পারবো না; তার পরিবর্তন হতে পারে না। কিন্তু আমাদের দেখে নিতে হবে সেই অনুযায়ী আমাদের জীবিকা। আমাদের এই জীবনের কর্মধারাকে আমরা যেমন ভাবেই গ্রহণ করি না কেন তা আমাদের স্বর্গের কার্যপ্রণালীর ওপর ছায়াপাত করবেই। এই ধরণীতে যে কাজ গ্রহণ করা হবে সেখানে সেই কাজই হয়ে উঠবে আমাদের পক্ষে উচ্চতর—মহানতর"।

এই যদি সত্যি হয় তো আমার জানতে ইচ্ছা করে যে, আমাদের রাঁধুনী, পরিচারিকা, আইনজীবি, পথ সংস্কারক প্রভৃতির মধ্যে ক'জন তাদের সেই কাজ অনন্তকাল ধরে ক'রতে ইচ্ছুক, এদের ক'জন নিজের কাজের সমাপ্তি চায় না ?

নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টানদের মধ্যে একটি বিশ্বাস দেখা যায় যে, অনন্তজীবনের ও স্বর্গভোগের ধারণার সঙ্গে চিরাগত বীণা-বাজানোই যেন স্বর্গের একটি প্রধান কাজ। একটি স্তোত্র—যা প্রায়ই গীর্জায় গাওয়া হ'ত, তাতে স্বর্গের আমোদ-প্রমোদের বর্ণনা আছে, সেখানে বিশ্রাম-দিবসের কোন শেষ নেই।

আমরা আগেই বলেছি যে, খ্রীষ্টের পূর্বে প্রাচীন জাতিদের মধ্যে অনন্তজীবন ও স্বর্গসুখভোগ সম্বন্ধে একটি প্রচলিত বিশ্বাস ছিল। তাই 'খ্রীষ্টান দেবতাত্ত্বিকদের যীশুখ্রীষ্ট প্রথম অনন্তজীবনের ধারণা এনে দেন' এই অন্ধ মতবাদ নিয়ে যখন বিচার করতে যাই তখনই আমাদের মনে প্রশ্ন ওঠে—সেটাই কি সত্যি ? যে সব ইহুদিরা জন্মান্তর বিশ্বাস করতো না বা মরণের পর আত্মার সত্তা থাকে মনে করতো না তাদের কতকগুলির মধ্যে যীশুখ্রীষ্ট জ্ঞানের উন্মেষ করেছিলেন সত্য, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনিই সর্বপ্রথম জন্মান্তরের ধারণা পৃথিবীতে প্রকাশ করেন, বরং পুনর্বিকাশের যে স্থূল ধারণা তার সময় ইহুদিদের মধ্যে প্রচলিত ছিল তা ব্যাবিল-অবরোধের সময় (খ্রীঃ পূঃ ৫৮৬-৫৩৬) পারসিকদের কাছ থেকেই নেওয়া হয়েছিল। জেনদাবেস্তা পড়লে দেখা যাবে, প্রত্যেক ব্যক্তি ভালোই হোক আর মন্দই হোক্ মৃত্যুর তিনদিন পরে পুনর্জীবিত হবেই এবং স্বর্গে কিংবা শাস্তিভোগের লোকে হবে তার গতি। এই বিশ্বাস ইহুদীদের মধ্যেও ছিল। ফারিসিস্‌রা[1] এই বিশ্বাস মেনে নেয়। স্যাডুসিস্‌রা কিন্তু এ'ধারণাকে করে নাকচ এবং অপরাপর ইহুদীরাও করে বর্জন।

কাজেই অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ পাঠ ক'রে আমরা জানতে পারি এই বিশ্বাসের প্রবর্তন যীশুখ্রীষ্ট করেন নি। যদিও 'অমরত্ব' বলতে চলে এসেছে অনন্ত স্বর্গজীবনভোগের ধারণা তবুও অমরত্বের প্রশ্ন একটি অতি কঠিন সমস্যা। জগতের অধিকাংশ চিন্তাশীল এবং দার্শনিক এই সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করেছেন। কেউ কেউ তাঁদের যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা কখনো হয়েছে মরণের অতীত জীবনের সপক্ষে, কখনো বা বিপক্ষে। কিন্তু 'অমরত্ব'-শব্দটির বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তার সত্যিকারের অর্থ মৃত্যুরহিত, অর্থাৎ সেই

১। তিনটি সম্প্রদায় ছিল—স্যাডুসিস্‌, ফারিসিস্‌ ও এসেনি।

অবস্থা—যাতে মৃত্যুর স্থান একেবারেই নেই। তাহলেই আবার প্রশ্ন ওঠে যে, মৃত্যু জিনিসটি কি? মৃত্যুর অর্থ যদি ধ্বংস, নির্মূলতা বা শূন্য হয় তাহলে বিশ্বজগতে এমন কোন বস্তু নেই যা মৃত্যু বা ধ্বংসের অধিগত। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, পদার্থমাত্রেই অবিনশ্বর, তার একেবারে নাশ নেই; প্রতিটি পদার্থের প্রতিটি অংশ যতই সূক্ষ্ম বা যতই স্থূল হোকনা কেন—তা অমর, শক্তি তার অমর, অমর তার তেজ, কেননা এরা কোনটি ধ্বংসের অধিগত নয়, তাদের কোনটিই শূন্যে পর্যবসিত হয়না। মৃত্যুর আর একটি প্রাচীন স্থূলধারণা ছিল—মৃত্যু একপ্রকার নিদ্রা। সেই ধারণা হ'ল: আত্মা মৃত্যুর পর হ'য়ে পড়ে অচেতন এবং সেই অবস্থাতেই থাকে পুনর্বিকাশ না পাওয়া পর্যন্ত, তারপর আবার সে মিলিত হয় দেহের সংগে। তখন দেহ ও আত্মা একই সাথে যায় স্বর্গে বা নরকে এবং অপেক্ষা করে করুণাময় পিতা ঈশ্বর যতদিন না তার বিচার করেন। খ্রীষ্টান দেবতাত্ত্বিকদের মতে, মরণশীল মানুষের পক্ষে মৃত্যুই হ'ল সবচেয়ে বড় শত্রু, আর মৃত্যু আত্মার অনন্তকালের সমাধি। সৎ আত্মা চিরকালই থাকে ভালো, সুখশান্তি নিয়ে, আর অসৎ আত্মা ভোগ করে দুঃখ চিরদিনের তরে। মৃত্যুর এই ভয়াবহ ধারণা এখনো অনেক খ্রীষ্টানদের মধ্যে আছে বদ্ধমূল হয়ে। মৃত্যুর বিভীষিকা ও হতাশা তাদের তীর্থস্থানের পুণ্যময় আবহাওয়াকেও প্রভাবান্বিত করেছে। মৃত্যুকে স্মরণ ক'রে লোকে ভয়ে কেঁপে উঠতো, কেননা মৃত্যুই নাকি আত্মার চরমপরিণতি এবং তা সকলের জন্যেই প্রযোজ্য সকল ব্যক্তিকেই অক্ষয় ছাঁচে ঢেলে ক'রে রাখে অপরিবর্তনীয়, আর ধর্মত্যাগী দুষ্টকে ভোগ করতে হবে চিরকাল কষ্ট। এখন বিজ্ঞানতত্ত্ব আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে এই ব'লে যে, মৃত্যু অতো নিন্দনীয় নয়, সাহস নিয়ে এসো মনে, কেননা মৃত্যু জীবনের শত্রু নয়। তারপর না মরলে বাঁচতেও পারতুম না আমরা কোনদিন, তাই মৃত্যু জীবনের অচ্ছেদ্য ধারাবাহিকতার প্রতীক। মৃত্যু না থাকলে থাকতো না বৃদ্ধি, হ্রাসের প্রশ্নও উঠতো না, তাই মৃত্যুকে মোটেই ভয় করার কিছু নেই।

আত্মবিজ্ঞানী মনীষীরা তাই মৃত্যুকে ভয় করেন না, বরং গ্রহণ করেন তাকে পরিবর্তন ও পরিবৃদ্ধির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বলেই। মৃত্যুকে বলেছেন তাঁরা পরিবর্তন, রূপ হ'তে রূপে বিবর্তন। আমাদের পার্থিব জীবনেও আমরা দেখছি যে, প্রতি সাত বছরে আমাদের শরীর গড়ে উঠছে নতুন হয়ে এবং দেহের প্রতিটি অণুর সর্বদাই ঘটছে পরিবর্তন। দেহরূপ যন্ত্রে প্রতিটি

অণু নিত্য ধারণ করছে নতুন আকার; পুরাতনের হচ্ছে মৃত্যু, নতুনের হচ্ছে সমাবেশ। একটি গাছ পুঁতলে দেখা যায়, কিভাবে গাছের বৃদ্ধি শুরু হওয়ার সাথে সাথে তার বীজের হয় ধ্বংস। মৃত্যুতে জীবনের নতুন পর্যায়ের হয় সূত্রপাত, সুতরাং পুরাতন ধারণাকে বদ্ধমূল ক'রে আমাদের মৃত্যুকে জীবনের চিরশত্রু ব'লে ভাবা মোটেই সঙ্গত নয়। মৃত্যুকে জীবনের বন্ধুরূপেই বরং চিন্তা করতে হবে। সুতরাং মৃত্যু অর্থে যদি পরিবর্তন ধরা হয় তাহলে অমরত্ব লাভ করবে একটি নতুন অর্থ, একটি নতুন রূপ এবং সেটাই হ'ল সেই অবস্থা—যা মরে না, যার মৃত্যু নেই। অমরত্ব হ'ল অখণ্ড, এমন একটি অবিকৃত অবস্থা যা সম্পূর্ণ অপরিবর্তনশীল—মরণাতীত। কাজেই অমরত্বের প্রকৃত অর্থ অপরিবর্তনীয় শাশ্বত একটি সত্তা। এখন অমরতার অর্থ যদি এ'রকমই হয় তাহলে প্রশ্ন ওঠে যে, সত্যিই কি এমন একটি অবস্থা আসে যার কোন পরিবর্তন নেই, যার বিকৃতি নেই মোটে? এ'কিন্তু একটি জটিল প্রশ্ন। এর উত্তরও অতি গভীর ও রহস্যময়। আমাদের সমস্ত প্রাতিভাসিক জগৎকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে হবে সত্যি এমন কোন সত্তা আছে কিনা যার কোন পরিবর্তন নেই, যা শাশ্বত। আধুনিক বিজ্ঞানও বলে—সকল-কিছু পরিবর্তনশীল। প্রত্যেক স্থানেই পরিবর্তন ও ধ্বংসে (রূপ-বিবর্তনের) প্রভাব আছে। কেমন ক'রে কুয়াশাময় নীহারিকাপুঞ্জ হ'তে সৌরজগতের উৎপত্তি হয়েছে তা আমরা জানি। কুয়াশার অবস্থা থেকে ক্রমশ তা ঘনীভূত হয়ে জমাট বেঁধে লাভ করলো কাঠিন্য। তারপর আবার তা বাষ্পীয় অবস্থায় আসে ফিরে। আমাদের জড়শরীরেও আছে পরিবর্তন, আর শরীরের নিত্যই ঘটছে পরিবর্তন। নিজেকে আমরা যদি নভোমণ্ডলে ঘূর্ণাবর্ত-রূপে কল্পনা করতে পারি কিংবা এক্স-রের (রঞ্জনরশ্মির) মধ্য দিয়ে যদি নিজেদের হাত আমরা দেখি তাহলে দেহবস্তুটি কেমন তা সহজেই বুঝতে পারবো। আমাদের শরীরকে ঘিরে পদার্থের সূক্ষ্ম-বায়বীয় কণিকাগুলি এক প্রকার ঘন অচ্ছেদ্য নিরেট আবরণের সৃষ্টি ক'রে রেখেছে। এই কণিকাগুলির মাঝে কোনই ফাঁক নেই। সেই ঘন পদার্থের এক একস্থানে ছোট ছোট ঘূর্ণাবর্ত আছে, তাকেই আমরা বলি আমাদের 'দেহ'। শরীরের সূক্ষ্মতম অংশেরও সর্বদা পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যে আমরা অনুভব করি যে, কিছু-না-কিছু বস্তু আসছে বাইরের জগৎ থেকে। কোন প্রকার সংবেদন বা ইথারতরঙ্গ-রূপেই হোক, আলোককম্পন রূপেই

হোক কিংবা বায়বীয় কম্পনরূপেই হোক আমাদের স্নায়ুতন্ত্রে করে নিত্য-নিয়ত আঘাত, সৃষ্টি করে একপ্রকার কম্পনের রূপ, বাহকতন্ত্রে আনে এক পরিবর্তন মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্রে তোলে কম্পন, চৈতন্যের সাহায্যে সৃষ্টি করে এক আলোড়ন ও আনে পরিবর্তন। প্রতিপদেই আমরা উপলব্ধি করি এই পরিবর্তনকে। এই পরিবর্তন ব্যতীত আমরা কোন শব্দ শুনতে পাই না, কোন আঘ্রাণও পেতে পারি না। সমস্ত ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতি এবং চিন্তাও এক প্রকার কম্পন। তারা নিত্য নুতনভাবে ওঠে আবার বিলীন হয়। কম্পনের একটি ধারা আমাদের এক নির্দিষ্ট সীমায় উপস্থাপিত করে এবং সৃষ্টি করে অপর রকমের কম্পন বা আবেগ।

কিন্তু এই সমস্ত কম্পনই পরিবর্তনের অন্তর্গত। আমাদের ব্যক্তিত্বপূর্ণ সত্তাও পরিবর্তনের অধিগত। কাজেই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, অমরত্বের তাহলে স্থান কোথায়? আমরা এক বৈজ্ঞানিককে এই প্রশ্ন করি, কিন্তু বিজ্ঞানে এর উত্তর পাওয়া যায় না। জগতে সম্পূর্ণরূপে অপরিবর্তনীয় বলে কিছু নেই। প্রাতিভাসিক জগৎ সর্বদাই পরিবর্তনশীল। যে-কোন পদার্থ স্থান ও কালাপেক্ষা তা অবশ্যই পরিবর্তিত হবে। যে-কোন রূপই আমরা করি না কেন তার বেলাতেও এ'কথা খাটবে। আকার জড়োৎপন্ন হতে পারে, বায়বীয় হতে পারে, কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই তা পরিবর্তনের অধীন, পরিবর্তনমুক্ত কোন জিনিসই নয়। এখন তাহলে কি অমরতা অর্থে ধরা যায় যে, আত্মা এক নবপরিচ্ছদ পরিধান ক'রে স্বর্গে যাবে ও অনন্তকাল ধ'রে স্বর্গসুখ ভোগ করবে, আর বায়বীয় আচ্ছাদন আবরিত ব'লে তা প্রতিমূর্তির মতো চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে? কেননা যে-কোন ভাব একপ্রকার পরিবর্তনই, কাজেই দেহ থাকবে, অথচ কোন পরিবর্তন থাকবে না—এ'কি করে চিন্তা করা যায়। আমরা ঐ প্রকার বিশ্বাস করতেই পারি না। কাজেই স্বগায় বা অপার্থিব দেহ যতই সূক্ষ্ম ও যতই বায়বীয় হোক না কেন তা অমরত্বের দাবী করতে পারে না।

আনন্দের প্রত্যয়কে বিশ্লেষণ ক'রে দেখলে আমাদের বেদনার কোন অনুভূতি থাকে না। একটি অনুভূতির সাথে পূর্বোপলব্ধ অনুভূতির তুলনা ক'রেই আমরা বুঝতে পারি সেই অনুভূতি কি, আর জানতে পারি দুটির অর্থ ও তাৎপর্য। এখন যদি আমরা অনন্ত সুখভোগ করি তাহলেও আমাদের ব্যাথার ধারণাও থাকবে, নয়তো সুখভোগ করা হবে না। এই জন্যই যাঁরা অনন্ত স্বর্গকে বিশ্বাস করেন তাঁরা নরকাগ্নির প্রতিও আস্থাবান হন। এর

অন্তর্নিহিত সত্য এই যে, একটি অভিজ্ঞতা ছাড়া অন্যটিকে উপভোগ করা যায় না, কেননা জগতের সকল জিনিসই আপেক্ষিক, একটি থাকলেই অপরটি থাকবে।

স্বর্গ ও নরককে স্থূলভাবে বর্ণনা করলে বলা যায়, একটি কাঁচের প্রাচীর যেন স্বর্গ ও নরককে করেছে বিভক্ত। স্বর্গসুখ ভোগ করার সময়ে পুণ্যবান আত্মারা অন্যকে (কলুষিত আত্মাকে) নরকের যন্ত্রণা ভোগ করতে দেখতে পায় এবং তাদের সাথে নিজেদের অবস্থার তুলনা ক'রে নিজেদের সুখকে উপলব্ধি করতে পায়, আর তা না হলে কোন সুখভোগই তারা করতে পারতো না। অবিচ্ছিন্নভাবে সুখভোগ ক'রলে সুখকে মোটেই সুখ ব'লে উপভোগ করা যায় না। এখন মনে করো তুমি সঙ্গীত ভালবাসো, কিন্তু আর-কিছু না করে যদি দিনরাত কেবল গানই শুনতে থাকো তো সঙ্গীত আর তোমার কাছে আনন্দদায়ক ব'লে মনে হবে না, ছ'ঘণ্টা শোনার পরই তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়বে। একই রং যদি সারাক্ষণ দেখ তো তার বর্ণত্ব পাবে লোপ। কাজেই অনন্ত স্বর্গভোগেও তুমি সুখ পাবে না। এই সকল অবস্থার মধ্যে কোথাও দেখা যাচ্ছে না যে, সূক্ষ্মদেহসহ অক্ষয় স্বর্গজীবন অর্থে বোঝায় অমরতা কিংবা তুলনাবিহীন অবস্থায় স্বর্গসুখভোগই হ'ল অমরত্ব। অমরতা অর্থে যাঁরা ব্যক্তিগত অমরত্বকে ধরেন তাঁরা ব্যক্তিত্বের অর্থ ঠিকভাবে বোঝেন না। তাহলেই প্রশ্ন আসে যে, ব্যক্তিত্বের সত্যকারের অর্থ কি? 'ব্যক্তিত্ব' মুখোশ মাত্র—মনের এক পোশাকবিশেষ। আমরা দুটি ব্যক্তিত্ব, তিনটি ব্যক্তিত্ব বা বহু ব্যক্তিত্বের কথা জানি। ইংলণ্ডে একটি মেয়ের দশটি ব্যক্তিত্ব ছিল এবং প্রতিটি ছিল সুস্পষ্ট। সে'জন্য ব্যক্তিত্বকে যেন আমরা চেতনার (চৈতন্যের) একটি অবস্থা বলে ভুল না করি। এটি রংগমঞ্চের একটি কৃত্রিম চরিত্রের মতো। ব্যষ্টি আত্মা যখন জীবন-নাট্যের অভিনয়ে একটি বিশেষ অংশের ভূমিকায় বিশেষ চরিত্রের সৃষ্টি করে তখন সেই চরিত্র সাময়িকভাবে একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের কাজ করে। যখন আবার স্বতন্ত্র চিন্তার উদ্ভব হয় এবং স্বতন্ত্র ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির উদয় হয় তখন অন্য একটি ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হয় এবং আমরা আমাদের পুরানো ব্যক্তিত্বকে বিস্মৃত হই। ব্যক্তিত্বকে অনুশীলন করলে দেখা যাবে তাও রোগ, মৃত্যু ও ক্ষয়ের অনুগামী। ব্যক্তিত্ব বলতেও তাই জগৎ বা স্বর্গের অপরিবর্তনীয় কোন অবস্থা নয়।

অনেকে অমরত্ব-অবস্থাকে এক আপেক্ষিক সত্তা বলে মনে করেন, আর তা

ব্যক্তিবিশেষের স্বভাবজাত নয়, পরন্তু ঈশ্বরের দান। তারপর প্রশ্ন ওঠে যে, সে'টি কি ধরনের প্রকৃতির দান এবং কোন্ অবস্থায় তাকে পাওয়া যায়? কে নির্ধারণ করবে যে, ভুল হ'তে কতো উচ্চমানের প্রয়োজন সৃষ্টি হয় যাতে ঈশ্বরের সেই দানকে লাভ করতে পারা যায়। কেউ কেউ বলবেন, নির্দিষ্ট কোন কাজ, জীবনধারা বা আরাধনামূলক ক্রিয়া তার মান। তবুও যদি আমরা আরাধনা এবং ঐ সকল শারীরিক ও মানসিক কর্মকে বিশ্লেষণ করিতো দেখতে পাবো যে, আমাদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ, কার্য ও তাদের প্রতিক্রিয়া, অর্থাৎ কার্য ও কারণনীতি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। প্রত্যেক কারণ তার সমান সমান কার্যের উৎপত্তি ঘটাবে। এখন কার্য যদি অনন্ত হয় তো কারণকেও হ'তে হবে অনন্ত। সসীম কারণ অসীম ফলের সৃষ্টি করতে পারে না, তা স্বভাব-ধর্মের বিরুদ্ধও। আমাদের সমস্ত কাজ হয় ভালো নয়তো মন্দ হবে। জীবদ্দশায় কত ভালো-মন্দ নির্বিশেষে সকল কার্য-কারণরীতি মুহূর্তের জন্য বন্ধ হয়েছে? সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাহলে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে পড়বে, কখনো একভাবে থাকবে না। যাঁরা বলেন, ঈশ্বর প্রাকৃতিক নীতি বা নিয়মেরও পরিবর্তন সাধন করতে পারেন, তাঁদের উক্তির কোন ভিত্তি নেই। এই ধরনের উক্তিকে আমরা কোনভাবেই গ্রহণ করতে পারি না। সুতরাং ঈশ্বর কাউকেই মুক্তহস্তে দান করতে পারেন না। দেবতাত্ত্বিকেরা বলেন, সাধন ভজন দ্বারা সেই দান পাওয়া যায়। তাই এখন আমরা যদি সাধন-ভজনের ওপর নির্ভর করি তাহলে সেটিও হবে সীমাবদ্ধ কাজ, আর তার ফলও হবে সীমাবদ্ধ। আমাদের সৎকর্মের ফলস্বরূপ অনন্ত ও শাশ্বত জীবনকে লাভ করা অসম্ভব। আমরা প্রকৃতির রীতিবিরুদ্ধ সে'রকম ফল কখনোই পাবো না। এই মতবাদকে ভারতীয় দার্শনিকরা কেউই স্বীকার করেন না। তাঁরা বিচিত্র স্বর্গে বিশ্বাসী। তাঁরা কর্মবাদ দ্বারা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, স্বর্গজীবনের মতো জাগতিক জীবনও পরিবর্তনের অনুগামী। সুতরাং অনন্ত জীবনও সাময়িক, কোনদিনই তা অনন্ত নয়। অনন্তকালের তুলনায় লক্ষলক্ষ বছরও বিদ্যুতের মতো চকিতগামী বলেই মনে হয়। এজন্য ভারতের সকল দার্শনিক বলেছেন, উচ্চতম স্বর্গ হতে বিশ্বপ্রকৃতির সকল স্তরের সব-কিছুই হ্রাস-বৃদ্ধি এই পরিবর্তনের অনুগামী।[২]

সৎকর্মের দ্বারা যাদের স্বর্গপ্রাপ্তি হয় তারা তাদের নির্ধারিত কালমাত্র সেইখানে থাকে, সেইক্ষণ উত্তীর্ণ হলেই অন্যত্র গমন করে। তারা এই পৃথিবীতে

২। ভাগবদ্গীতা ৮।১৬

ফিরে আসতে পারে, অথবা যদি স্বর্গে গিয়ে সহস্র বছর স্বর্গসুখ ভোগ করে তাহলেও তার পরিসমাপ্তি ঘটবেই। আমরা যদি স্বর্গীয় ও অপার্থিব দেহ লাভ করি তাহলে তাও পরিবর্তনশীল হবে এবং তাতে আমাদের আরাম ও যন্ত্রণার সংবেদন থাকবে। স্বর্গরাজ্যের পবিত্র দেহী দেবদূত প্রভৃতিরাও সীমাবদ্ধ। তাঁদের মানসপ্রত্যক্ষ-রূপ শক্তি থাকতে পারে, কিন্তু তাও সসীম। এই ধারণা আমরা বৈদিক মনীষীদের লেখা ছাড়া আর কোন দর্শন বা ধর্মের মধ্যে দেখতে পাই না। তাঁরা অপর থেকে শুনে কিছু মেনে নিতেন না, তাঁরা সহানুভূতির অন্তরতম দেশে প্রবেশ করে তবে সব-কিছু গ্রহণ করতেন। সে যাই হোক, এখন এমন এক ঈশ্বর আছেন যিনি কোন যৌক্তিকতার ধার ধারেন না, যাকে ইন্দ্রিয় স্পর্শ করতে পারে না, যিনি প্রকৃতির নিয়মকে মানেন না, তাঁকে কখনো সত্য বলে গ্রহণ করা যায় না। খ্রীষ্টের আয়ত্তে যদি অমরজীবন থাকে তো আমাদের প্রত্যেকেরও তার ওপর জন্মগত অধিকার আছে, নয়তো তিনি তা পেতে পারেন না। তাছাড়া বিশ্বগত একটি নিয়ম আছে এবং আলোকরীতি প্রতিক্রিয়ারীতি, কার্য ও কারণের রীতি সবই সমান। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, প্রতিপদে এই রীতিগুলি কার্যকরী। বিজ্ঞানেরও অভিমত প্রকৃতির নিয়মকে আবিষ্কার করো, যদি খ্রীষ্টপ্রচারিত সত্যের সঙ্গে প্রকৃতির নিয়মকে সুসংবদ্ধ করতে না পারো তো কোন সত্যকেই আবিষ্কার করতে পারবে না।

স্বর্গে যাওয়ার বা পুণ্যদেহ লাভ করার অর্থ অমরত্ব লাভ নয়। অমরত্ব হ'ল অপরিবর্তন ও শাশ্বত সত্তা। এই পরিবর্তনের জগতে অপরিবর্তনশীল কোন-কিছু থাকা কি সম্ভবপর? ঐ প্রশ্ন অনেক দিন আগেও বহু চিন্তাশীল মনকে করেছিল বিব্রত। বর্তমান যুগেও কাণ্ট, হাক্স্‌লি, আর্নেস্ট, হেক্‌ল প্রভৃতি মনীষীরা সকলেই চেষ্টা করেছেন অপরিবর্তনশীল সত্তাকে—যা নিরবচ্ছিন্ন সত্য, তাকে আবিষ্কার করতে। কিন্তু সত্যই তাঁরা কি আবিষ্কার করতে পেরেছেন? যাঁরা এই ধরনের চেষ্টা করেছেন তাঁদের দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: এক শ্রেণীকে বলা চলে বাস্তববাদী। এঁরা দেহাতীত আত্মাকে অস্বীকার করেন, ঈশ্বর বা আত্মার অমরত্ব নিয়েও মাথা ঘামান নি, ঈশ্বর বা অমরতার চিন্তাকে তাঁরা বলেন শক্তির অপব্যয়-মাত্র। অবশ্য তাঁরা জড়পদার্থ ও শক্তির ভেতর দিয়েই সকল কিছুকে দেখতে চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বলেন, শক্তি ও তেজই অমর। কিন্তু আমরা কি বাস্তববাদীদের এই অভিমতে সন্তুষ্ট হতে পারি? বাস্তববাদীরা কেবল বিংশ শতকেরই জীব নয়, বহু

প্রাচীনকালে—এমন কি বৈদিক যুগেও এমন বাস্তববাদী ছিলেন যাঁরা প্রত্যক্ষের বাইরে কোন সত্যকে স্বীকার করতেন না। গুণাতীত আত্মা বা ঈশ্বর বলে কোন-কিছুকে তাঁরা মানতেন না, যেহেতু দেহ ব্যতীত আত্মার অস্তিত্ব তাঁরা দেখতে পেতেন না।[৩]

আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ঐ শ্রেণীর লোক আছে, তাঁদের বিচারও আমাদের মনকে তৃপ্ত করে না। এমন কি তারা যদি বলে যে, আত্মা নেই তাহলেও আমাদের ভেতর থেকে যেন এক বাণী শোনা যায়ঃ 'অনুসন্ধান করো, শ্রেষ্ঠতর বস্তুর সন্ধান পাবে'। তত্ত্বানুসন্ধানের প্রতি পদক্ষেপেই আমরা শুনতে পাইঃ এমন কিছু আছে যা চিরস্থায়ী, যা অবিনশ্বর। না হলে অমরত্বের প্রশ্ন কোনদিনই উঠতো না। অমরত্বের প্রতি প্রবল আকর্ষণ আমাদের স্থির থাকতে দেয় না। নিজেকে মৃত কল্পনা করার চেষ্টা করো—কিছুতেই পারবে না। তুমি চিন্তা করতে পারো যে, তোমার দেহ মৃতাবস্থায় পড়ে আছে, কিন্তু তুমি পাশে দাঁড়িয়ে আছো, দেহটাকে, তবুও তখন অস্তিত্বহীন ভাবতে পারবে না কোনমতে, কাজেই তোমার অস্তিত্ব না থাকাও সম্ভব নয়। মৃত্যুর ধারণা কিংবা তোমার অস্তিত্বলোপের ধারণা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, তুমি সেই অবস্থার কথা জানো, কাজেই তুমি তা হ'তে পারো না। যদি আমাদের সমস্ত প্রকৃতির ভিতর দিয়ে অনন্তজীবনের প্রমাণ না পাওয়া যেতো তাহলে কি সেই ধারণা এ'সব ক'রে পুষ্ট হ'তে পারতো? সেই ধারণা আমাদের মজ্জায় মজ্জায় মিশে আছে ও যতক্ষণ না তাকে পাচ্ছি ততক্ষণ আমাদের অনুসন্ধানের শেষ হবে না। যাঁরা কল্পনা করছেন যে আত্মা ও দেহ দুই-ই থাকবে, অনন্তকাল ধ'রে তাঁরা অবশ্য ভুল করছেন। সমস্ত জিনিসের অণুগুলি (শক্তিকণা) থাকবেই, কারণ তারা অবিনশ্বর, কিন্তু সূক্ষ্মশরীর নশ্বর। সূক্ষ্মতম ইথারযুক্ত আকারও কোষযুক্ত, তাই পার্থিব। আমাদের সত্তার তাহলে অমরজ্যোতি কোথায়? দেহ, মন, বুদ্ধি ও বোধির মধ্যে অনুসন্ধান ক'রে বৈদিকযুগের চিন্তাশীলরা জানিয়েছেন—আত্মাই অমর। আত্মা অতিসূক্ষ্ম সত্তাশীল এক গ্রাহিকাশক্তিবিশেষ এবং তা আমাদের চেতনাসত্তার উৎস। সেই উৎসই অমর। তাই হ'ল অপরিবর্তনীয় শাশ্বত শুদ্ধ আত্মা, যা জীবাত্মা হতে বাহ্যত পৃথক, কিন্তু তত্ত্বত এক ও তার অনুভাবক। এ'টি ঠিক আমিত্ব নয়, কিন্তু এটি সেই সত্তা যার সাহায্যে আমিত্ববোধকে আমরা উপলব্ধি করি, আর

৩। এঁদের বলা হ'ত চার্বাক। চার্বাকেরা বৃহস্পতির মতাবলম্বী।

সেজন্যই আমরা বলি : 'আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি', 'আমি শুনছি' ইত্যাদি। জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে—কি ক'রে এর অস্তিত্ব জানা যায়? জানার জন্য কিন্তু বাইরে খুঁজতে হয় না, কেননা আত্মা বা আত্মচৈতন্য সবার অন্তরেই অধিষ্ঠিত। মস্তিষ্ক সম্বন্ধে কে সচেতন থাকে? কেউই থাকে না। নিজেকে মস্তিষ্কের অংশবিশেষ ব'লে কেউ জানে না। জড়কে কে জানে? চৈতন্যের উৎস যদি জড়েরও উৎস হয় তো জড়কে জানবে কে? জড় নিজেকে জানে না। জড়বাদীরা দেহকেই বলতো আত্মা, ইন্দ্রিয়প্রত্যয়ের বাইরে কোন-কিছুকে তাই মানতো না। তবে আস্তিক্যবাদী চার্বাকদের মধ্যেও অস্তিত্বের কথা পাওয়া যায়।

আধুনিক বিজ্ঞান প্রাতিভাসিক জগৎকে তিনটি অবস্থার সংমিশ্রণ বলেছে। সেই তিনটি উপাদান হ'ল—জড়, শক্তি ও চৈতন্য। এই তিনটিই বিশ্বপ্রকৃতির প্রধান উপাদান। জগতের যেকোন দর্শন বা বিজ্ঞান অধ্যয়ন করলে এই তিনটিকে পাওয়া যায়। জড় ও শক্তি বা তেজ পরস্পর-অবিচ্ছেদ্য। আসলে তারা একই পদার্থের দুটি দিক অবস্থামাত্র। তৃতীয়টি হ'ল চৈতন্য। বেশীর ভাগ বাস্তববাদী চৈতন্যকে জড় ও শক্তির কোঠা থেকে বাদ দিতে চায়। আবার অনেকে আদর্শবাদী মন ও চৈতন্য হ'তে জড়কে রাখতে চেয়েছেন দূরে। একজন খ্রীষ্টান বৈজ্ঞানিক বলেন, জড়ের কোন অস্তিত্বই নেই, সমস্তই মনের রাজ্য, সমস্তই চৈতন্য। কিন্তু তাঁদের প্রশ্ন করা হোক যে, সত্যকারভাবে মনই বা কি, আর জড় বলতেই বা কি বোঝায়? তাঁরা উত্তরে হয়তো বলবেন তাঁরা তা জানেন না। বাস্তবিক পক্ষে এই তিনটিই অবিচ্ছেদ্য, বিকারহীন এবং চিরন্তন। আবার প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তৃতীয় পদার্থের প্রকৃতি কি? জড়শক্তি যদি অবিনশ্বর হয় তো চৈতন্যের পরিণতি কি? চৈতন্য কি জড় ও শক্তি হ'তে উৎপন্ন? বাস্তববাদীরা একথাই বলেছেন, কিন্তু তা কি একেবারেই অবান্তর নয়? জড়-সম্বন্ধে যখন কিছু ধারণা হয় তখন সেটা ঘটে চৈতন্যাবস্থায়। আবার শক্তিকে যখন ধারণায় আনা যাবে তখন সেটা হবে তার বাস্তব রূপ। কাজেই উভয়েই অবিচ্ছেদ্য ও বিকাররহিত। চৈতন্যের দুটি অবস্থাই যখন ক্ষীয়মান তখন চৈতন্যের নিজস্ব প্রকৃতিটি কি? তা কি ধ্বংসানুগামী। যে গাছের ফলের ক্ষয় নেই সেই গাছের কি ক্ষয় থাকতে পারে বলে মনে হয়? তেমনি ঐ দু'টিও চৈতন্যের পরিণতি। চৈতন্যের অবস্থাবিশেষের যদি ক্ষয় না থাকে তো চৈতন্যও ক্ষয়হীন অবিনশ্বরই হবে। চেতনাহীন হ'লে আমরা জড়ের অস্তিত্ব জানতেও পারতাম না। একজন বৈজ্ঞানিককে অজ্ঞান ক'রে তারপর যদি তাকে প্রশ্ন

করা হয় যে, তার সেই-অবস্থায় জড়সম্বন্ধে চেতনা ছিল কি-না। কিন্তু সে সেই কথা কিছুতেই বলতে পারবে না, কেননা সে তখন ছিল চেতনাহীন—অচেতন। অনুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে অণুকে দেখা যায় বিভিন্ন ভাগে। এখন আবার তা থেকে অনুকে ভাগ করা হয়েছে ইলেকট্রনে বা আইয়নে। তারা যদি অবিকৃত ও অবিনশ্বর হয় তাহলে তাদের অন্য অবস্থাগুলিও তাই হবে। তারপর তাদের যদি জ্ঞাতা কেউ থাকে তো তা কে? জড়পদার্থ কোন-কিছু জানতে পারে না, সুতরাং তা জ্ঞাতা নয়। তবে কি শক্তি জ্ঞাতা? তাও নয়। তাই আসলে জ্ঞাতা হলেন আত্মা—যিনি আমাদের আন্তরসত্তা, অত্যন্ত নিকটবর্তী—আমাদের অন্তরতম।

মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। আসতে পারে মনে ক্রোধ, উদয় হ'তে পারে অন্য রিপুর, অপর কোন ইচ্ছা বা কামনা জাগ্‌তে পারে, শরীরের চিন্তা আস্‌তে পারে, নিজেকে দুষ্ট কিংবা ধর্মপরায়ণ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এই সমস্ত জানা বা জ্ঞান একই চৈতন্যের রূপভেদমাত্র। ব্যক্তিত্ববোধের ভিত্তি চেতনাসত্তা বা চৈতন্য। সে'টি আসলে পটভূমিকা—যার ওপর ভগবদ্‌হাতের রূপরেখায় ফুটে ওঠে ব্যক্তিত্বের ছবি। এই ছবিকে বদলানো যায়, মোছা যায়, কিন্তু তার পটভূমিকাটিকে মোছা যায় না। আমাদের চিন্ময় শাশ্বত আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারি—ক্ষণিক সুখের চেয়ে যার অনুভূতির আনন্দ চিরস্থায়ী

পুঁথি-পুস্তক সেই সত্যকে স্পর্শ করতে পারেনি। প্রামাণিক গ্রন্থ ও তাদের ভাষ্য-টীকা পড়ে এই পরমসত্যকে লাভ করা যায় না। আমাদের সেই অমরস্বভাব আত্মাকে চিন্তা, কিংবা পার্থিব কাজ বা সাধন-ভজনের সাহায্যেও উপলব্ধি করা যায় না। তাকে জানতে হলে বিচারসহ অনুসন্ধান করতে হবে। চৈতন্যকে তার জড়-আবরণ হতে মুক্ত করো, নিজের প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করো দেখো তোমার মধ্যে কোন্ অংশ অপরিবর্তনশীল ও সাক্ষীস্বরূপ, দেখো দেহ, ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও বোধির জ্ঞাতা কে, দ্রষ্টা কে? আমাকে উপলব্ধি করো, হৃদয়গুহায় লুকায়িত 'গহ্বরেষ্ঠং বরেণ্যং' আত্মাকে খুঁজে দেখো। রাজযোগের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে ধ্যান ও বেদান্তের নিদিধ্যাসনের ভিতর দিয়ে নির্বিকল্প সমাধিতে প্রবেশ করলে দেখবে তুমি মুক্ত, তুমি মন হতে ভিন্ন, দেহ হতে ভিন্ন, সকল ইন্দ্রিয় হতে নির্মুক্ত। যথার্থই তুমি দেহাতীত, মনের অতীত এবং মরণেরও অতীত। আত্মার জ্ঞান হ'লে মৃত্যু তোমাকে স্পর্শ করতেও পারবে না, মৃত্যুভয় তোমার লোপ পাবে চিরতরে—তখন তুমি জানবে 'অগ্নি তোমাকে দাহ

করতে পারবে না, জল তোমাকে সিক্ত করতে পারবে না, বায়ু তোমাকে শুষ্ক করতে পারবে না, কোন অস্ত্রই তোমাকে বিদ্ধ ও খণ্ডিত করতে পারবে না, আসলে তুমি অমর অপরিবর্তনশীল, অনন্ত চিরন্তন'।[৪] তোমার কি ভয় থাকতে পারে? মৃত্যুভয়ের লেশও থাকবে না। স্বার্থপরতা ও অজ্ঞানতাই সমস্ত ভয়ের কারণ। সমস্ত অজ্ঞানতা বিনষ্ট হলে স্বর্গীয় দীপ্তির হবে প্রকাশ, স্বয়ংপ্রকাশ চৈতন্যলোকের বা প্রদীপ্ত জ্ঞানসূর্য মনের দিগন্তে বর্ষণ করবে তার কিরণসুধা, সেখানে তুমি দেখতে পাবে জ্যোতির্ময় আত্মাকে। শাশ্বত সত্য ও ঈশ্বরের দর্শন মিলবে সেই অমরলোকে, দেখবে তুমি সেখানে কি অমরত্ব। উপলব্ধিই হ'ল তাদের চরমলক্ষ্য। কিন্তু তাকে পাওয়া যাবে কেমন করে? নিজের সৎ-চিৎ-আনন্দময় স্বভাবকে উপলব্ধি দ্বারাই তাঁকে জানা যাবে। 'জানা মানেই হওয়া'। নিজেকে যখন জান্‌বে অমর ব'লে তখনই হবে অমর। কিন্তু যখনই নিজেকে দেখবে সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমায়িত ক'রে তখনই তোমার মৃত্যু অনিবার্য। আমাদের সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান এক শুদ্ধচৈতন্যের বিভিন্ন বিকাশ, সুতরাং সেই বিকাশ বা অবস্থাকে রূপান্তরিত করলেই তুমি হবে চিরজীবি, কেননা তুমি নিজে আত্মস্বভাব ও পরিবর্তনের অতীত। যে-কোন প্রকার পরিবর্তনই হোক বা কেন, তা তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। পরিবর্তন আসলে মিথ্যা, অসত্য, কিন্তু তুমি সত্য, শাশ্বত ও অমর।

ঈশ্বরকে যখন জানা যাবে তখন সব-কিছুই জানা যাবে। ঈশ্বরকে 'জানা' মানেই ঈশ্বরের অভিন্নসত্তায় নিজে পর্যবসিত হওয়া—'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি'। সাধক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলে ব্রহ্মই হয়ে যান—ব্রহ্মস্বরূপই প্রাপ্ত হন। তবে ঈশ্বর যখন আমাদের মতো মরণশীলের জানার বস্তু হন তখন আবার তাঁর ঈশ্বরত্ব থাকে না।[৫] কিন্তু যদি আমরা ঈশ্বরকে জানতে চাই তো আমাদের

৪। নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যং সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥
= গীতা ২।২৩-২৪।

৫। এখানে মনে রাখতে হবে যে, মায়ার অধীশ্বর ঈশ্বর (সগুণ-ব্রহ্ম) ও মায়ার অতীত ঈশ্বর (নির্গুণ-ব্রহ্ম) স্বরূপত এক হলেও পার্থিব দৃষ্টিতে তাঁরা আলাদা। ঈশ্বর যখন আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অধীন অর্থাৎ বিষয় হন তখন তিনি মায়ার এলাকায় এসে পড়েন, ঈশ্বরত্বের পদবীতে আর অধিষ্ঠিত থাকেন না। আসলে ঈশ্বরও তে সীমাবদ্ধ মায়ার গণ্ডীর মধ্যে

যথার্থ আত্মাস্বরূপকে আগে জানতে হবে। সেই আত্মা অমর, অপার্থিব, অনন্ত এবং চিরদিন এক ও অদ্বিতীয়। সে আত্মার জন্ম নেই, সুতরাং মৃত্যু নেই। আরম্ভ নেই, সুতরাং শেষ নেই। সেই আত্মা সনাতন অবিনশ্বর, অনন্ত ও কূটস্থ বা চিরস্থির ও প্রশান্ত।

মায়ার অধীশ্বর হলেও মায়াসম্পর্ক থেকে একেবারে তিনি মুক্ত নন। ব্রহ্মকে জানা বা ব্রহ্মের জ্ঞান হওয়া মানে মায়ার অতীত ব্রহ্ম যে আমাদের মায়িক ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অধীন বা বিষয় হন তা নয়, তবে ব্রহ্মকে জানার অর্থই হ'ল মায়ার বা পার্থিব সকল সম্পর্কের শুদ্ধ-চৈতন্যরূপে আমাদের প্রতিষ্ঠিত হওয়া, দেশ-কাল-নিমিত্তের বাইরে—মন ও বুদ্ধির ওপারে শুদ্ধজ্ঞানের রাজ্যে উপনীত হওয়া। তাই ব্রহ্মকে জানা অর্থে শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ হওয়া।

দশম অধ্যায়

॥ পরলোকতত্ত্ব বা প্রেততত্ত্ব ॥

আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি যে, মৃত্যুর পর কি হয়—এই প্রশ্ন আমাদের মনে সর্বদা জাগে। এই প্রশ্ন আজ উঠেছে, আগেও উঠেছে এবং সর্বদাই সকলের মনে তার উদয় হবে। এই একই প্রশ্ন জেগেছে ভিক্ষুকের মনে, জেগেছে সম্রাটের মনে। মুনি, ঋষি, ধর্মাচারী, দার্শনিক, চিন্তাশীল সকল দেশের সকল লোকের মনে জেগেছে এই একই প্রশ্ন। আজ আমরা তার আলোচনা করছি একটা মন নিয়ে, কাল আবার এই প্রশ্নই উঠবে অন্য মনে। বর্তমানের জন্য আমরা ভুলতে পারি এই প্রশ্ন, এই রক্তমাংসের দেহের মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থার প্রতিও মনোযোগ দিতে মুহূর্তের জন্য ভুলেও যেতে পারি, কিন্তু একটা সময় নিশ্চয়ই আসবে যখন আমরা হবো জাগ্রত, আমাদের মনে উদয় হবে সেই জিজ্ঞাসা। জীবন-সংগ্রামের মাঝে, দৈনন্দিন কর্ম-ব্যস্ততার চাপে, প্রতিদিন দুঃখ-কষ্টের গ্লানি ও অবসাদে ভারাক্রান্ত হয়ে আমরা ভুলে থাকতে পারি সেই প্রশ্নকে, আমরা ভুলে থাক্‌তে পারি মরণের পরেও আমাদের বাঁচতে হবে ও কি ঘট্‌বে তার পরে, কিন্তু চোখের ওপর যখন দেখি কাউকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে, দেখি—যে ছিল পরমাত্মীয়, যে ছিল অতি নিকটের জন ও অতীব প্রিয়জন, সেও চলে যায় অজানার দেশে দেহটাকে ফেলে দিয়ে, তখন আমরা একটু থামি ও ভাবি, আর রহস্যময় পরলোক সম্বন্ধীয় প্রশ্নের হয় তখন সূত্রপাত। তখনই চিন্তা করি যে, কোথায় গেল সে? কি হ'ল দেহের পরিণতি? আত্মার অভাবে দেহ আরম্ভ করে পচ্‌তে, আর তখনই আমাদের মনে জাগে যে, কি এর মধ্যে ছিল—যা বাঁচিয়ে রেখেছিলো একে? কোথায়ই বা তা গেল? বারবার এই প্রশ্নই জাগতে থাকে, ক্ষুণ্ণ করে মনের শান্তিকে। সত্যিকারের মীমাংসা না হওয়া-পর্যন্ত সে নষ্টশান্তিকে আর করা যায় না পুনঃপ্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু সেই সমস্যার সমাধানের আগে আবিষ্কার করতে হবে আমাদের আন্তর-দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মধ্য দিয়ে প্রবেশপথটিকে। সে প্রাচীরকে ভাঙ্গা প্রায় অসম্ভব। দুর্বল বুদ্ধিশক্তিও পায় না সেই প্রবেশপথের সন্ধান। দুর্বল মনও তার সীমায়িত প্রয়াস নিয়ে সেই প্রাচীর হ'তে পারে না উত্তীর্ণ। কিন্তু সে

প্রাচীরটি কি? সেটি আর কিছুই নয়, সেটি আমাদের ভ্রান্তবিশ্বাস যে, দেহই আত্মার স্রষ্টা, স্থূল-জড়শরীরের ক্রিয়ার একটি পরিণতি-বিশেষই আত্মা। প্রতিটি বিদেহী আত্মাই মরণের পরে কবরস্থান থেকে উত্থিত হবে ও নির্দিষ্ট সময়ে ব্যক্তিবিশেষের মুক্তি হবে। সাধারণের এটাই বিশ্বাস, কিন্তু আবেদন জানায় না ঐ সমস্ত অন্ধবিশ্বাস আমাদের মনে, কেননা নির্বোধোচিত ধারণায় আস্থাবান হবার অবস্থা পার হয়ে এসেছি আমরা। আমরা এখন যথার্থ প্রমাণ পেতে চাই এবং বিষয়টি নিয়ে মনোবিজ্ঞান, দর্শন ও বিজ্ঞানসম্মতভাবেই আলোচনা করতে চাই। এবার দেখা যাক 'দেহ আত্মার উৎপাদক' এই তথ্য কতদূর সত্য।

আত্মার সত্তা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছে তিনটি দৃষ্টিভঙ্গী বা অভিমত: (১) উৎপাদন বা অভিব্যক্তি[১], (২) সংযোগ[২] ও (৩) সঞ্চারবাদ[৩]। নিরশ্বরবাদী,[৪] অজ্ঞেয়বাদী[৫], বাস্তববাদী এবং ক্রমবিকাশবাদী চিন্তাশীলদের কাছ থেকে পাওয়া যায় সৃষ্টি বা উৎপাদন ও বিকাশবাদের ব্যাখ্যা। তাঁদের বিশ্বাস যে, দেহ আত্মার স্রষ্টা, কিন্তু এই যে আত্মা তাঁকে তাঁরা বুদ্ধির সমষ্টি বা চিন্তার সমষ্টি যাই বলুন না কেন, সেটি দেহ হতে কেমন করে সৃষ্টি হতে পারে? তার কোন সদুত্তর তাঁরা দিতে পারেন না। বাস্তববাদীরা বলবে যে, দেহ হতেই দেহের উৎপত্তি, অর্থাৎ মাতাপিতার শরীর থেকেই সন্তানের শরীর গঠিত হয়। কিন্তু কি সেই শক্তি—যে শক্তি দেহের অণুগুলিকে ও জড় উপাদানগুলি সংহত বা সংঘবদ্ধ ক'রে রাখে, তাদের সংগ্রথিত করে গড়ে তোলে আমাদের দেহের বিশেষ রূপটি, অথচ আমাদের থেকে তা ভিন্ন? কে সেই পার্থক্যকে সৃষ্টি করলো? এই সব প্রশ্নের কোনটিরই তাঁরা উত্তর দেন না। তাঁরা বলেন—এটি আমাদের অজানা এক রহস্য, আর মাতাপিতার দেহ হ'তে সন্তানের দেহের সৃষ্টি এ'কথাই সত্য কিন্তু মাতাপিতার দেহের উৎপত্তি আবার হল কোথা থেকে? তাঁরা বলবেন তাঁদের মাতাপিতা হতে। কিন্তু এটিই কি হল তার যথাযথ উত্তর? মোটেই নয়। বরং এ' সবের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতে গিয়ে তাঁরা আরো কতকগুলি জটিল সংবদ্ধ জড়পদার্থের উদাহরণ দেন যেগুলির সংবদ্ধতার কারণ যে শক্তি তার কোন বিবরণ তাঁরা দিতে পারেন না।

১। প্রোডক্‌শন-থিওরি। ২। কম্বিনেশন-থিওরি। ৩। ট্রান্সমিশন-থিওরি। ৪। এথিষ্ট
৫। এ্যাগনষ্টিক।

তাঁরা তাঁদের স্বপক্ষে একটি সিদ্ধান্ত স্থির ক'রে নিয়েছেন, কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত তাঁদের নিয়ে যাচ্ছে ভ্রান্তি বা ভ্রমের মধ্যে। দেহ হ'তে দেহের উৎপত্তি—দেহের বিকাশের পক্ষে এইটিই কিন্তু সত্য কারণ নয়। এটি যেন কার্য থেকে কারণকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা—যেমন ঘোড়ার সামনে গাড়ী জুড়ে দেওয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণ উল্টো ব্যাখ্যা। এই সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করতে পারি না। আমরা দেখছি যে, একই সময়ে মনস্তাত্ত্বিক, চিকিৎসক ও রোগতাত্ত্বিকদের মধ্যেও পাওয়া যায় এই বিশ্বাস যে, দেহ হ'তে আত্মার সৃষ্টি হয়েছে এবং আত্মা হ'ল চিন্তা, বুদ্ধি ও চেতনার সমষ্টি, অর্থাৎ এক কথায় যাকে তাঁরা 'আত্মা' বলেছেন আমরা তাকেই বলি 'মন'। কয়েকজন আবার এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছেন যাঁরা মস্তিষ্কের স্থানবিশেষকে নির্দিষ্ট করেছেন মনের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার সৃষ্টি-উৎসরূপে। ধরা যাক্ যে, যখন আমরা কোন জিনিস আমাদের সামনে দেখি তখন আমাদের মস্তিষ্কের অংশবিশেষে জাগে তার সংবেদন। যখন কোন শব্দ শুনি তখন কম্পনের হয় সৃষ্টি আমাদের শ্রবণমণ্ডলে। উৎপাদন বা অভিব্যক্তিবাদে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা বলেন, মন মস্তিষ্কের সক্রিয়তার সমস্থানীয়। স্নায়ুতন্ত্রের অবস্থা থেকে তাঁরা প্রমাণ করতে চান যে, যতক্ষণ মস্তিষ্ক থাকে সক্রিয় ততক্ষণই মনের সত্তা থাকে, মস্তিষ্কের ক্রিয়া বন্ধ হ'লেই মনের মৃত্যু। মস্তিষ্কের কার্য-নিরপেক্ষ হয়ে মন কখনোই থাকতে পারে না। তাঁদের অভিমত হ'ল—আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে আসে যত-কিছুর সংস্কার আর গৃহীত হয় মস্তিষ্কের মধ্যে, তারা রূপান্তরিত হয় ধারণায়, চিন্তায়, আবেগে, অনুভূতিতে, সংবেদনে ও পরে প্রকাশিত হয় মুখের বা বাক্যের অভিব্যক্তিতে—খাদ্যবস্তু যেমন পাকস্থলিতে যাওয়া-মাত্র হয় রূপান্তরিত এবং পাকস্থলির সক্রিয়তায় পরিপাকক্রিয়ার সাথে সাথে নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হ'তে থাকে, যেমন লিভার (যকৃৎযন্ত্রটি) রস সিঞ্চন করে খাদ্য-পরিপাকের সহায়তা করতে এবং মস্তিষ্ক দান করে তার চিন্তা, বুদ্ধি ও চৈতন্য সকল-কিছু সংস্কারের গ্রহণ করার সময়ে। এই হ'ল তাঁদের যুক্তি। তাঁদের মতে, শরীরের উপাদানের মতো সূক্ষ্মসংস্কারও জড়বস্তুবিশেষ; স্নায়ুতন্ত্রের ভিতর দিয়ে মস্তিষ্কের আধারে তারা স্তূপীকৃত হয় ও সাথে সাথে পরিণত হ'তে থাকে বুদ্ধি ও মেধাশক্তিতে।

কিন্তু মস্তিষ্ককে যথার্থভাবে পরীক্ষা করলে দেখতে পাই যে, মানুষ বেঁচে

থাকে ও নিজের কাজ করে যেতে পারে তার মস্তিষ্কের অর্ধেক অংশ নষ্ট হ'য়ে গেলেও। এ'রকম ঘটনার নানা নজিরই পাওয়া যায়। নিউ ইয়র্কে ডাঃ টমসন নামে একজন শল্য-চিকিৎসক ছিলেন, তিনি রুজভেল্ট হাসপাতালের একজন সচীবও বটে। তিনি একটি বইও লিখেছেন, তাতে শব-ব্যবচ্ছেদের পর সংগৃহীত বহু প্রমাণপঞ্জী ও তাদের সংখ্যানির্ণয়ের উল্লেখ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন: একটি লোকের মস্তিষ্কের অর্ধাংশ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেলেও সে জানতে পারে না কখন তা নষ্ট হ'য়ে গেছে। তাছাড়া মস্তিষ্কের অর্ধেক অংশ নষ্ট হলেও তার জীবনের কোন ধারাতেই কোন পরিবর্তন দেখা দেয়নি, বরং তার চিন্তা, তার সকল কাজই ছিল সমান অব্যাহত। সে তার মস্তিষ্কের অর্ধাংশকে কাজে লাগায়, আর সেটিই ছিল খুব ভালো অবস্থায়, সেই অর্ধাংশের সাহায্যেই সে পুরোপুরি মস্তিষ্কের কাজ চালিয়ে নিতে পেরেছিল।

যারা ডানহাতকে বেশী ব্যবহার করে তাদের বাক্‌মণ্ডল গঠিত হয় মস্তিষ্কের বামদিকে। আধুনিক বিজ্ঞানীদের দ্বারা এই একটি বড় সত্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। হস্ত-চালনার ওপরই বাক্‌মণ্ডল সর্বতোভাবে নির্ভর করে। আবার যারা বামহাত বেশী ব্যবহার করে তাদের বাক্‌মণ্ডল গঠিত হয় মস্তিষ্কের ডানদিকে, ডানহাত ব্যবহার করলে তা হবে বামদিকে তা আগেই বলেছি।

মস্তিষ্কের অর্ধেকটা যদি কারো নষ্ট হয় বা পড়ে যায়, যদি ডানহাত চালনকারীর বামদিকটা পড়ে (অবশ হয়ে) যায় তাহলে সে সম্পূর্ণ বাক্‌শক্তিহীন ও একেবারে বোবা হয়। কিন্তু যদি সেই বামহাতটি আবার ব্যবহার করতে থাকে, অর্থাৎ বামহাতের চালনা করে তাহলে কয়েকদিনে বা কয়েক সপ্তাহে সে তার মস্তিষ্কের ডানদিকে বাক্‌মণ্ডলের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। সে যথাযথভাবে তার কথাবার্তা চালাতেও পারে। এ' প্রকার ঘটনা বহুভাবে পরীক্ষিত এবং প্রমাণিত সত্য।

এখন এগুলি থেকে কি প্রমাণ হয়? প্রমাণ হয় যে, মন মস্তিষ্ক হ'তে ভিন্ন কোন বস্তু, মস্তিষ্ক একটি যন্ত্রবিশেষ—যাকে ব্যবহার্য ক'রে তোলে বা কাজে লাগায় আত্মা, মন কিংবা অন্য-কিছু বস্তু যাই বলনা কেন। তাকে আমরা ব্যক্তিত্বও (পারসোনালিটি) বলতে পারি। 'ব্যক্তিত্ব' মস্তিষ্কক্রিয়া হ'তে উৎপন্ন নয়, বরং ব্যক্তিত্ব একটি সত্তাবিশেষ—যা বাইরে থেকে ঐ মস্তিষ্কযন্ত্রটিকে

ব্যবহার করে। মস্তিষ্ককে আমরা পিয়ানো-বাদ্যযন্ত্রের সাথে তুলনা করতে পারি। পিয়ানো সংগীতকে রূপায়িত করে—যে সংগীত থাকে সংগীতশিল্পীর মনে, পিয়ানোয় কখনো কোন সংগীত থাকে না। সংগীতশিল্পীর সচেতন মনে সংগীতের সৃষ্টি হয়, বাইরে থেকে পিয়ানোর ঘাটে ঘাটে হাত চালিয়ে শিল্পী সেই সংগীতকে মূর্ত ক'রে তোলে। আমাদের যাবতীয় কর্মের মধ্যে এবং আমাদের দেহ ও মনের সুসংমিশ্রিত ক্রিয়ার রয়েছে সংগীত, তাই সংগীতের সুর বা সুরের উৎস অন্তর্নিহিত থাকে মনে।

আত্মাই মস্তিষ্কের বাইরে থেকে চালনা করছে তার স্নায়ুকেন্দ্রের কোষগুলিকে। মস্তিষ্ক যেন একটি অদৃশ্য শক্তি ও সত্তার প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে আছে সেই শক্তি সত্তাই তাকে পরিচালিত ক'রে সৃষ্টি করছে সুরসংগতি তথা সংগীত। যদি তার মধ্যে সুরসংগতি (হার্‌মনি) না থাকে তো আমাদের মধ্যে ফুটে ওঠে বৈষম্য (ডিস্‌কর্ড)। কাজেই উৎপাদননীতি বা অভিব্যক্তিবাদ সম্পূর্ণ অবান্তর বলেই আজ প্রতীয়মান হতে চলেছে। বিজ্ঞানী ও চিন্তাশীল যাঁরা,—যাঁরা জগতের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকদের পরীক্ষায় উদ্‌ভাবিত বিবরণগুলি অধ্যায়ন করেছেন, তাঁরা কেউই বিশ্বাস করবেন না যে, লিভার বা যকৃত যেমন পিত্তরস নিঃসরণ করে হজমের জন্য, তেমনি মস্তিষ্ক চৈতন্য-পদার্থেরও সৃষ্টি করে। এই মতবাদ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

সংযোগবাদে (কম্বিনেশন-থিওরি) বলা হয়েছে, স্নায়বীয় স্রোতই চেতনাস্রোত উৎপন্ন করে। উভয় স্রোতের মধ্যে আছে একটি সংযোগ ও তারা সমবেতভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। স্কুল ও কলেজ যে মনস্তত্ত্বের বই পড়ানো হয় সেগুলির কোন-কোনটিতে বলা হয়েছে—চৈতন্য উৎপন্ন হয়েছে ইন্দ্রিয় থেকে, চৈতন্য ইন্দ্রিয়ানুভূতিরই একটি জটিল প্রবাহবিশেষ, আর এই প্রবাহ স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে—গ্যাংলিয়ার ও সুষুম্নার মধ্য দিয়ে যখন বয়ে যায় তখন সুষুম্নার আচ্ছাদনে বা আবরণস্তরে তা হয় প্রতিহত, ফলে তা থেকে উৎপন্ন হয় একপ্রকার গাঢ়পদার্থ। এই পদার্থটি হ'ল তাপবাহ এবং এটিকেই বলা হয় চৈতন্য। কিন্তু এ' ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, কেননা জড়পদার্থ থেকে কখনও তেজোময় চৈতন্যের সৃষ্টি হ'তে পারে না।

এর চেয়ে ভালো ও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া সঞ্চারণবাদে। এতে বলা হয়েছে, আত্মা বা মন মস্তিষ্কের বহিভূ ত পদার্থ, মস্তিষ্কজাত নয়। তা হ'ল আত্মচৈতন্যরূপ এক সত্তা—যা বাইরে থেকে চালনা করে

মস্তিষ্ককে,—যেমন বাদক বাইরে থেকে চাবির ওপর হাত চালিয়ে পিয়ানোতে সৃষ্টি করে সংগীতের। এই সত্য প্রেততাত্ত্বিক, ধর্মবাদী, অধ্যাত্মবাদী ও দার্শনিক সকলেই জানেন। তাঁরা আত্মার প্রকৃত রূপ ও দেহের সংগে তার সম্পর্ক কি তা জানেন। যাঁরা এই সঞ্চারণবাদে বিশ্বাস করেন না তাঁরা মোটেই ব্যাখ্যা করতে পারেন না যে, কেমন ক'রে এইসব প্রেততাত্ত্বিক ঘটনা আমেরিকা, য়ুরোপ ও অন্যান্য দেশের 'সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটি'-তে (প্রেততত্ত্বানুশীলন-সমিতিতে) লিপিবদ্ধ থাকে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক—তুমি বিশ্রামের উদ্দেশ্যে একটি নির্জন ঘরে দোলন-চেয়ারে বসে আছ, তোমার মন ডুবে আছে ব্যবসা-সংক্রান্ত জটিল বিষয়ে, তুমি ভেবে উঠতে পারছ না কিভাবে সেই সমস্যার সমাধান হবে। মনে করো—ঘরে এমন কেউ নেই যে,তোমাকে বিরক্ত করতে পারে বা কোনোভাবে তোমার চিন্তার ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। তোমার দরজা বন্ধ। এমন সময় হঠাৎ তোমার আর একটি কায়াকে দেখতে পেলে—তোমার দেহ হতেই যেন সে রূপ নিল, লেখার টেবিলে গিয়ে পেন্সিল ও এক টুকরো কাগজ নিয়ে তোমার সমস্যার সমাধান লিখতে লাগলো। তোমার যেন স্বপ্নাবস্থা চলছিল, হঠাৎ তুমি জেগে উঠলে এবং টেবিলের কাছে গিয়ে তোমার উত্তরটি পেলে। তুমি তোমার দ্বিতীয় রূপটিকে (ডবল) মনে করতে পারবে, কিন্তু সেটা কি তা বুঝতে পারবে না কিছুতেই। এ'রকম বহু ঘটনা ঘটেছে। এখন এর কি ব্যাখ্যা তুমি করবে ? কে সেই কাজ করেছে ? অন্য কোন লোক কি তোমার মতো বায়বীয় রূপ নিয়ে বাইরে থেকে এসেছিল ? এখন যদি বুদ্ধি বা বুদ্ধিমান (চৈতন্যময়) এক সত্তাকে স্বীকার করা যায়—দেহের বাইরেও যার অস্তিত্ব থাকতে পারে তাহলেও এক সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায়। কিন্তু এই ঘটনা সঞ্চারণবাদ ছাড়া আর কিছুর দ্বারাই ব্যাখ্যা করা যায় না। এর থেকেই জানা যায় যে, দ্বিতীয়টি হ'ল ব্যক্তিবিশেষের সূক্ষ্ম বায়বীয় আত্মা (এ্যাষ্ট্রাল সেলফ্)। এই সূক্ষ্ম আত্মা জড়দেহ হতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায়ও থাকতে পারে। এই সূক্ষ্ম আত্মা দেহ হতে বহিস্কৃত হয়ে বায়বীয় রূপ নিয়ে এমন অনেক কাজ করতে পারে যা আমাদের জাগ্রত আত্মার পক্ষে করা সম্ভবপর নয়। ইন্দ্রিয়াতীত আত্মাকে অনেক সময় মৃত্যুপথযাত্রীর আত্মীয়-বন্ধুরা প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হন না।

অনেক সময়ে দেখা যায়, ছেলেমেয়েদের যত্ন নেবার কেউ না থাকার ফলে তাদের প্রতি মরণের কালে মানুষদের অতিপ্রবল এক আকর্ষণ থাকে। সন্তানদের সাহায্য করার অত্যুগ্র বাসনার দ্বারা প্ররোচিত হয়ে তারা ঐ দ্বিতীয় আকার (ডবল) ধারণ ক'রে দূরবর্তী আত্মীয়-স্বজনকে সচেতন করে। অনেক সময় ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যুর পরও এই রকম ঘটনা ঘটে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এটা ঘটে মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই, অর্থাৎ যখন আত্মা দেহ হতে নিষ্ক্রান্ত হয় সেই সময়ের বা তার মুহূর্তমাত্র আগে। উভয় ঘটনারই বহু প্রমাণপঞ্জী আছে। যদি সঞ্চারণবাদকে অস্বীকার করা হয় তাহলে এদের কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়! আত্মা যদি মস্তিষ্কের ক্রিয়ার উৎপাদনই হয় তো সব-কিছুই শেষ হয়ে যাবার কথা, কিন্তু তাতো হচ্ছে না। এর থেকে প্রমাণ করা যায়; ব্যক্তিত্ব, আত্মা বা চেতনসত্তা যাই বলা হোক না কেন, এ'ধরনের এমন একটি সত্তার অস্তিত্ব আছে—জড়দেহকে পেছনে ফেলে রেখে যা জীবনের পথে এগিয়ে চলে। বেদান্ত এই মতবাদকে মেনেছে। বেদান্ত বলে, জগতের অর্ধাংশ মাত্র জড়—যা হোল 'বিষয়', আর জগতের অপর অর্ধাংশ—যাকে বলা যায় 'বিষয়ী'। কোন অংশটি অপর অংশটিকে সৃষ্টি করতে পারে না, তারা শুধু অবস্থান করছে সমসাময়িকরূপে। তারা প্রারম্ভের সূত্রপাত থেকেই সমকালীন। এই হ'ল 'মন' ও 'বস্তু'। বস্তু প্রত্যক্ষের বিষয়, মন প্রত্যক্ষকারী। এই বিষয়ীবোধ না থাকলে প্রত্যক্ষকারীর পক্ষে কিছুই প্রত্যক্ষ করা সম্ভবপর নয়। কোন বস্তুর জ্ঞান আর কিছুই নয়, তা আমাদের মনের অবস্থা মাত্র ও তা চেতনার একটি স্তরবিশেষ। বস্তুচেতনা তাই বস্তু-সম্পর্কিত যে কোন সংজ্ঞা,—যে-কোন অভিজ্ঞতা বা যে-কোন সংবেদনের চেয়ে মনের স্থান আগে, আর চৈতন্যের বা শুদ্ধচৈতন্যের স্থান তারও ঊর্ধ্বে। অচৈতন্য অবস্থায় কিছুই প্রত্যক্ষ করা যায় না। অতএব দেখা যাচ্ছে—প্রত্যেক সংবেদন অল্পবিস্তর বিষয়ীভূত। আমরা যাকে বস্তুর জ্ঞান বা বস্তুগত জ্ঞান বলি তা আমাদের ব্যক্তিগত বিষয়জ্ঞান মাত্র। আমরা আমাদের মনের সম্বন্ধেই সচেতন, মনের বাইরে কোথাও কখনো যেতে পারি না। তুমি চেয়ার বা টেবিলের নিকট গেলেও তারপর অনুভব করতে পার যে, চেয়ার বা টেবিল তোমার মনের ওপর কি ক্রিয়া করে ও কি সংবেদন জাগায়।

ঐ সংবেদন আমাদের নিজেদের মনের জানার একটি অবস্থাবিশেষ ব'লে আমরা

টেবিল বা চেয়ারের মতো জড়পদার্থকেও জানি, আর তা যদি না হতো তবে আমরা তাদের জানতে পারতাম না। এখন এটা বৈজ্ঞানিক সত্য যে, গতি (ক্রিয়া) থেকে একমাত্র গতিই (ক্রিয়া) সৃষ্টি হবে, তাছাড়া আর কিছুই হবে না। কিন্তু এটা ঠিক যে, আমাদের জ্ঞান বা বুদ্ধি ঠিক গতি নয়। সত্যই কি আমরা তাদের গতি ব'লে প্রমাণ করতে পারি ? না, কোনদিনই পারিনি, কেননা তারা এমন-কিছু জিনিস যা অন্তত গতি নয়। বরং একে গতির বোদ্ধা ও জ্ঞাতা বলা যায়। তাহলেই কথা হ'ল যে, যে গতি নিজেই তার স্বরূপকে জানে না তা কেমন ক'রে অপর কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে। জড়বাদের বিরুদ্ধে এটাই একটা বড় প্রমাণ। সুতরাং যদি বলি যে, আত্মা মস্তিষ্কের ক্রিয়ার ফলবিশেষ, যা বুদ্ধিসত্তা মস্তিষ্কক্রিয়ার পরিণতি তবে তা সম্ভাবনার অবতারণা ছাড়া আর কি হবে ?

এখন মনের প্রাধান্য দিয়ে যখন তুমি হয়তো মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করলে এবং দেখলে সত্তাবান কিংবা আত্মার মতো সচেতন ব'লে কোন জিনিসেরই সন্ধান পাওয়া গেল না। তখন তুমি নিশ্চয়ই 'আত্মা'-র অস্তিত্ব স্বীকার করবে না, বলবে আত্মা বলে কোন জিনিসই নেই, আর এটি বলা মানেই তুমি আর একটা মন বা আত্মার অস্তিত্বকে মেনে নিলে ; কেননা তুমি যা জানছো মনের বা আত্মার সত্তা নেই'—তাও জানছো মন দিয়ে এবং সেই মন নিশ্চয়ই আর একটা ভিন্ন জিনিস ; অর্থাৎ সেই মন মস্তিষ্ককে যে অস্ত্রোপচার করছে তার মন। সুতরাং প্রত্যেকটি দৃষ্টান্তেই দেখা যায় যে, যে-কোন কল্পনাই আমরা করি না কেন, কল্পনার কর্তা হিসাবে মনের প্রাধান্যকে আমাদের স্বীকার করতেই হয়। যদি বলো যে, মনের বা আত্মার কোন অস্তিত্ব নেই, তবে সেটা হবে কেমন—যেমন এখুনি যদি বলো যে তোমার জিহ্বা নেই। আমি কথা কইছি জিহ্বা ব্যবহার ক'রে, অথচ যদি বলো যে জিহ্বা নেই, তাহলে সেটাতে অজ্ঞতার পরিচয়ই দেওয়া হবে। ঠিক তেমনি যদি তুমি চৈতন্যময় পদার্থ রূপে তোমার আত্মসত্তা অস্বীকার করো তবে সেটা অত্যন্ত অসম্ভব ও হাস্যজনক এক রসিকতাই হয়ে উঠবে, কেননা আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করছো তুমি তোমার আত্মসচেতন আত্মাকে অধিষ্ঠান ক'রে, বা আত্মাকে অববম্বন ক'রে। এখন যদি আমরা অনুধাবন করি যে, আত্মা স্বয়ংসচেতন বস্তু হিসাবে সমস্ত বাস্তব অবস্থা ও পরিবেশেরও ওপরে, অর্থাৎ তিনি এদের নিয়ন্তা এবং কোন গতির পরিণতি (ফল),

নন, তাহলে প্রশ্ন হ'তে পারে, তাহলে ঐ আত্মা তাঁর নিজের কোন সত্তা ও স্বাতন্ত্র্য রেখে চলেন কিনা? এখানেই 'সত্তাস্বাতন্ত্র্য' ও 'ব্যক্তিত্ব'—এ'দুটির ভেতর সামান্য পার্থক্য আমরা লক্ষ্য করি। কিন্তু বেশীর ভাগ লোক এ'দুটিকে পরস্পরের সংগে মিশিয়ে ফেলেন।

কতক লোক ভাবে যে, যে ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিসত্তা থাকে সেটাই সত্তাস্বাতন্ত্র্য, কিংবা সত্তাস্বাতন্ত্র্যই ব্যক্তিত্ব। কিন্তু যদি আমরা এ'দুটি শব্দের সৃষ্টি কেমন করে হল তা জানি ও সংগে সংগে তাদের আসল অর্থটা মনে রেখে দিই তাহলে আর কখনও গোলমাল হবার ভয় থাকে না। 'ব্যক্তিত্ব'—এর ইংরাজী শব্দ 'পারসোনালিটি'—সৃষ্টি হয়েছে ল্যাটিন 'পারসোনা' শব্দ থেকে এবং তার অর্থ 'মুখোস'। সুতরাং ব্যক্তিত্ব বা 'পারসোনালিটি' নির্দিষ্ট সেই জ্ঞান বা চৈতন্য যার জড়শরীরের সংগে রয়েছে সম্পর্ক। এখন ধরো তুমি মিষ্টার, মিসেস বা মিস্ (মাননীয় বা মাননীয়া) কোন একজন লোক, আর এটাই তোমার ব্যক্তিত্ব বা আত্মসত্তা। তুমি একজন কর্মক্ষম লোক, তুমি কর্মজীবি মানুষ, তোমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা কেন—সকল রকম শারীরিক বন্ধনই আছে, সেটাইআসলে 'মুখোস' (মাস্ক)—যেটা বর্তমানে কোন লোক প'রে আছে। কিন্তু সত্তাস্বাতন্ত্র্য দেহাতিরিক্ত একটিজিনিস এবং তা অবিভাজ্য কিনা তাকেভাগ করা যায় না। কাজেই যাকে ভাগ করা যায় না, তাকে কাটা বা কোন রকমে বিকৃত করাও যায় না; একে 'আমি' বা 'অহং'-ভাবনার সংগে তুলনা করা যায়। একে ভাগ করা যায় না এমন একটি প্রবাহ বলা যায়। আসলে সত্তাস্বাতন্ত্র্য অখণ্ড একটি 'অহং'-জ্ঞানের ধারা। উদাহরণ যেমন, আমি একটি স্কুলের ছাত্র ছিলাম, আমি আমার স্কুলের সাথীদের সংগে খেলা করতাম, সমস্তই জ্ঞান, স্মৃতি বা অনুভূতির ক্ষেত্রে, কিন্তু আমার সেই এক 'আমি'-ই রয়েছে। এখন হয়তো 'আমি' এখানে দাঁড়িয়ে আছি, এটাও আসলে একটি 'আমি'-রসংগে আর একটি 'আমি'-র সমীকরণ, অর্থাৎ'আমি' এখানে অধিষ্ঠান কিন্তু সত্তাস্বাতন্ত্র্য। এই স্বাতন্ত্র্য ওএকটি অবিভাজ্য। এটি আমাদের আত্মারবা চৈতন্যের উপাদান মাত্র, এর সংগে ব্যক্তিত্বের কোন সম্বন্ধ নেই। আমাদের ব্যক্তিত্ব এখানে থাকতে পারে, তার পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু 'আমি' এই চেতনারূপ যে সত্তাস্বাতন্ত্র্য তার কোনদিন পরিবর্তন হয় না, কেননা আমরা যেখানেই যাই না কন—আমাদের 'আমি'-চেতনা সর্বদাই প্রকাশ

পাবে। আমরা যেন একটি শক্তির সমষ্টি এবং সেই শক্তি সমষ্টি আত্মচৈতন্য ছাড়া অন্য-কিছু নয় এবং যখন আমাদের দেহ নষ্ট হবে তখন আত্মচৈতন্য আমাদের সংগেই থেকে যাবে, তার কোনদিনই নাশ হবে না। আমরা স্থূল সূক্ষ্ম বা কারণ যে-কোন রকম শরীরই গ্রহণ করিনা কেন, 'আমি'-জ্ঞান আমাদের সংগে সদা সর্বদাই থাকে। আমরা যখন স্বপ্ন দেখি তখনও থাকে ঐ 'আমি'-র চেতনা আমাদের ভিতরে। যখন গভীর নিদ্রা যাই তখনও থাকে চেতনা, নইলে আমরা যে সুখে ঘুমাচ্ছিলাম বা স্বপ্ন দেখছিলাম তার স্মৃতি আমাদের থাকতো না।[১] এই 'আমি'-জ্ঞান বা আমি-চেতনাকে আমরা কোনদিনই হারাতে পারিনি। এটির পৃথক সত্তা থাকেই—যতদিন না পরমোপলব্ধি বা মায়ামুক্তির পর ঈশ্বরানুভূতি আমাদের হয়। ঠিক ব্রহ্মোপলব্ধির পরই আমরা বুঝতে পারি যে, সত্তাস্বাতন্ত্র্য ও অনন্ত—যেমনটি যীশুখ্রীষ্ট বুঝেছিলেন তাঁর 'আমি'-জ্ঞানকে বা সত্তাস্বাতন্ত্র্যকে অনন্ত-রূপে। তাঁর উপলব্ধি হয়েছিল যে, স্বর্গস্থ পরমপিতা ও তাঁর মধ্যে কোন ভেদ নাই। তাঁর ব্যষ্টিসত্তাচৈতন্য তখন সমষ্টিচৈতন্যে রূপান্তরিত হয়েছিল, কেননা সত্তা-স্বাতন্ত্র্যরূপ চেতনার কোনদিনই নাশ হয় না,—চিরদিন থাকেই, তবে তার প্রসারতা যায় বেড়ে, ব্যষ্টির গণ্ডী বা সীমাবেষ্টনী যায় ভেঙে এবং সমষ্টিচেতনার হয় উদ্বোধন।

কখনও কখনও কতকগুলি আত্মা মরণের সময়ে দেহ থেকে অতিক্রান্ত হয়ে শরীরের সর্বত্রব্যাপ্ত শক্তিগুলিকে একটি কেন্দ্রে সঙ্কুচিত ক'রে নেয়। সেটি তখন পরিণত হয় যেন একটি অণুবিন্দুর মতো এবং তখনই সাময়িকভাবে ব্যক্তিত্বটার নাশ হয়। ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ও বিকৃতি আছেই, তা পার্থিব মায়ার বন্ধনেও আবদ্ধ হতে পারে। যদি কোন ব্যক্তিত্বের তথা প্রেতাত্মার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের ওপর আকর্ষণ থাকে, আর কোন রকমেই সে আকর্ষণস্বরূপ আসক্তিকে কাটিয়ে উঠতে না পারে, তবে সে তার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের আশে-পাশে ঘুরে বেড়াতে থাকে, তাদের কাছে কাছে থাকে, তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করে, তাদের ভালবাসা

১। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানী ও দার্শনিকেরাও 'অহং' বা 'আমি'-চেতনার চাক্ষুষ প্রমাণ দিতে গিয়ে এই উদাহরণই প্রায় সকলে দিয়েছেন। উপনিষদে এর ভূরি ভূরি নিদর্শ আছে।

পাবার ইচ্ছা করে এবং তা থেকেই তাঁদের ব্যক্তিত্বের যে চেতনা আছে সেটা প্রকাশ পায়। উদাহরণ যেমন, আমি যদি একটি সুন্দর বাড়ী তৈরী করি ও সেই সুন্দর বাড়ীকে ভালো ভালো আসবাবপত্র ও সেই রকম দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে সাজাই এবং বেশীর ভাগ সময়েই যদি ঐ বাড়ীটাকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলার কাজের সংগে লেগে থাকি এবং যদি এতই তাতে আসক্ত হয়ে পড়ি যে, মরণের পরও সেই স্থানটি ছেড়ে যেতে আমার ইচ্ছা হয় না, তাহলে সত্যিই আমি অদৃশ্যভাবে সেখানে ঘুরে বেড়াব। অপরে আমাকে দেখতে পাবে না বটে, কিন্তু আমার তীব্র আসক্তি ঐ মায়ার স্থানটিতে আমাকে আবদ্ধ ক'রে রাখে। আমি আশ্চর্য হই—যখন আবার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও প্রিয়জনেরা ঐ সময় আমাকে চিনতে না পারে, আর তখনই অসহ্য কষ্ট অনুভব করি। অবশ্য এ'ধরনের অবস্থা কতকগুলি নির্দিষ্ট বিদেহী আত্মারই ভাগ্যে হয়ে থাকে। সে সময়ে তাঁরা জানতেই পারে না যে, তারা মরে গেছে। তখনও তাদের কিন্তু ব্যক্তিত্ব থাকে। কোন যুদ্ধের সময়ে হয়তো অনেক সৈন্য প্রাণদান করেছে তাদের মনে প্রতিহিংসা, ঘৃণা ও ক্রোধের ভাব নিয়ে। মরণের পর তারা কিন্তু পরলোকে গিয়েও দেখে যে, তারা ক্রমাগত যুদ্ধ করছে। শত্রুদের চেহারা তাদের মনে সংস্কারের আকারে থাকে, সেইগুলিকে তারা নিজেদের বাইরে কল্পনা দিয়ে সৃষ্টি করে ও তাদের সংগে যুদ্ধ করার চেষ্টা করে। এটা সম্পূর্ণ মহা-অশান্তির অবস্থা। একেই ঠিক ঠিক নরকের অবস্থা বলা যায়। মরণের পর সেই পরলোকে সৈনিকরা যে শোচনীয় নারকীয় অবস্থার মধ্যে থাকে, তার চেয়ে বরং এই ধরণীতে তারা ভালো ছিল। কখনও কখনও কোন কোন লোক হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়,—যেমন দেখা যায় কোন যুদ্ধে কোন আকস্মিক বিস্ফোরণের আঘাতে কারুর শরীরটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল। বিস্ফোরণের সেই আঘাত হয়তো এতো বেশী হ'ল যে, সে অজ্ঞান হয়ে গেল এবং সেই অবস্থায়ই তার দেহ গেল। তখন প্রেতাত্মার জ্ঞানের বিশেষ-কিছু উন্নতি হয় না? তাই যাঁরা প্রাকৃতিক নিয়মরহস্য জানেন তাঁরা অন্তত কখনও যুদ্ধের প্ররোচনা দেবেন না। তার কারণ হ'ল—কারুর জীবন নেবার আমাদের অধিকার নেই, বিশেষ ক'রে আমাদের সেই সব ভাইদের জীবন —যারা ধরণীর বুকে এসেছে তাদের আত্মোন্নতির প্রসারতা সম্পাদন করতে। আমরা তাদের সাহায্য করার পরিবর্তে তাঁদের জীবনের পরমায়ুকে করি অল্প—যুদ্ধে তরবারি ও সকল রকম মারণাস্ত্রের মুখে নিক্ষেপ ক'রে। এ' একটা

ভয়ংকর অমানুষিক ব্যাপার, কেননা যুদ্ধে মৃত্যুর পর সৈনিক ও যোদ্ধাদের বিদেহী আত্মারা যায় এক অজ্ঞানের রাজ্যে—যেখানে তারা জানতেই পারে না তারা গেছে কোথা। তারা গিয়ে পড়ে শোচনীয় বিশৃংখলার মধ্যে। তখন তারা সাহায্য চায়, তারা চায় কোন চালক ওপথ-প্রদর্শকের সহায়তা— যে তাদের বুঝিয়ে দেবে যে, শরীর তাদের চলে গেছে এবং এসেছে তারা অজানিত একটি পরলোকের দেশে।

একটি গল্প আমার এখন মনে পড়ছে এবং সেটি হ'ল লস্-এঞ্জেলিসের একটি শহরের কোন বাসিন্দার প্রেতাত্মাকে বৈঠকে আনা হয়েছিল। বাসিন্দাটি মারা গেছলেন ইংরেজী ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি ছিলেন একজন গণ্যমান্য সুপ্রীম কোর্টের জজ্ (বড়-আদালতের বিচারক)। কতকগুলি বন্ধুর সাহায্যে তাঁর বিদেহী আত্মা এই ধরণীর সংগে যোগ রক্ষা করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয়। তিনি বলেছিলেন, তাঁর পরিচিত একটি স্ত্রীলোককে পরলোকে তিনি দেখেছেন তার কি শোচনীয় অবস্থা। স্ত্রীলোকটি বাস করতো একটি বোর্ডিং-ঘরে। মৃত্যুর পরও ঐ ঘরেই সে বাস করতে থাকে প্রেতশরীর নিয়ে। ঐখানেই পরিত্যক্ত গরুর হাড় আর মাংস, আলু প্রভৃতি সে খেতো, কিন্তু কফি মোটেই পছন্দ করতো না। কফি অবশ্য অল্পই হ'ত: তাই সে একদিন অনুযোগ করে বল্লে: 'কি ভয়ানক ব্যাপার! আমি আমার বন্ধুদের সংগে এক টেবিলে বসতেও পারি না, আলুগুলোও বেশ ভাল নয়'। কিন্তু তবুও সে ক্ষুধার্ত ছিল ব'লে তাই খেত। এ'থেকে আমরা এই ধারণা করতে পারি যে, পৃথিবীর ভোগসুখে আকর্ষণ থাকলে মরণের পরও আত্মার অবস্থা কি রকম হয়! সেই মেয়েটি বুঝতে পারত না যে, তার পার্থিব দেহ গেছে, বা সে মরে গেছে। সে ভাবতো তখনও পৃথিবীতে সে বেঁচে আছে। সে চিন্তা করতো পৃথিবীতে যে সব বন্ধুবান্ধব পেয়েছে,—ঠিক তেমনটি বা তার চেয়ে ভালো আর কাউকে সে পায় নি। এ' থেকেও আমরা কি পাই? এ' থেকে এটাই পাই যে, মরণের পারে সকল কামনা-বাসনা আমরা সংগে নিয়ে যাই এবং পরলোকে গিয়ে চিন্তার সাহায্যে বা মানসক্ষেত্রে সে'গুলি ভোগ করতে চেষ্টা করি। সুতরাং বোঝা যায়, মরণোত্তর রাজ্য হ'ল চিন্তা বা কল্পনাগুলিকে বাস্তব ক'রে তোলার ক্ষেত্র। মানসিক চিন্তা সেখানে বাস্তব রূপ গ্রহণ করে। প্রেতলোকে যদি আমরা একখণ্ড রুটির চিন্তা করি তো রুটি অমনি সৃষ্টি হয়ে যায় মনে ও -তাই আমরা খাই। সেখানে কাজকর্ম সবই হয় চিন্তা দিয়ে, কেননা চিন্তা বা

মন দিয়েই তো প্রেতলোক তৈরি। আমরা যদি সেখানে ক্ষুধার্ত হই তো খাদ্য অমনি আসে ও আমরা তা খাই। কফির কথা ভাবলে সংগে সংগে কফি সৃষ্টি হয় এবং আমরা তা পান করি। সুতরাং এ'সব জানা আমাদের পক্ষে কতো দরকার যে, যদি নির্দিষ্ট কোন খাদ্যের, পোষাক-পরিচ্ছদের বা মণিরত্নের, কিংবা ইহজীবনে কোন-কিছু পাবার আসক্তি আমাদের থাকে তো সে সবকেই মরণের পরও আমরা সংগে নিয়ে যাই এবং প্রেতলোকে চিন্তা বা কল্পনার সাহায্যে সূক্ষ্মপদার্থ থেকে সেগুলিকে বাস্তব আকারে সৃষ্টি করি ও ভোগ করি। ক্রমোন্নতির পরিবর্তে প্রাথমিক অবস্থা—যা আমাদের আত্মার বিকাশের পথকে রুদ্ধ ও সংকীর্ণ করে—তাকে ত্যাগ না ক'রে আমরা বরং তাদের ভোগ করি—যতদিন পর্যন্ত না অজ্ঞানের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ি ও আবার তা থেকে জেগে উঠি। সচ্চিন্তা ও সৎকাজ যদি আমাদের সাহায্য করে তো তবেই আমরা বিকাশের পথে আবার উন্নতি লাভ করতে পারি। কিন্তু বেশীর ভাগ বিদেহী আত্মারা বহুকাল ধরে অজ্ঞানের অবস্থায় পড়ে থাকে। আমাদের এ জগতের সময়ের মান প্রেতাত্মাদের কোন উপকারে আসে না। এ'জগতের পাঁচ হাজার বছর হয়তো তাদের কাছে পাঁচ দিন বলে মনে হয়, কেননা আমাদের কালের মান নির্ণয় করি আমরা আমাদের জীবনযাত্রার উপযোগী ক'রে আর প্রেতাত্মারা করে তাদেরই অনুযায়ী। সুতরাং কেউ বলতে পারে না প্রেতাত্মারা কতদিন একটা নির্দিষ্ট অবস্থার ভেতর থাকবে। কিন্তু এটি মনে রাখা উচিত যে, আমারা আমাদের ভবিষ্যৎ রচনা করি, ও সৃষ্টি করি নিজেদের অদৃষ্ট এবং গঠন করি নিজেদের চিন্তা ও কাজের দ্বারা আমাদের প্রকৃতি বা চরিত্র।

এমন নয় যে, হঠাৎ আমরা একটা রূপান্তর গ্রহণ করবো বা আমাদের ডানা সৃষ্টি হবে, কারণ পরলোকের জীবনটা ইহজীবনেরই চলমানতা। তার মানে মরণের পরের জীবন এই পার্থিব জীবনেরই যোগসূত্র, তফাৎ কেবল—সেটি একটি ভিন্ন লোক। আসলে সেটী একটি স্থান নয়, কেননা পরলোকে কোন দেশসম্পর্ক মোটে নেই। সেটি যেন চক্রের ভেতর আর একটি চক্রের মতো। যেমন আমরা ভিন্ন ভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের কম্পন শুনি—একটি নিম্ন ও অপরটি উচ্চ, কিন্তু দু'টি কম্পনই থাকে, একটি অপরের কোন বাধা সৃষ্টি করে না, আর সে'জন্যই একই সময়ে দুটি গানের স্বরলহরী আমরা শুনতে পাই, তেমনি এই ধরণীর চারিদিকে রয়েছে প্রেতলোক। সেই লোকটি চতুর্থ

স্তরের মতো। তাই এই ধরণীতে যে সব জিনিস আছে পরলোকে তার কোনটিই নেই, কেননা দেশসম্পর্ক সেই লোকে নেই।

যে'সব লোকের দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, স্বর্গ ব'লে কোন লোক বা রাজ্য আছে, তারা মনে করে দেবদূতরা ভগবানের উদ্দেশ্যে সেখানে প্রশংসার গান গায়, সেখানে শহরে রবিবাসরীয় শান্তির মতো শান্তি বিরাজ করে ও সেখানে সব-কিছু বন্ধ রয়েছে একটি শান্তিপূর্ণ নিরালা গির্জার ভেতরে। মৃত্যুর পর সকল লোক পরলোকে ঐ সমস্তই পায় ও ভোগ করে। এ'রকম স্বর্গও আবার অনেকগুলি আছে। যে-সকল মুসলমান বিশ্বাস করেন যে, তাঁদের স্বর্গে পরীরা থাকেন, প্রচুর পরিমাণে সুরা সেখানে পান করা যায়, শীতল বাতাস ও পর্যাপ্ত পরিমাণে ছায়ার অভাব নাই। এখন এই চিন্তা-আদর্শকেই যদি তাঁরা ধরে থাকেন তাহলে মরণের পর পরলোকে গিয়ে ঐসব কল্পনা বাস্তবে পরিণত করার চেষ্টা করবেন এবং এ'ভাবেই তাঁরা নিজেদের স্বর্গ সৃষ্টি করবেন (আসলে তাঁদের স্বর্গের সৃষ্টিটা মন বা চিন্তা দিয়েই হয়)। তাঁদের মতো ঠিক এই ধারণা আবার যাঁদের আছে তাঁরাও মরণের পর ঐ সকল প্রেতাত্মাদের সংগে মিলিত হন।

কিন্তু সেই সমস্ত অবস্থা চিরস্থায়ী নয়, বরং তারা স্বপ্নেরই অবস্থার মতো। এ'ধরণের স্বর্গও তো অনেকই আছে তা আগেই বলেছি। প্রত্যেক জাতির বা ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক লোকের এই ধরনের বিশ্বাস আছে যে, মরণের পর স্বর্গরাজ্যে তারা নানা সুখ ও সামগ্রী ভোগ করবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রেড-ইণ্ডিয়ানরা বিশ্বাস করে স্বর্গে তাদের শিকারক্ষেত্র আছে। প্রাচীন স্কন্দি-নেভিয়ানরা যেমন বিশ্বাস অনুযায়ী তাদের স্বর্গ ভালাল্লায় যায়, তেমনি রেড-ইণ্ডিয়ানরা তাদের স্বর্গে গমন করে। স্বর্গে তারা ওডিনের সামনে উপবেশন ক'রে তাদের অন্যান্য বন্ধুদের সংগে যুদ্ধের সময়ে আহত হয় এবং অলৌকিকভাবে সেই ক্ষতও আবার আরোগ্য হয়। তারপর তারা একটি বড় বন্যশূকরের পেছনে তাড়া করে, তাকে মারে ও তার মাংসে একটি বড় ভোজের বন্দোবস্ত করে এবং এভাবেই দিনের পর দিন অনন্তকাল ধরে চলতে থাকে তাদের স্বর্গসুখভোগ। অনন্ত এক সুদীর্ঘ সময়। এমন কি লক্ষ বছরও অনন্তকালের তুলনায় কিছুই নয়। 'অনন্ত' মানে আদি ও অন্তহীন কাল বা সময়। একে একটি বৃত্তের সংগে তুলনা করা যায়, কারণ একটি গতি সর্বদাই চক্রাকাররূপে হয়। সকল অগ্রগতিযুক্ত বিকাশই একটি

নির্দিষ্ট জায়গা (বিন্দু) পর্যন্ত যায়, তারপরই আবার তা ফিরে আসে। কোন কোন লোক হঠাৎ হয়তো স্বর্গে গেল, সেই স্বর্গসুখের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে আবার যে-সব বাসনা তাদের মনের অন্তস্থলে সুপ্ত থাকে সে'গুলি জেগে ওঠে এবং সেই বাসনাগুলোই আবার তাদেরকে এই পৃথিবীতে টেনে নিয়ে আসে। তারা আবার মানুষ হয়ে ধরণীর ধূলায় জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং মরণের জন্য আর আমাদের ভয় পাবার কোন কারণ নেই, কেননা প্রেতাত্মাদের এ' বাসনাই থাকে যে, ধরণীতে এসে তারা আবার পার্থিব জিনিস ভোগ করবে। সেখানে কেউ তাদের ওপর বলপ্রয়োগ করে না, তারাই বরং নিজের ইচ্ছা ও বাসনা দিয়ে এই অবস্থা সৃষ্টি করে। এই হ'ল নিয়ম। সেখানে কেউ দুষ্টদের জন্য শাস্তিবিধান করে না, কিংবা শিষ্টদেরও কেউ পুরস্কার দেয় না, মৃতাত্মারাই নিজেদের চিন্তা ও কার্য দ্বারা শাস্তি বা পুরস্কার লাভ করে।

আমরা প্রবৃত্তির আকর্ষণে ধরণীতে এসে আবার জন্মগ্রহণ করি। জন্ম নেবার ইচ্ছা থাকে বলেই আবার আমরা ধরণীতে নেমে আসি, নির্দিষ্ট কতকগুলি কাম্যসুখ ভোগ করি, কিছু-কিছু নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি— যেগুলো আমরা অপর কোন লোকে আর পাব না। ঠিক একই ধরনের অবস্থা হয় স্বর্গে গেলেও। স্বর্গ থেকে আবার আমরা নেমে আসি ও এই ধরণীতে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি। অবশ্য এটি আমাদের পক্ষে একটি বড় আশীর্বাদই বলতে হবে, নইলে একই জায়গায় একই ভোগ ও অভিজ্ঞতা নিয়ে নাড়াচাড়া করলে বিশেষ একটি একঘেয়ে অবস্থার সৃষ্টি হ'ত। আমার কাছে ওটা আনন্দের জিনিস নয়, কিন্তু তোমাদের কাছে হয়তো তাই, কেননা তোমাদের শেখানো হয়েছে বিশ্বাস করতে ওর চেয়ে উচ্চ অবস্থা আর নেই। সুতরাং অবস্থাটি দাঁড়ায় যে, মরণের পর আমরা বেঁচে থাকি ও ভিন্ন ভিন্ন লোক অতিক্রম করি এবং সেই সমস্ত স্থান থেকে কতকগুলি অভিজ্ঞতা আমরা সঞ্চয় করি। তবে মনে রাখা উচিত যে, তাদের প্রত্যেকটিতে নতুন ভোগ ও অভিজ্ঞতা লাভ করার কারণ ও সম্ভাবনা নিহিত থাকে তাদের মনে। সুতরাং এটি ঠিক নয় যে, সত্তর বছর একটি মাত্র লোকে (ভোগভূমিতে) কাটালেই আমাদের যত-কিছু বিকাশের ঘটবে সমাপ্তি। এটি মোটেই ঠিক নয়। খ্রীষ্টানরা মনে করেন ঈশ্বর তাঁদের জন্মের সাথে সাথে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরা

এসেছেন শূন্য থেকে ও থাকবেন অনন্তকাল ধরে। এটা মোটেই সম্ভব নয়, কেননা অনন্তজীবন মানে এই নয় যে, একটি দিকে আরম্ভ, আর অন্যদিকে অনন্ত, সুতরাং তা সীমাহীন। তোমরা কি এমন একটি ছড়ির কথা চিন্তা করতে পারো যার একটা দিক ধরে আছ আর অন্য দিকটা অনন্ত, সুতরাং সীমাহীন? আসলে যার আরম্ভ আছে, তার শেষও আছে, আর এটাই প্রকৃতির নিয়ম। কোন লোকই চিন্তা করতে পারে না যে, কোন-কিছুর আদি আছে অথচ অন্ত নেই।

অনেকে আবার চিন্তা করে, এই জড়দেহটিকে অনন্তকাল ধরে বাঁচিয়ে রাখা যায়। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, যার জন্ম আছে তার মৃত্যুও আছে। দেহের রূপান্তর ঘটতে পারে, কিন্তু তাই ব'লে যে সেই একই দেহ থাকবে, তা নয়; যেমন ছেলেবেলাকার শরীর ঠিক যুবা-বয়সে থাকে না, রূপের তার একটা পরিবর্তন ঘটেই। তাই শৈশবকালের শরীরের পরিবর্তন দেখা যায় যুব-বয়সে এবং যৌবনের শরীরে পরিবর্তন আসে বৃদ্ধ-বয়সের সময়ে। প্রত্যেক সাত বছর অন্তর আমাদের শরীরের অণু-পরমাণুদের পুরাতন দেহ পাল্টে গিয়ে নতুন হয়।[1]

ছেলেবেলায় আমাদের যে মস্তিষ্ক, যে দর্শনেন্দ্রিয় শ্রবণেন্দ্রিয় ছিল, পরবর্তী জীবনে তার পরিবর্তন ঘটে, মোটেই এক রকমের থাকে না। সুতরাং ক্রমাগতই শরীরের পরিবর্তন ঘটছে। কিন্তু পরিবর্তনের মাঝে এমন একটি জিনিস আছে যার পরির্তন কোনদিনই নেই, আর যতদিন না ঐ পরিবর্তনহীন শাশ্বত বস্তুটিকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি ততদিন সত্যিকারের সুখ এবং শান্তিও আমরা পেতে পারি না। কারণ, সকল পরিবর্তনের ভিতর আমরা যেন প্রভু অর্থাৎ কেন্দ্র—যার চতুর্দিকে ঘূর্ণাবর্তের মতো পরিবর্তন ঘটতে থাকে। আমরা সকল পরিবর্তনের অধীশ্বর ও কেন্দ্র হয়ে থাকি এবং সেটাই আত্মচৈতন্যের সত্তা। তার কোনদিন মৃত্যু বা ধ্বংস নেই। সুতরাং এই বিশ্বাস আমাদের রাখা উচিত যে, আমরা অমর ও মৃত্যুহীন। 'অমরতা' অর্থে জন্ম-মৃত্যুহীন ও আদি-অন্তবিহীন শাশ্বত জীবন। কেউই আমাদের হাতে ধরে সৃষ্টি করেনি, বা কেউই শূন্য থেকে

১। প্রতি সাত বছর অন্তর আমাদের দেহের বাহিক আকৃতি ও মানসিক প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে। তাছাড়া প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের শরীরে জীবাণুদের মধ্যেও পরিবর্তন ঘটছে, আজ যে শরীর আছে কাল ঠিক সেই শরীর থাকে না, কিছু-না-কিছু পরিবর্তন ঘটেই। তবে আমরা অনেক সময় তা জানতে পারি না।

আমাদের সৃষ্টি করেনি। ঈশ্বর নিজে তা পারেন না বা তাঁর সেইসকল শক্তিও নেই। প্রকৃতির নিয়মকে পরিবর্তন করার চিন্তাও অসম্ভব। সুতরাং সৃষ্টির প্রথমে আমরা ঈশ্বরের অংশরূপে বর্তমান ছিলাম, এই ধরণীতে এসেছি অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য, আমাদের বিভিন্ন শক্তিরও বিকাশ-সাধন আমরা করি, আবার ঈশ্বরেই আমরা ফিরে যাই। এই যাওয়া-আসা দিয়েই আমরা আমাদের অভিযানের চক্র সৃষ্টি করি। প্রকৃতির দিব্যশক্তিরই এটি খেলা, আমরা মাত্র সেই খেলার বিকাশ বা অভিব্যক্তি। প্রত্যেকটি চেতনার ব্যষ্টিসত্তারূপ জীব বা প্রাণী বিচিত্র বিকাশের মধ্য দিয়ে অতিক্রম ক'রে অনন্ত প্রকৃতির স্বরূপকে উপলব্ধি করবে—তা সে সেই জীবনেই হোক বা অনাগত ভবিষ্যৎ জীবনেই হোক।

আমাদের মনে রাখা উচিত যে, প্রেতাত্মারা স্বর্গভূমি থেকে ধরণীর ধূলায় নেমে আসে, অর্থাৎ তারা নূতন নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ক্ষেত্রেই অবতরণ করে। ইহলোকের খেলা শেষ ক'রে তারা আবার পরলোকে যায়, নূতন ও পরিবর্ধিত শক্তি নিয়ে আবার জন্মগ্রহণ করে—হয় নূতন অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান আহরণ করতে, নয় অপরকে তা সঞ্চয়ের জন্য সাহায্য করতে। কতকগুলি বিদেহী-আত্মা আছেন যাঁরা পূর্বজ্ঞানী, তাঁরা ইহলোকে থাকেন যেন আনন্দ উপভোগ করতে। যীশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধ বা অপরাপর লোকনায়কদের মতো মানব-সমাজের কল্যাণ-সাধন ক'রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তাঁরা রাখেন। ঐ শক্তি কিন্তু সাধারণ আত্মার থাকে না। আমরা ধরণীতে নেমে আসি আমাদের অতীতের কৃতকর্মের ফলভোগের জন্য। উদাহরণ যেমন, আমার যদি ইচ্ছা থাকে যে, আমি একজন উৎকৃষ্ট শিল্পী হবো ও মরণের আগে যদি ঐ বাসনা পরিপূর্ণ না হয় ও হঠাৎ মৃত্যু হয় তবে কি মনে করবো যে, ঐ বাসনা আমার একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে? কখনই নয়, ঐ অতৃপ্ত বাসনাই আবার আমাকে এই ভোগলোকে পৃথিবীতে টেনে নিয়ে আসবে এবং যথোপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে প্রকৃষ্ট উপায়ের ভেতর দিয়ে একবার অন্তত সেই আদর্শকে আমার জীবনে পূর্ণ ক'রে তুলবে। এটিই আমাদের পক্ষে বিশেষ সুখের কথা।

জীবনের পক্ষে একটি ভোগলোকই কিন্তু যথেষ্ট নয়। অনেকে নাকি বলেন যে, এই মনুষ্যজগতে জন্মগ্রহণের আগে থেকে আমাদের জন্য সব-কিছু আয়োজন করা থাকে। কিন্তু এটা কি সম্ভব? সম্ভবই বা কেমন ক'রে হতে পারে একজনের পক্ষে অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ জগতের সব-কিছু বুঝা বা জানা,—

যদি না বিচিত্র জীবনের ভিতর দিয়ে আমরা অতিক্রম করি নতুন নতুন শিক্ষা বা অভিজ্ঞতাকে পাথেয় ক'রে? এজন্যই বেদান্ত শিক্ষা দেয় যে, তার প্রাকৃতিক নিয়মের সংগে কোন-কিছুর বিরোধ নেই। বেদান্ত ঐ সব ধারণার বা বিশ্বাসের কোনটাকেই খণ্ডন করে না, বরং তাদের প্রত্যেকটিকে যথাযোগ্য স্থান ও সম্মান দেয়। কতকগুলি লোক আবার স্বর্গলোকে যায়, কিন্তু যদি কেউ বলে যে, ঐ স্বর্গলোকপ্রাপ্তিই জীবনের চরমপ্রাপ্তি বা আদর্শ—তাহলে আমি বলবো ঐ উক্তি মোটেই সত্য নয়।

বরং ঐ সব উক্তি ও উপদেশ থেকে আমাদের দূরে থাকা উচিত। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, পরলোকের জীবন ইহজীবনেরই চলমান রূপ, আমরা ভবিষ্যৎ-জীবন গড়ে তুলি বর্তমানের চিন্তা ও ধর্ম অনুযায়ী। আসলে আমরাই আমাদের অদৃষ্টকে গড়ে তুলি, সৃষ্টি করি নিজেরাই নিজেদের প্রকৃতি বা চরিত্র, গড়ে তুলি আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন। আমাদের জীবনের চলাপথের আর বিরাম নাই। আমাদের মৃত্যু হবে, আবার ফিরে এসে জন্মগ্রহণ করবো এই ধরণীতে। আমাদের শাস্ত্রও বলে, আমরা অপরাপর গ্রহে জন্মগ্রহণ করতে পারি—যদিও সে-সব জায়গার অবস্থা ও পরিবেশ এখান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেই সমস্ত গ্রহে আমাদের অধ্যাত্মসত্তা-রূপ জ্ঞান দিয়ে অনন্তরাজ্যের পরিধিকে বাড়িয়ে তুলতে পারি, অর্থাৎ পরমাত্মার দিব্যজ্ঞান লাভ করার পথকে সুগম করতে পারি। অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের আর শেষ নাই, কিন্তু পূর্ণজ্ঞানী মানুষ এমনই এক দিব্য-অবস্থায় উপনীত হ'তে পারেন—যার সৃষ্টি নাই, নাশ মৃত্যু নাই, জরা নাই, দুঃখ বা কোন রকমের কষ্টও কখনো সে' অবস্থার নাই। সেই পরমরাজ্যে বিরাজ করে পরিপূর্ণ শান্তি ও পরমানন্দ, পরমজ্ঞান ও পূর্ণপ্রজ্ঞা এবং তাই হ'ল মনুষ্যজীবনের চরমলক্ষ্য।[২]

২। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৪।৪.৬) বলা হয়েছে: "তদেব সক্তঃ সহ কর্মণৈতি, লিঙ্গ মনো যত্র নিযুক্তনস্য। প্রাপ্যান্তং কর্মণস্তস্য। যৎকিঞ্চেহ করোত্যোয়ম্। তস্মোল্লোকাৎ পুনরৈত্যস্মৈ লোকায় কর্মণে—ইতিনু কাময়মানা; অথাকামায়মানা—যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকামো ন বা তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি, ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি"—মুণ্ডক-উপনিষৎ ৩।২।২ শ্লোকও দ্রষ্টব্য।

একাদশ অধ্যায়

॥ বেদান্ত ও প্রেততত্ত্ব ॥

বিশ্বের অন্যান্য ধর্মের মতো আধুনিক প্রেততাত্ত্বিকদের সৃষ্টিও অনৈসর্গিকতার মধ্যে। গোঁড়া খ্রীষ্টান-বিশ্বাসকে খণ্ডন ও তাদের ধর্মবিশ্বাসকে পুনর্গঠন করতে এই মতবাদ বিশেষ সহায়তা করে। আমেরিকার জনসংখ্যার এক বৃহৎ অংশ আবার শুরু করেছে কবরের বা মৃত্যুর পরপারে কি আছে তার অনুসন্ধান করতে।

গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই এক দেহাতীত আত্মার বিকাশ ও জড়দেহের ধ্বংসের পরও তার অস্তিত্বের প্রমাণ করতে প্রেততত্ত্বের অপূর্ব কার্যকারিতা দেখা গেছে। যে-সকল লোক ভবিষ্যৎ-জীবনসম্বন্ধে অবিশ্বাস ও সন্দেহের বশবর্তী হয়ে বিগত শতাব্দীর নিরীশ্বরবাদ, অজ্ঞেয়তাবাদ ও বাস্তববাদের বিষময় ফল ভোগ করেছিলো, প্রেততত্ত্ব তাদের প্রাণে দিয়েছে শান্তি, আনন্দ ও আশ্বাস।

আধুনিক প্রেততত্ত্বের সাহায্যে বহু শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোক আজ জেনেছে, যে, চৈতন্যস্বরূপ মানবাত্মা ব'লে এমন এক সত্তা আছে—দেহ বিনাশ হবার পরও যার অস্তিত্ব থাকে। আধুনিক প্রেততত্ত্বের মতে, মৃতের আত্মা চিরন্তন দুঃখ ভোগ করে না, বরং তা নির্বিঘ্নেই কালাতিপাত করে। তাদের আত্মীয়-বন্ধুদের কথাও তারা ভুলে যায় না, বরং তারা সর্বদাই স্বর্গীয় অভিভাবকদের মতো তাদের প্রিয়জনের প্রতি সতর্ক-দৃষ্টি রাখে, তাদের সহায়তা করতে ও পার্থিব জীবনের দুর্ভাগ্য ও বিপদ হতে রক্ষা করতে সততই উন্মুখ হয়ে থাকে। আধুনিক প্রেততত্ত্ব মৃত্যুর পারের বিভীষিকা হতে মানুষকে মুক্তি দিয়েছে এবং এই মতবাদ মৃত্যুকে এক আশ্চর্যময় দেশ বলে গ্রহণ করার সামর্থ্য দিয়েছে। সেই দেশের অধিবাসীরা উপভোগ করতে পারে নূতন জীবন, নূতন অভিজ্ঞতা, নবরূপায়িত সুখ ও আমোদপ্রমোদ। এইভাবে মরণোত্তর জীবনের বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করে আধুনিক প্রেততত্ত্ব। বিদেহী জ্ঞানী আত্মারা একটি মিডিয়মকে অবলম্বন ও অনৈসর্গিক বিষয়ের জ্ঞান দান ক'রে আহ্বানকারীদের মনকে আলোকিত করতে চান, এবং তাঁদেরই নির্দেশানুযায়ী এক ধর্মের তাঁরা গোড়াপত্তন করতে চেষ্টা করেছেন।

আধুনিক প্রেততত্ত্ব পরিচ্ছিন্ন আত্মার সংগে যোগাযোগ সাধন করে, আর তাদের কাছ থেকে সংগৃহীত জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে। ধর্মপ্রতিষ্ঠার এই প্রচেষ্টা আমাদের বহু প্রাচীনকালে আদিমজাতিদের কথাই মনে করিয়ে দেয়। যখন তারা দিন কাটাতো অজ্ঞানতার অন্ধকারে, তাদের মন কঠোর সংগ্রামে নিযুক্ত থাকতো মৃত্যুর পারের তমসাচ্ছন্ন রহস্যের মধ্যে কেবল একটি মাত্র আশার আলোকরশ্মিকে দেখার প্রবল আগ্রহ নিয়ে। আদিম অধিবাসীদের ধর্ম ছিল মৃত আত্মীয়-বন্ধুদের স্মৃতিকে অটুট রাখা। এই প্রেততত্ত্বই আবার আমাদের সেই পশ্চাতে ফিরে যেতে প্রেরণা যোগাচ্ছে। ভৌতিক রূপ দেখে সেই প্রাচীনদের বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছিল যে, তাদের পিতৃপুরুষেরা তাঁদের দেহ বিনষ্ট হওয়া সত্ত্বেও বেঁচেই থাকে। তাদের পূজায় প্রধান আয়োজন ছিল জীবিতাবস্থায় তাদের মৃত আত্মীয়-স্বজনেরা যা পছন্দ করতো সেই রকম অনুষ্ঠান করা। সেই পিতৃপুরুষদের পূজা করাই প্রেততত্ত্বের আদিম সংস্করণ। বহু বিদ্বজ্জন বলে গেছেন—অনৈসর্গিকতা যে সমস্ত ধর্মের উৎস তাদের গোড়াপত্তন হয়েছে পিতৃপুরুষদের পূজার মধ্য দিয়েই।

পিতৃপুরুষদের পূজার অর্থ তাঁদের দেহাতীত আত্মার ও তাঁদের অনৈসর্গিক ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। তাঁদের প্রতি এই স্মৃতিঅর্ঘ্য দান ও তাঁদের সেবা করার উদ্দেশ্য তাঁদের সহানুভূতিকে জাগ্রত করা,—যাতে তাঁরা পার্থিব জীবনের দুর্ভাগ্য ও দুর্দশার সময় আমাদের সাহায্য করতে পারেন। পিতৃপুরুষের আরাধনা প্রায় সব ধর্মেই প্রচলিত আছে। বিভিন্ন দেশের প্রাচীন ধর্মবাদগুলির আলোচনা করলে দেখা যায়, প্রেততত্ত্বের অতি প্রাচীন সংস্করণ প্রাচীন মিশরীয়, ব্যবিলনীয়, চ্যালডীয়, অসিরীয়, চৈনিক, পারসিক, হিন্দু ও অপরাপর প্রাচীন জাতির মধ্যে এবং পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রচলিত ছিল।

যারা খ্রীষ্টের নাম বা তাঁর ক্রুশে মৃত্যু সম্বন্ধে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানে না এমন খ্রীষ্টানদের মধ্যেও ঐ প্রথার প্রচলন আছে এবং ঐগুলি আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি প্রীতি ও ভালবাসার স্বতস্ফূর্ত বিকাশ। আদিম জাতিদের মধ্যে মৃত আত্মীয়-স্বজনদের গুণগান করার যে প্রথা ছিল তাই গীর্জা ও মন্দিরে প্রার্থনা-গানে রূপান্তরিত হয়েছে। মহম্মদ ও যীশুখ্রীষ্ট দু'জনেই বিদেহী আত্মায় বিশ্বাস করতেন। দু'জনেই তাঁদের মাথার ওপর দেবদূতের আবির্ভাব ও অপসরণ দর্শন করেন। সাধকদের আত্মার কাছ থেকে তাঁরা প্রত্যাদেশও পেয়েছিলেন।

ভারতবর্ষের অতি-প্রাচীন যুগ থেকেই দেহাতীত আত্মায় বিশ্বাস হিন্দুদের ধর্মমত সংগঠনে একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছে। এই বিশ্বাসের পরিচয় বৈদিক যুগের বহু সাহিত্যের মধ্যে পাওয়া যায়। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের পাঁচ হাজার বছর আগে ঋগ্বৈদিক যুগেও এই রকমের ধারণা সর্বসাধারণের মধ্যে প্রকট ছিল। বহু ঋক্‌মন্ত্র পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়েছে। শ্রাদ্ধের সময় তাঁদের আহ্বান করা হ'ত, তাঁদের তুষ্ট করা হ'ত ও উৎসৃষ্ট উপচার গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হ'ত।[১] সংস্কৃতে 'শ্রাদ্ধ' শব্দটির অর্থ বিদেহী আত্মার স্মরণ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান। হিন্দু গৃহীদের নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে স্বল্পক্ষণের জন্যও পূর্বপুরুষদের স্মরণ ও তাঁদের উদ্দেশ্যে কিছু দান করাও একটি অবশ্যকরণীয় কর্ম। তারা মৃত আত্মীয়-স্বজনকে স্মরণ করেন, দরিদ্র-ভোজন করান ও বস্ত্রদান ও তীর্থকর্ম করেন। হিন্দুদের বিশ্বাস যে, মৃত আত্মীয়-স্বজনদের উদ্দেশ্য ক'রে এই সমস্ত সৎকাজ করলে তার ফল তাঁদের অগ্রগতিতে সাহায্য ও তাঁদের মঙ্গলসাধন করে। মৃতের স্মরণে অনুষ্ঠিত সকল ধর্মকর্ম তাঁদের শুভ ফলদান করবে।

বেদান্তধর্মমতে সাধারণ মানুষের আত্মা মৃত্যুর পরও পার্থিব বন্ধনে বন্দী থাকে ও তাদের আত্মীয়-বন্ধুদের সাহায্য কামনা করে। জীবিতদের সচ্চিন্তা ও সৎকর্ম তাদের পার্থিব বন্ধন হ'তে মুক্ত ক'রে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করে এবং তাদের প্রেতলোকে যেতে সহায়তা করে। সেখানে তারা স্বকীয় বা তাদের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সৎকর্মের শুভফল ভোগ করতে সক্ষম হয়।

প্রাচীন পারসিকরা তাদের পূর্বপুরুষদের আত্মায় বিশ্বাস করতো ও তাদের বলতো 'ফ্রাবাশিস্' অর্থাৎ পিতা। তাদের বিশ্বাসে নিষ্ঠাবানদের আত্মা দেবদূত, স্বর্গদূত ও দেবতাদের স্তরে উঠতে পারতো। পারসিকরা তাঁদের উপাসনা করতো, প্রশংসা করতো তাঁদের সাহায্য প্রার্থনা ও তাঁদের আশীর্বাদ ভিক্ষা ক'রতো। তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তারা খাদ্য ও অন্যান্য জিনিস উৎসর্গ

১। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে ১৪শ ও ১৮শ সূক্ত-দুটির ব্যবধানে ৭২টি মন্ত্র আছে। সেই মন্ত্রগুলিতে পিতৃলোক, যম, পিতৃলোকে দেবতাদের, অগ্নি, সরয়ু, পূষা সরস্বতী, সোম, মৃত্যু, ধাতা, ত্বষ্টা প্রভৃতিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে সমাহিত অগ্নিকার্য প্রভৃতি সম্পর্কে। ১৬শ সূক্তের ২য় মন্ত্রে আত্মার পুনর্জন্মের বীজের সন্ধান পাওয়া যায়ঃ "শ্রিতম্ যদা করসিজাতবেদোহতমেনম পরিদত্তাৎ পিতৃভ্যং যদা গচ্ছন্তাসুনিতিমেতমথ দেবানাম্ বশনির্ভবতি"। এখানে মৃত্যুর পরেও যে আত্মা থাকতে পারে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ক'রতো। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, পিতৃপুরুষদের আরাধনারূপ প্রেততত্ত্বই পারস্য, মিশর, ব্যবিলন, চ্যালডীয়, চীন প্রভৃতি দেশের ধর্মের ভিত্তি।

আধুনিক পণ্ডিতেরা ও শাস্ত্রবিদ্ সমালোচকেরা খ্রীষ্টান, মুসলমান ও ইহুদীয় ধর্মের মধ্যেও পিতৃপুরুষদের আরাধনার প্রমাণপঞ্জী আবিষ্কার করেছেন। বাইবেলের আদিম অংশের অষ্টাদশ অধ্যায়ে আছে—'সৌল' ডাইনির সঙ্গে পরামর্শ ক'রতে গেল, তার অনুরোধে ভাই স্যামুয়েলের প্রেতাত্মাকে আহ্বান ক'রল, স্যামুয়েল আবির্ভূত হ'ল ও তাকে সৎপরামর্শ দিল। আদি-বাইবেলের এই ডাইনি ও যাদুকরেরা আর কেউ নয়, আধুনিক প্রেততত্ত্বেরই তারা পরিপোষক মাত্র। বর্তমান প্রেতাত্মাদের আহ্বানকারীরা যদি সেই যুগে জন্মাতেন তো তাঁদেরও ডাইনি ব'লে অভিহিত করা হ'ত এবং হয়ত চার্চের কাছে অভিযুক্ত হ'য়ে ফাঁসিতে ঝুলতে হ'ত বা পুড়ে মরতে হ'ত, তাঁদের।

'হিব্রু'-ভাষায় 'এলোহিম'-কে ইংরাজীতে 'গড্' বা ভগবান বলে অনুবাদ করা হয়েছে। এটিও দেহাতীত আত্মারই নাম। বলা হয়েছে এতোরের ডাইনি এলোহিমকে মাটি থেকে উঠতে দেখল। এখানে 'এলোহিম্'-শব্দটি মৃতদেহের দেহাতীত আত্মার প্রতিশব্দ-রূপেই ব্যবহৃত হ'য়েছে। আজকাল যেমন দেখা যায় তেমনি সেটিও প্রেতাত্মারই স্থুল-আকার-ধারণ। ইহুদীধর্মে পিতৃপুরুষদের আরাধনার স্পষ্ট সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন, সৌল প্রত্যক্ষ করল যে, সে ছিল স্যামুয়েল, তাই সে ভূমিতে অবনত হয়ে প্রণিপাত জানালো।[২]

রোমান-ক্যাথলিকদের সাধু-সন্তের পূজাও পিতৃপুরুষদের উপাসনার বা প্রেততত্ত্বেরই সামিল। রোমে বা ইতালীর অন্য অংশে গেলে দেখা যাবে, সিদ্ধ-পুরুষদের পুষ্প-পল্লবে সজ্জিত কবরের ওপর তাঁদের প্রতিমূর্তি রয়েছে। তাঁদের আত্মাকে প্রার্থনা ও বিভিন্ন উৎসর্গের দ্বারা আহ্বান করা হয়। মন্দির ও গীর্জার বেদীর উৎপত্তিরও সন্ধান পাওয়া যাবে ঐ মৃত সাধকের সমাধিতে।

স্বর্গত পিতৃপুরুষদের জন্য প্রয়োজনীয়তাবোধ থেকেই দেবতাকে উৎসর্গ করা ও বলিদান দেওয়ার প্রথার উদ্ভব হয়েচে। রক্ত-মাংসের দেহে যেমন খাদ্য ও পানীয়ের প্রয়োজন হয়, দেহাতীত আত্মারও তেমনি খাদ্য ও পানীয়ের দরকার—এই বিশ্বাস থেকেই নানা উপচার উৎসর্গ করার রীতি প্রচলিত হ'য়েছে। খ্রীষ্টানদের ধন্যবাদ দান ও স্মারক অনুষ্ঠান প্রভৃতিও প্রেততত্ত্বে বিশ্বাসেরই রূপভেদ!

২। স্যামুয়েল ১, অঃ ২৮।১৪।

আগেই বলা হয়েছে যে, প্রাচীন মিশরবাসীরা প্রেততাত্ত্বিকদের বিদেহী আত্মায় বিশ্বাসবান ছিল। তাদের ধারণা ছিল—জড়দেহের মধ্যে ঠিক দেহেরই অনুরূপ ছোট ছোট হাত, পা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে আত্মার অস্তিত্ব থাকে। তা'হলে দেহের 'দ্বিতীয় রূপ' বা শরীরের অপরাংশ (ডবল) জড়দেহের মৃত্যু হ'লে ঐ অপরাংশ দেহের বাহিরে চলে যায়, কিন্তু আত্মা বেঁচেই থাকে। মিশরীয়দের মতে দেহাতীত জীবন নির্ভর করে স্থূলদেহের অবস্থার ওপর, আর যতদিন জড়দেহটি অবিকৃত থাকে ততদিন দেহাতীত আত্মার জীবনও থাকে অটুট। কিন্তু মৃতদেহের কোন অংশ যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা নষ্ট হয়ে যায় তো ঐ দ্বিতীয় সত্তার (ডবল) সেই অংশ ক্ষতিগ্রস্ত বা নষ্ট হয়ে যায়। এ'জন্যই তারা 'মমি' তৈরী ক'রে অতো যত্ন নিয়ে মৃতদেহ রক্ষা ক'রতো। এই বিশ্বাসই ছিল মিশরীয়দের প্রেততত্ত্বের মূল। ব্যাবিলোনবাসী ও চ্যালডিয়াবাসীরাও দেহ হ'তে বিচ্ছিন্ন আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস ক'রতো। কিন্তু তাদের বিশ্বাস ঠিক মিশরীয়দের অনুরূপ ছিল না। তারা মৃতের ভ্রাম্যমান ছায়াতে আস্থাবান ছিল যাকে বলা হ'ত 'একিমূ' অর্থাৎ কাঠামো। তার গড়ন হ'ল জড়দেহের সমতুল্য। কিন্তু তাদের ধারণা ছিল: সেই ছায়াকে অতি দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হতে হয়—যদি না যথাযথভাবে মৃতের সমাধি ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকলাপ সমাধা করা হয়। এজন্যই তারা নানাপ্রকার অনুষ্ঠানের অনুশীলন ক'রতো দেহাতীত সত্তাকে দুর্ভাগ্য হ'তে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে। সেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ত্রুটি ঘটলে মৃতদেহের গৃহ—যাকে বলা হ'ত 'আবালু' অথবা মৃতদেহের ভূনিম্নস্থ আবাস (অনেকটা হিব্রুদের 'শেওল'-এর মতো)। সেখানে ঐ আত্মা প্রবেশ করতে পারে না, এই কারণেই তারা সমাধির সময়ে অতো যত্ন নিতো। স্মৃতিস্তম্ভ-নির্মাণ, সমাধিস্তূপ তৈরী করা এবং তাদের ফুল, মালা, পতাকা দিয়ে সাজানো প্রভৃতি আচার-অনুষ্ঠান বর্তমান ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় আজও প্রচলিত রয়েছে। সেগুলি ঐ ব্যাবিলোনবাসী ও চ্যালডিয়াবাসীদের আচার বা নীতিরই অবশিষ্ট ও অনুসরণ। সেগুলিই আমাদের সমাজের হস্তান্তরিত করা হয়েছে, আর আমরা সেই রীতিনীতির মর্ম না জেনেই করেছি তার অন্ধ-অনুকরণ।

ঠিক এই ভাবেই দেখানো যায় যে, চীনদেশের ধর্ম নিছক পিতৃপুরুষেরই পূজা। চীনেরা তাদের আত্মীয়-স্বজন পিতৃপুরুষদের দেহাতীত সত্তাতে বিশ্বাস করে। তারা পিতৃপুরুষদের উপাসনা করে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে তাঁদের

সাহায্য পাবে ব'লে। তাঁদের কাছে প্রার্থনা করে নিজেদের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য। এমন কি আজকের দিনেও বংশধরদের কৃতিত্বের জন্য স্বর্গগত পূর্বপুরুষরা উপাধি ও প্রশংসা দ্বারা সম্মানিত হন।

যেখানে বিদেহী আত্মা স্বর্গীয় জীবন ও অপার্থিব সুখভোগ করতে সক্ষম হয়, সে স্তরকেই 'পিতৃলোক' বলা হয়। সেই লোকের অধিকর্তা হলেন যম— যিনি মরণশীলদের অন্যতম, কিন্তু সৎকর্মের বলে তিনি অমরতার স্তরে উন্নীত হ'তে সমর্থ হ'য়েছেন। যাঁরা কঠোপনিষৎ বা স্যার এডুইন আর্নল্ডের 'সিক্রেট অফ ডেথ্' (মৃত্যুরহস্য')-গ্রন্থটি পড়েছেন তাঁদের 'যম' কথাটির সাথে নিশ্চয়ই পরিচয় আছে। যাঁরা বিকাশের উন্নত স্তরে পৌছান, তাঁদের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য পিতৃলোকের অধিপতি যমরাজ দান করেন যোগ্যতানুযায়ী। সেই পিতৃলোককেই আধুনিক প্রেততাত্ত্বিকরা 'স্বর্গ' বলেন। সেখানে যাওয়াই পিতৃলোক-উপাসক ও প্রেততাত্ত্বিকদের প্রধানলক্ষ্য। প্রাচীন বা আধুনিক কোন যুগের প্রেততাত্ত্বিকরাই তার অতীত কোন অবস্থারই বর্ণনা দিতে পারেন নি। যে ধর্মকে আধুনিক প্রেততত্ত্ব প্রকৃত সত্যধর্ম ব'লে দাবী করে তা আমাদের শুধু এই বিশ্বাসটুকু সংগঠন করতে সহায়তা করে যে, মৃত্যুর পরেও আবার আমরা আমাদের আত্মীয় ও বন্ধুদের সাহচর্য উপভোগ করতে পারবো এবং জীবনের সকল আনন্দ ভোগ করতে সমর্থ হবো। এর অনুরূপ আদর্শই সর্বদেশের পিতৃ-উপাসকরা পোষণ করেন। আধুনিক প্রেততাত্ত্বিক বা প্রাচীন পিতৃ-উপাসকের স্বর্গই পিতৃলোক। অনেকে এর অস্তিত্বে সন্দেহ করতে পারেন, কিন্তু সেই সন্দেহের কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। প্রেততত্ত্ব মানুষকে মৃত্যুর এক স্তরে এগিয়ে নিয়ে যায়, প্রাতিভাসিক জগৎ হ'তে নিয়ে যায় অদৃশ্য ও অজ্ঞাত একটি লোকে। এতে ক'রে বিচ্ছিন্ন দেহাতীত আত্মাদের স্থিতিলোকের ওপরও বিশ্বাস জাগায়। এই মতবাদীদের আদর্শের যেখানে পরিসমাপ্তি ঘটেছে সেখানেই হ'য়েছে বেদান্তের উচ্চ আদর্শের সূত্রপাত। সে আদর্শ ব্যষ্টি আত্মাকে অনন্তসত্যের পথ নির্দেশ করে, যে পথ পরিদৃশ্যমান জগতের উর্ধ্বে স্বর্গের পারে পিতৃলোকের উর্ধ্বে, দেবদূত এমন কি দেবতাদেরও আয়ত্তের বাইরে অবস্থিত। পিতৃলোকের জীবন-সম্বন্ধে বহু বৎসরের অনুসন্ধানের পর বেদান্তবাদী সত্যদর্শীরা আবিষ্কার ক'রেছেন যে, পিতৃপুরুষদের স্বর্গলোকই সত্যের সর্বোচ্চ সীমা নয়। তা হ'ল প্রাতিভাসিক সত্তারই অন্তর্গত এবং বিশ্বগত নিয়মের তথা কার্য ও কারণরীতির অধীন।

সেই পিতৃলোকের জীবনও সীমাবদ্ধ—যদিও তার স্থিতি সহস্র বৎসরও হ'তে পারে। সত্যদর্শী বেদান্তের মতে চরমসত্যের সন্ধান পিতৃগণও জানেন না, বাসনা-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য তাঁরাও অপার্থিব স্তরে পৌছুতে পারেন না, তাই পরমসত্যের সন্ধানও তাঁরা দিতে পারেন না।

নিরপেক্ষ সত্যকে যাঁরা জেনেছেন তাঁরা তাঁদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকেই জানতে পারেন, প্রেতলোকের অধিবাসী বা পিতৃলোকের অন্তর্ভূক্তদের মধ্যে কেউই সেই অপার্থিব সত্যকে জানতে পারেন না, সুতরাং তাঁরা অন্যকে সে বিষয়ে কোন শিক্ষাই দিতে পারেন না। এজন্যই এই সত্যদর্শীরা তাঁদের শিষ্যদের সাবধান ক'রে দেন যাতে তারা প্রেতাত্মাদের সাহায্য নেওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে বৃথা সময় নষ্ট না করে। কেননা প্রেতাত্মারা সেই বিষয়ে কোন জ্ঞান দিতে বা চরমসত্যের উপলব্ধির পথে কোন প্রকার সহায়তা করতে সক্ষমও নয়।

এই সাবধানতাকে উপেক্ষা ক'রে আধুনিক আমেরিকার প্রেততাত্ত্বিকরা বৃথা আশার বশবর্তী হ'য়ে তাঁদের অমূল্য সময় ও শক্তিকে নষ্ট করেছেন, অর্থাৎ প্রেতাত্মাদের সন্তোষসাধন করার প্রচেষ্টায় তাঁরা বৃথা সময় নষ্ট করছেন। প্রেতাত্মাদের সাহায্যে জীবনমৃত্যুর রহস্যোদ্ঘাটন হবে, সমাধান হবে মানব-মনের সমস্যার এটাই তাঁদের ধারণা। আধুনিক প্রেততাত্ত্বিকদের দাবী হল : তারা এই সমস্ত পার্থিব বন্ধনগ্রস্ত, বুদ্ধিহীন, নির্বোধ, অজ্ঞ আত্মা—যারা মিডিয়মদের পরিচালিত করে, তাদেরই কাছ থেকে সংগৃহীত ভ্রান্তজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত করবেন সত্যধর্মকে। বেদান্তের অনুশীলনকারীরা তাই অনেক সময় আশ্চর্য হয়ে ভাবেন যে, কেমন ক'রে বিজ্ঞ পুরুষ ও নারীরা এই সব সাধারণ প্রেততত্ত্বাধিবেষনে রাতের পর রাত যোগদান ক'রে কাটান এবং গভীর শ্রদ্ধা ও মনোযোগ সহকারে মিডিয়মের দুর্বল মনের পরিচালক জ্ঞানবর্জিত প্রেতাত্মার অসংলগ্ন প্রলাপ শোনেন।

আমেরিকাবাসী সকল শ্রেণীর মিডিয়মের সাথে কিছুদিন কাটানোর ফলে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা-সম্বন্ধে কিছু বলতে ইচ্ছা করি। আমি প্রেততাত্ত্বিকদের কাছ থেকে তাঁদের সংগে প্রেতাহ্বায়ক-অধিবেশনে যোগ দেবার ও তাঁদের হয়ে কিছু বলবার জন্য আমন্ত্রিত হই। আমার নিজের তৃপ্তির জন্য অনুসন্ধানের একটা সুযোগ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে আমি তাঁদের আমন্ত্রণ আনন্দের সঙ্গে মেনে নিই। বহু জড়দেহধারী প্রেতাত্মাকে আমি

দেখতে পাই ও তাদের সংগে কথাবর্তা বলি। আমি অনেকের সাথে সুদীর্ঘ আলাচনা চালাই এবং বহু প্রশ্ন করি, কিন্তু তাদের বা মিডিয়মদের এমন একজনকেও দেখলুম না,—যে সন্তোষজনকভাবে উত্তর দিতে পারলো। আমি তাদের মরণোত্তর জীবন, আত্মার উৎপত্তি, আত্মার যথার্থ রূপ, বিশ্বাত্মার সাথে আত্মার সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয়ের ওপর প্রশ্ন করি। এই ধরণের প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে তারা কখনোই কোনদিন উত্তর দেয় নি। পক্ষান্তরে তারা বহু স্থানেই স্বীকার করতে বাধ্য হ'য়েছে তাদের অজ্ঞতা এবং বলেছে 'আমরা এ'সব ঠিক জানি না বরং আমরা যা জানি তার চেয়ে তুমিই ভালো জানো।' কতকগুলি প্রেতাত্মা বৈঠকে যোগদানকারীদের ব'লেছে তাঁদের প্রশ্নের জবাবে আমার মতামতকেই মেনে নিতে। মাত্র কয়েক বছর আগে একবার এমন একটি সাধারণ অধিবেশনে মিডিয়মের মধ্য দিয়ে একটি প্রেতাত্মাকে এখানে যে একটি চিন্তার বাক্স Thinking-box বসানো রয়েছে তাঁর সামনে আমি কি বলবো' এই রকম বল্‌তে শুনে আমি আশ্চর্যান্বিত হই। একজন আমেরিকাবাসী নিগ্রো-প্রেতাত্মার কাছ থেকেই ঐ উক্তিটি আসে, আমি সেই মিডিয়মের স্বামীর পাশেই বসেছিলাম। তিনি ছিলেন আমার বন্ধু, আমি তাঁকে এই মন্তব্যের অর্থ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন: 'ও মনে করে যে, আপনি অত্যন্ত জ্ঞানী, তাই ও নিজের ক্ষমতা দেখাতে পারবে না। দুঃখের বিষয়, বৈকালে সেই অধিবেশন সে'দিন সফল হয়নি। আর একবার আমার প্রেতাত্মার সংগে দীর্ঘ আলোচনা হয়, আমি তাকে প্রেতলোকের জীবন সম্বন্ধে বহু প্রশ্ন করি। আমার প্রশ্নের উত্তরে আলোচ্য সেই মেয়ের আত্মাই বলে যে, সে স্কুলে যেতো ও বই পড়তো। আমি জিজ্ঞাসা করি: 'তুমি কি বই পড়, যদি কোন বই পড়ে থাকো তো তার নাম বলতে পার কি? সে জবাব দেয়: 'না, আমি নাম বলতে পারবো না।' তার জবাব সব বাজে।

অনেক সময় আমি লক্ষ্য করেছি যে, আমার নিজের চিন্তাগুলি আশ্চর্যপ্রকারে মনোপঠনের সাহয্যে জেনে নিয়ে এমনভাবে জবাব দেওয়া হয়েছে যাতে মনে হয়েছে যেন আমি নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। 'পুনর্জন্মবাদ'-সম্বন্ধে আমার বক্তব্য শুনে মিডিয়মরা যে মন্তব্য করেন তাতে আমি খুশী না হয়ে পারি না। অনেক মিডিয়ম আমাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন ক'রে বলেছে: 'আপনি যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন আমার শিক্ষক অবিকল তাই আমাকে শিখিয়েছেন। কিন্তু অন্যরা সে বক্তব্য শুনে খুশী হতে পারেনি,

নতুন জন্ম নিয়ে তাঁদের মানবীয় চিন্তা ও ইচ্ছাকে পূর্ণ করার জন্য এই জগতেই ফিরে আসেন। চিন্তা, কর্ম ও ইচ্ছা অনুযায়ী বার বার ভিন্ন ভিন্ন স্তরে তাঁরা জন্মের চক্রে ঘুরতে থাকেন। তাঁরা পিতৃলোক, স্বর্গ তথা প্রেতলোকের অপরাপর স্তরেও যেতে পারেন। এই কর্মসূত্রকে উপলব্ধি ক'রেই বেদান্তমতের অনুগামীরা ও ভারতীয় সত্যানুসন্ধানীরা সেই নির্দিষ্ট পথটিরই অনুসন্ধান করেন—যে পথে তাঁরা জন্মমৃত্যু-চক্র ভেদ ক'রে সমস্ত পার্থিব অবস্থা, সমস্ত স্তরের ও এমন কি পিতৃ-পূজকদের ও প্রেততাত্ত্বিকদের স্বর্গ এবং দেবতাদের উচ্চতম স্তরেরও পারে যেতে পারেন।

পরিপূর্ণ সত্যের অনুভূতি, বিশ্বে শাশ্বত ও অনন্তের যে রাজ্য সেখানে নিয়ে যাবার যে পথ তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হ'ল পিতৃলোকে যাবার পথ। কিংবা দ্বৈতবাদী ধর্মানুচারীদের বা অধ্যাত্মবাদীদের পথও তা থেকে আলাদা। যারা পিতৃপুরুষদের পূজা-উপাসনা করে, স্বর্গলোকে যাওয়া নির্ভর করে তাদের ভালো ও সৎকাজের ওপর; অর্থাৎ তাদের সদ্‌গতি নির্ভর করে সচ্চিন্তা ও সৎকর্মের ওপর। কিন্তু এটা নয় যে, তারা সৎ কাজ ও সচ্চিন্তা করবে আর তাদেরই ফলস্বরূপ পাবে দিব্য-ঈশ্বরানুভূতি, আত্মস্বাধীনতা বা সকল ধর্মের চরমলক্ষ্য শাশ্বত সত্যকে। চিন্তা ও মনের পারে যে দিব্যরাজ্য আছে সেখানে কোন-কিছু সৎকাজ ও সচ্চিন্তা নিয়ে যেতে পারবে না কেননা মন ও চিন্তার পারেই সেই রাজ্য, কাজেই তাদের ফল দিব্যপ্রাপ্তি দিতে পারে না। তারপর মানসিক রাজ্যের সীমানার সম্পূর্ণ বাইরেই সেই দিব্যানুভূতির রাজ্য, কাজেই মন, বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়ের কোন বিষয়ই সেখানে নিয়ে যেতে পারে না মানুষকে। সুতরাং কোন সৎকর্ম কিংবা প্রেতাত্মার বা পরলোকের ওপর বিশ্বাস মানুষকে পবিত্র আত্মার অনুভূতির স্বাদ দিতে পারে না। পিতৃপুরুষদের পূজার দ্বারাও সেই অনুভূতি লাভ করা যায় না, কিন্তু একমাত্র তা লাভ করা যায় আত্মজ্ঞান ও জীব-ব্রহ্মের দিব্যসম্পর্কের সত্যজ্ঞানের দ্বারা। বেদান্তে একেই বলা হয়েছে 'দেবযান', অর্থাৎ দিব্যপথ বা দেবত্বের বা অমৃতত্বের দিকে নিয়ে যাবার পথ।[৪] এই পথের পথিকরা হ'লেন তাঁরাই যাঁরা সত্যিকারের সরল ব্রহ্মসন্ধিৎসু; কি বাহ্যিক ও কি মানসিক সকল রকম পার্থিব ভোগে উদাসীন এবং সাধারণ

৪। ছান্দোগ্য উপনিষদ (১৫।১০।৩-৪), বৃহদারণ্যক উপনিষদ ও ঈশোপনিষদের ১৮শ শ্লোকে এই 'দেবযান' সম্বন্ধে আলোচনা আছে। ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে: "অগ্নে নয়

মরণশীল মানুষের উর্ধ্বে সেই সব মহাত্মারা—যাঁদের আত্মসূর্য অজ্ঞানরূপ মেঘের দ্বারা আবৃত নয়; যে সব মুমুক্ষু ভাগ্যবানের চরমলক্ষ্য ও পরম-আকাঙ্ক্ষা শাশ্বত সত্যবস্তুকে উপলব্ধি করা। তাঁদের সঙ্গে ঠিক পিতৃলোককামীদের তুলনা করা চলে না, কেননা পিতৃলোক যাঁরা চান তাঁদের প্রাপ্তি অধ্যাত্ম-কল্যাণকামীদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

জীবন-মৃত্যুর নিগূঢ়রহস্য ভেদ করার জন্য আমাদের পরমসত্যের পথচারী হওয়া উচিত। সত্যকারের ধর্ম কোন প্রেতবৈঠকে লব্ধ বাস্তব রূপ ও অভিজ্ঞতার বা পিতৃপুরুষদের পূজার উপর নির্ভর করে না। কাজেই বেদান্তের ধর্ম থেকে কোনদিনই শিক্ষা পাই না বিদেহী আত্মাদের কাছ থেকে দিব্যজ্ঞান প্রার্থনা করতে, কিংবা তাদের পিছনে পিছনে ছুটে সময় ও শক্তির অপব্যয় করতে, কেননা এদের কোনটার ফলই কার্যকরী নয়। প্রেতানুশীলনকারীরা চরমজ্ঞানের অধিকারী হতে চান বিদেহী আত্মাদের সংগে সংযোগ স্থাপন ক'রে, কিন্তু তাতে তাঁরা কৃতকার্য হন না, বরং তাঁরা প্রেতাত্মাদের মোহেই আবদ্ধ হন। তাও তাঁরা জানেন না যে, ধরণীর মায়ামোহে মুগ্ধ প্রেতাত্মাদের ক্ষমতা কতটুকু।

প্রেতবৈঠকে দেখা যায়, সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে প্রেতাত্মারা জ্ঞানী কিংবা মহাত্মার ছদ্মবেশে আত্মপ্রকাশ করে। উচ্চজ্ঞান দেবে এটাও তারা ভাণ করে, কিন্তু বুদ্ধিমান লোক সহজেই বুঝতে পারে ঐ সব প্রেতাত্মারা প্রতারক কি-না। সুতরাং প্রেতাত্মাদের নিয়ে চলাফেরা করার কাজে সাবধান হওয়া উচিত। এমন লোক আমি দেখেছি যারা প্রেততত্ত্বের আলোচনা ও তার কার্যকলাপ দেখে পরিশেষে সকল বিশ্বাস হারিয়েছে ও ঐ বিষয়ে একেবারে নাস্তিক হয়ে গেছে। উচ্চচিন্তার ক্ষেত্রে বর্তমান প্রেততাত্ত্বিকদের এক রকম শিশু হিসাবে গণ্য করা যায়। ভারতে সত্যানুসন্ধিৎসুরা হাজার বছর ধরে প্রেতাত্মাদের আলোচনা ক'রে ইহলোকের মায়ায় আবদ্ধ এবং উন্নত ধরনের প্রেতাত্মাদের বিষয়েও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। তাই হিন্দুরা কাউকে মিডিয়ম

সুপথা রায়ে অস্মান্ প্রভৃতি। এখানে 'সুপথা' অর্থে 'দেবযান'। এই দেবযান যাগযজ্ঞকারী কর্মীদের দক্ষিণমার্গ কিংবা অন্যান্য শ্রেষ্ঠ থেকেও ভিন্ন। ভগবদ্গীতায় (৮।২৪।২৫) উত্তর ও দক্ষিণায়ণের উল্লেখ আছে: "অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্, তত্র প্রয়াতাগচ্ছন্তি ব্রহ্মবিদো জনাঃ। ধূমোরাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম, তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে" প্রভৃতি।

কেননা তাদের প্রেত-নির্দেশকদের কাছ থেকে তারা সে'ভাবে নির্দেশ পায় নি।'

এখন ধরা যাক্‌, প্রেততত্ত্বের সব-কিছুই সত্য এবং বাস্তব, কিন্তু তাহলেই বা বিদেহী আত্মাদের সঙ্গে যোগাযোগের সাহায্যে প্রেততত্ত্বজ্ঞরা তাদের কৌতূহল চরিতার্থ করা ছাড়া আর কি লাভ করতে পেরেছে? তারা কি উচ্চতম সত্যের সম্বন্ধে কোনপ্রকার জ্ঞান লাভ করতে পারবে? মানুষের অধ্যাত্মভাবকে পরিচালিত ক'রে এমন কোন উচ্চতম রীতির পরিচয় কি তারা এর সাহায্যে পেতে পারবে? তারা জানতে পারবে কি—কোন কোন মানুষ পৃথিবীতে এসেই আবার হঠাৎ বিদায় নিয়ে কেন চলে যায়? আমি বহু মিডিয়ম ও তাদের প্রেত নির্দেশককে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখেছি যে, তারা আত্মার উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছুই জানে না। ছোটবেলার রবিবাসরীয়-বিদ্যালয়ে তাদের যেমন শেখানো হয় ঠিক সেরকমই গোঁড়া খ্রীষ্টান মতবাদের ওপর ভিত্তি ক'রেই তারা সর্বদা উত্তর দিয়েছে। তারা বলে, ঈশ্বর, আত্মাকে সৃষ্টি করেন আর মানুষ বা প্রাণী ঠিক যে সময়ে জন্মগ্রহণ করে, সেই সময়ে এবং এই আত্মাই চিরাগভাবে বিকশিত হয়। যদি কেউ প্রশ্ন করেঃ 'তুমি কি করে জানলে "যে দেহ সৃষ্টি হবার আগে আত্মার অস্তিত্ব ছিল না? তারা আর উত্তর দেবে না।

যদিও মৃত আত্মাদের সাথে এই যোগাযোগসাধনের ফলাফল বহুস্থানেই ভ্রান্তি ও ব্যর্থতায় পর্যবসতি হয়েছে ও যে তথ্যগুলির সন্ধান পাওয়া গেছে সে'গুলি মনোপঠন ও চিন্তা-সংক্রমণ ছাড়া আর কিছুই নয় বলে প্রমাণিত হয়েছে তবুও এমন অনেক সত্যিকারের তথ্য আছে যে'গুলি এই প্রেত-সংযোজন ছাড়া আর কোনভাবেই জানা সম্ভবপর নয়। অনেকক্ষেত্রেই প্রেতাত্মার দ্বারা শ্রোতৃবর্গ বিভ্রান্ত হয়েছেন, 'কেননা প্রেতাত্মাদের অনেকেই না সত্যবাদী—না বিশ্বস্ত। কখনো কখনো তারা অন্যের আকৃতি ধারণ ক'রে উপবেশকদের প্রবঞ্চনা করে, আর মিডিয়ম বেচারীরা জানতেও পারে না যে তাদের প্রেত-নির্দেশকরা তাদের ওপর কি চাল চাললে। এর জন্য অনেক সময়েই ভ্রান্ত খবরের জন্য মিডিয়মদের দায়ী করা যায় না বরং সেই ভ্রান্তির জন্য দোষী ও নিন্দনীয় প্রেতাত্মারা। তাহলে আমরা এই অজ্ঞ প্রবঞ্চক মিডিয়ম অপেক্ষা অনধিক জ্ঞানী প্রেত-নির্দেশকদের কাছ থেকে কি ক'রে অনপেক্ষিত সত্যকে জানবার আশা করতে পারি? এই পার্থিব বন্ধনে আবদ্ধ প্রেত্মাদের

সাথে সংযোগ সাধন ক'রে প্রেততাত্ত্বিকদের অনপেক্ষিত সত্যকে জানবার আশা করা বৃথা। ভারতে সত্যসন্ধানীরা কখনো প্রেতাত্মাদের সাহায্যে আত্মা বা ঈশ্বরকে জানার চেষ্টা করতে যান না, কারণ তাঁরা ছেলেবেলা থেকেই শেখেন—যে-আত্মারা মরণশীল মানবের সাথে সংযোগ রাখে তারা অজ্ঞ ও পার্থিব। তাদের সাহায্য আমাদের অপেক্ষা বরং আমাদের সাহায্যই তাদের অনেক বেশী প্রয়োজন।

এই সত্যসন্ধানীরা পিতৃপুরুষ বা বিদেহী আত্মার কাছে জ্ঞানলাভের সন্ধানে যায় না, তারা জানে যে স্বর্গ, প্রেতলোক বা পিতৃলোক কোনটাই শাশ্বত নয়, মানুষ বাসনার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েই ঐ সব লোকে যায়, ক্ষণিকের জন্য তাদের শুভকর্মের ফল ভোগ ক'রে নির্ধারিত কালের অতিক্রমে আবার সেই স্তর হ'তে জগতে ফিরে আসতে বাধ্য হয়।[৩] তারা অপরাপর মানুষের মতোই তাদের ইচ্ছাকে পরিতৃপ্ত করতে আবার পূনর্জন্মরূপ চক্রের কবলে পড়ে, কেননা সে ইচ্ছাপূর্তি একমাত্র ধরণীর এই স্তরেই হওয়া সম্ভবপর। ইচ্ছাবৃত্তির অধিগত কোন ব্যক্তিই জন্ম ও পুনর্জন্মকে অতিক্রম করতে পারে না। উচ্চতম স্বর্গলোক হ'তে পার্থিব বিকাশ পর্যন্ত প্রতিটি স্তরকে ব্যাপ্ত ক'রে বিরাজ করছে এই জন্ম ও পুনর্জন্ম-চক্র। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ইচ্ছার অস্তিত্ব থাকবে ততক্ষণ আমরা নানা অবস্থা ও পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে এমন পারিপার্শ্বিকতার সাথেই মিলতে পারবো যা পরিবর্তনের অধীন। আধুনিক প্রেততাত্ত্বিকদের কল্পিত স্বর্গে যাঁরা যান তাঁরাও কর্মফলের ভোক্তা, তাঁরাও কার্য ও কারণ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অধীন। এই নীতির বন্ধনে তাঁরা তাঁদের শুভকর্ম ও সচ্চিন্তার ফলভোগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে থাকেন। তারপর আবার

৩। বাদরায়ণ ব্যাস ব্রহ্মসূত্রে ব্যাখ্যা করেছেন কেমন ক'রে আত্মা 'মুখ্যপ্রাণ', ইন্দ্রি. মন, অবিদ্যা (অজ্ঞানতা), নৈতিক উৎকর্ষতা, অসৎকর্ম ও পূর্বতন জীবনের সংস্কারকে সংগে নিয়ে পুরাতন দেহকে পরিত্যাগ ক'রে নতুন কলেবর গ্রহণ করে। মহর্ষি ব্যাস "তদন্তপ্রতিপত্তৌ রংহতি সংপরিষক্তঃ প্রশ্নোনিরূপণাম্'—এই ৩য় অধ্যায়ে ১ন পাদের সূত্র থেকে "যোনেঃশরীতম্" এই ২৭ সূত্র পর্যন্ত কর্মফল অনুযায়ী বিদেহী আত্মার গতি-সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন: তাছাড়া "কৃতাত্যয়েহনু শয়বান্ দৃষ্টাস্মৃতিভাং যথেতমনেবংচ" এই ৩য় অধ্যায় ১ম পাদের ৮ম সূত্রে পরলোকে প্রেতাত্মার গতি থাকার জন্য আবার ভোগলোক ধরণীতে ফিরে আসে—"পুনরাবর্ত-স্তেবথেতম্"। পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার The Six System of Indian Philosophy-এর ১৭৫-১৮০ পৃষ্ঠায়ও এ' সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

হবার জন্য বলেন না। তাঁরা বলেন, যারা ঐ ধরনের কাজে লিপ্ত হয় তারা বড় রকমের মানসিক পাপই করে, কেননা তাতে তারা যে দেহ-মন পেয়েছে নিজের উন্নতি সাধন করতে তাদেরই বিকিয়ে দেয় প্রেতাত্মাদের ইচ্ছার ক্রীড়নক হ'য়ে।

আমরা জানি, পরিশেষে মিডিয়মের নৈতিক ও দৈহিক ক্ষেত্রে কম-বেশী অধঃপতন ঘটে। পরলোকতত্ত্ব যদি মানুষের মনকে উন্নতই করে তবে বেশীর ভাগ মিডিয়মরা কেন জ্ঞানহীন ও বুদ্ধিহীন হয়! কারণ তারা জানে না যে, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জগতের নিয়মের দ্বারাই আমরা নিয়ন্ত্রিত হই। আত্মসংযমের শক্তি তাদের নষ্ট হয়ে যায়। তাঁরা তাদের অচেতন হওয়ার অবস্থাকে আয়ত্তে আনতে পারে না, অথচ ঐ অবস্থায় তাদের প্রাণের অভিব্যক্তি বন্ধ এবং মন, মস্তিষ্ক ও সকল ইন্দ্রিয় অজ্ঞাত একটি শক্তির (প্রেতাত্মার) অধীন হ'য়ে পড়ে।

মিডিয়মদের ইচ্ছাশক্তি দুর্বল হয়। তাদের প্রাণশক্তি, প্রকৃতি ও বুদ্ধিশক্তি সমস্তই প্রেতাত্মাদের অধিগত হয়, এবং প্রেতাত্মারাই বরং তাদের ওপর প্রভুত্ব করে। একবার আমি একজন ভাল মিডিয়মকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম প্রেতাবেশের পর তার মন ও জ্ঞানের অবস্থা কি রকম হয়। তাতে সেই মেয়েটি উত্তর দিয়েছিল : 'আমি অনুভব করি যেন শরীরে আমার কিছু নেই ; সব শক্তি ও জীবনকে আমার কে যেন বার ক'রে নিয়েছে, ভেতরটা সবই খালি। কিছুক্ষণের জন্য আমি তাই কিছুই ভাবতে বা করতেও পারি না'। এটা কি সত্যিই একটা শোচনীয় অবস্থা নয়! এজন্যই ভারতবর্ষে হিন্দুরা কাকেও মিডিয়ম হ'তে উৎসাহ দেন না। বরং কাকেও যদি দেখেন যে মিডিয়ম হতে চেষ্টা ক'রছে তবে প্রতিনিবৃত্ত করেন তাঁদের সকল চেষ্টা দিয়ে। ইহলোকের মায়ায় আবদ্ধ প্রেতাত্মাদের কাছ থেকে দুর্বলচিত্ত লোকে সাহায্য চায় এবং প্রেতাত্মারাও তাই আনন্দ পায় তাদের ওপর প্রভুত্ব করতে।

অবশ্য সত্যিকারের যে সব প্রেতাবতরণ-কার্যকলাপ, তার কতকগুলি হয়তো লোকের উপকার করে, তাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে মরণের পারে জীবনের প্রতি বিশ্বাস এনে দেয়। প্রেতাত্মারা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের বা কার্যসংক্রান্ত ছোটখাট ঘটনার হয়তো ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে, কিন্তু তাই ব'লে দিব্যানুভূতি বা পরমজ্ঞান ও সুখের কোন সন্ধানই তারা দিতে পারে না। এই বিদেহী প্রেতাত্মারা কিন্তু কোন

দেবদূত নয়, তারা আসলে ইহলোকের মায়ায় আবদ্ধ প্রেতাত্মা। আধুনিক প্রেততত্ত্ববাদ উৎসাহ যোগাতে পারে আমাদের বিদেহী বন্ধুবান্ধবদের সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য যারা মৃতাত্মাদের অস্তিত্বের বিষয়ে সন্দেহবান তাদের মনে সান্ত্বনা আনতে পারে। কিন্তু তাই বলে প্রেততত্ত্ববাদ দিতে পারে না আমাদের চরমসত্য সেই ব্রহ্মের অনুভূতি, কিংবা যারা পিতৃলোকে বাস করেছে তাদেরও কোন উচ্চলোকে তুলে দিতে।

বেদান্ত-প্রচারিত ধর্মের লক্ষ্য হ'ল প্রত্যেক মানুষ যাতে যথার্থ স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারে--পরমাত্মার সাথে যাতে তার পুনর্মিলন হয়। দেশ, কাল ও প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন হয়ে আমরা পৃথিবীর মায়ায় আবদ্ধ হই, বেদান্তের ধর্ম আমাদের সে সকল বন্ধন থেকে মুক্ত ক'রে পরমসত্তায় প্রতিষ্ঠিত করে। উদ্দেশ্য—এ' জীবনেই যাতে শাশ্বত সত্যকে আমরা জানতে পারি ও পূর্ণজ্ঞানসম্পন্ন ভগবানের মতো পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারি। ব্রহ্মানুভূতি-লাভই বেদান্তের সর্বোচ্চ আদর্শ। সমস্ত ধর্মের চরমলক্ষ্যে উপনীত হবার সে পথ প্রদর্শন করে এবং পরমপবিত্রতার উদ্বোধন করে মানুষের প্রাত্যহিক সমস্ত কর্মের ভেতরে। আর তাহলেই শারীরিক ও মানসিক সকল অবস্থাকে অতিক্রম ক'রে আমরা ঈশ্বরের সচল বিগ্রহরূপে বাস করতে পারি। বেদান্তে তাই বলা হয়েছে:

'তুমি শত সহস্র শাস্ত্র পড়তে পারো, দিনের পর দিন কেতাবের শ্লোক আওড়াতে পারো, যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে পারো, সাহায্য পাবার জন্য প্রেতাত্মা বা দেবদূতদের উপহার দিতে পারো, জ্ঞানের জন্য বিদেহী পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে আরতি দিতে পারো, কিন্তু কিছুতেই কিছু হবে না—যতক্ষন না তোমার সত্যস্বরূপ আত্মাকে উপলব্ধি করতে, পারো, যতক্ষণ পর্যন্ত না সর্বব্যাপী আত্মার সাথে তোমার আত্মার মিলন ঘটাতে এবং এই জীবনেই অধ্যাত্মজ্ঞানের চরম পরিণতি লাভ করতে পারো। আত্মজ্ঞান-লাভই মানুষকে একমাত্র পূর্ণস্বাধীনতা ও শান্তি দিতে পারে।'

দ্বাদশ অধ্যায়

পরলোকতত্ত্ব ও পিতৃপুরুষপূজা

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মগুলির মতো আধুনিক পরলোকতত্ব অলৌকিক কোন কারণ থেকে সৃষ্টি হয়েছে ব'লে দাবী করে। খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের ওপর এই নতুন পরলোকতত্ত্ববাদ বিশেষ প্রভাব বিস্তার ক'রে পাশ্চাত্য জাতি সমূহের বিশ্বাস ও আচার-ব্যবহারের যথেষ্ট সংস্কার-সাধন ক'রেছে। গত পঞ্চাশ বছরের ভেতরে এই আধুনিক পরলোকতত্ত্বের কল্যাণে পার্থিব জড়শরীর নষ্ট হয়ে গেলেও অশরীরী প্রেতাত্মাদের বিস্ময়কর ক্রিয়াকলাপ দেখা গেছে। গত শতকের শুষ্ক এবং নাস্তিক চিন্তাধারার ফলে যাঁরা প্রায় নিরুপায় হয়ে দুঃখ ভোগ করেছিলেন তাঁদের অনেকের অন্তরে স্বস্তি ও সান্ত্বনা জুগিয়েছে এই তত্ত্ব।

আধুনিক প্রেততত্ত্ববাদের প্রসাদে এক ধরনের বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছে যে, জড়শরীরেও মৃত্যুর পর 'আত্মা' ব'লে একটি পদার্থের অস্থিত্ব থাকে। বিদেহী আত্মারা পরলোকে যে অনন্তকালের জন্য দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে না, তারা সেখানে সুখে শান্তিতে থাকে, আত্মীয়-স্বজনদের মোটেই ভুলে যায় না, বরং দুঃখে-বিপদে তাদের সাহায্য ও রক্ষা করে এবং এই বিষয়ে ঐ আধুনিক পরলোকতত্ত্বের কল্যাণে জানা গেছে। তা'ছাড়া আমরা আরো জানতে পারি যে, প্রেতাত্মাদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁদের বলা যায় 'অভিভাবক দেবদূত', অর্থাৎ তাঁরা তাঁদের ইহলোকে প্রিয়জনদের দেখাশোনা করেন ও যতদূর সম্ভব উপায়ে তাঁদের সাহায্য করতে চেষ্টা করেন।

আধুনিক পরলোকতত্ব মরণোত্তর জীবনের বিভীষিকা অপসারিত ক'রে মানুষের মনকে জানিয়েছে মরণের পারে আশ্চর্যময় সেই দেশের খবর, জানিয়েছে মরণের পারে এক জীবনসত্তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস। মিডিয়মদের মারফৎ বিদেহী আত্মাদের সাথে যোগাযোগ পাতিয়ে, কিংবা প্রেতাহ্বান-বৈঠকে যোগদানকারীদের মনকে অলৌকিক জিনিসের জ্ঞানে উন্নত করার জন্য গোপনেই হোক আর প্রকাশ্যেই হোক অভিজ্ঞ ও সত্যানুসন্ধিৎসু প্রেতাত্মাদের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নয়া-প্রেততত্ত্ববাদ যথার্থ ধর্মের প্রতিষ্ঠা করার দাবী জানিয়েছে।

আধুনিক যুগে পরলোকতত্ত্বের অনুশীলন ক'রে যে সত্যধর্মের প্রতিষ্ঠার

প্রয়াস চলেছে তা প্রাচীন যুগের মানুষের আঁধারের মধ্যে আলোর সন্ধান পাবার চেষ্টার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিদেহী আত্মীয়-স্বজনের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তারা যে সাধনা করেছিল এবং মরণের পারে রহস্যকে জানার তাদের যে চেষ্টা তাইথেকে সৃষ্টি হয়েছিল প্রেততত্ত্বজিজ্ঞাসা। মোটকথা আধুনিক পরলোকতত্ত্ব আমাদের নিয়ে যায় এক অতীত যুগের দেশে, তখন আদিম অধিবাসীদের অশিক্ষিত মন চাইতো বিদেহী বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের স্মরণে রাখতে। মৃতদের ভৌতিক আবির্ভাব দেখেই তাঁদের বিশ্বাস জেগেছিল মরণোত্তর জীবনের প্রতি। তারা বিশ্বাস করত যে, তাদের পিতৃপুরুষেরা বেঁচে আছে, তারা তাদের সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করে সেইসব কাজ দিয়ে যেগুলো তারা অত্যন্ত ভালবাসতো রক্তমাংসের দেহ নিয়ে ইহজগতে বেঁচে থাকার সময়।

অনেক পণ্ডিত মনে করেন, অলৌকিকতা থেকে উৎপন্ন ব'লে যে বড় বড় ধর্ম-সম্প্রদায়গুলি দাবী জানায়, তাদেরও সৃষ্টি হ'য়েছে এই ধরনের পিতৃপুরুষপূজা থেকেই। আমরা সকলেই জানি, পিতৃপুরুষপূজা বলতে বুঝায় বিদেহী প্রেতাত্মাদের সম্বন্ধে এক ধরনের বিশ্বাস। আমরা যেমন বিশ্বাস করি তারা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন তেমনি তাদের স্মৃতিকেও আমরা অহরহঃ মনে জাগরূক রাখি। পিতৃপুরুষদের দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে আমরা যদি তাদের ইচ্ছার ওপরই কর্তৃত্ব ছেড়ে দিই তবে যারা আমাদের আগে এ'লোক থেকে চলে গেছে তাদের সহানুভূতি ও সদয় অনুরাগ আমরা পেতে পারব।

প্রাচীন ইজিপ্টবাসীদের ভেতর বর্তমান প্রেততাত্ত্বিকদের মতো বিশ্বাস আমরা দেখতে পাই। তাঁরা বিশ্বাস করতেন প্রত্যেক মানুষের ভেতর হাত পা ও অংগ-প্রত্যংগযুক্ত আর একটি মানুষ বাস করে। সেই মানুষটি হ'ল প্রায় জড়দেহযুক্ত মানুষের মতো 'দ্বিতীয় সত্তা' (সূক্ষ্মদেহ)। সেই সূক্ষ্মশরীর মানুষের দেহের মধ্যে বাস করে আবার বার হয়ে যায়। তাঁদের বিশ্বাস ছিল

১। ডাঃ জে জি ফ্রেজার "দি গোল্ডেন বাউ" গ্রন্থে বলেছেন, আফ্রিকার বাণ্টু-সম্প্রদায় দক্ষিণ-আফ্রিকার জুলু, ঠেংগা ও অপরাপর কাফ্রী-সম্প্রদায়, ব্রিটিশ-মধ্য-আফ্রিকার নিগোনি জার্মান ও ব্রিটিশ-পূর্ব-আফ্রিকার বাবণ্ডেনে, মাসাই স্থক, নান্দি, ও থাকায়ু-সম্প্রদায়, আপার নাইলের দিনকা, মাদাগাস্কারের বেতসিলি ও অন্যান্য জাতি, বেনিয়োর ইবন প্রভৃতি এমন কি রোমান ও গ্রীকদের একটা সাধারণ বিশ্বাস ছিল যে, মৃত আত্মা আবার বেঁচে ওঠে এবং সাপ ও অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের আকারে তারা বাড়ীতে এসে পদার্পণ করে।

যে, ঐ দ্বিতীয় সত্তার জীবন সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রত জড়দেহী মানুষেরই বাঁচা-মরার ওপর। যদি জড়দেহীর শরীরের কোন অংশের ক্ষতি হয় তো প্রেতাত্মা বা সূক্ষ্মশরীরেও ক্ষতি হবে। এরই জন্য ইজিপ্টবাসীরা তাঁদের পিতৃপুরুষদের মৃতদেহের অতো যত্ন নিতো—মৃতদেহটাকে 'মমী' করে বাঁচিয়ে রাখত। আগেও বলেছি যে, সেই উদ্দেশ্যেই ইজিপ্টের বুকে অসংখ্য পিরামিড (মৃতের উদ্দেশ্যে তৈরী স্মৃতিস্তুপ) এখানে সেখানে গড়ে উঠেছে মৃতদেহগুলিকে রক্ষা করার জন্য।[২]

ইজিপ্টবাসীদের মধ্যে বিশ্বাস ছিল, যতদিন পর্যন্ত পার্থিব দেহ অক্ষত থাকবে ততদিন বিদেহী আত্মা বা সূক্ষ্মদেহও অক্ষত ও অটুট থাকবে। প্রাচীন ব্যাবিলোনবাসীদের এ'ধরণের বিশ্বাস ছিল—যদিও তা ছিল ইজিপ্টবাসীদের

২। (ক) দার্শনিক ডাঃ এ. ডব্লিউ. বেন এই প্রসঙ্গে তাঁর 'দি গ্রীক ফিলোজাফার্স, (১৯১৪ গ্রন্থে (পৃঃ ৫০৩-৫০৪) উল্লেখ করেছেন ঃ যেটা এখন আমরা পরীক্ষা ক'রে দেখতে পাচ্ছি তা হ'ল ইজিপ্টবাসীদের শাসনকালে শব-সংকারের স্মৃতিচিহ্নগুলির প্রকৃতির পিছনে তাঁদের যে সাধারণ বিশ্বাস প্রচলিত আছে সে বিষয়ে আমাদের বিশেষজ্ঞরা সকলেই একমত। বেশীর ভাগ স্মৃতিচিহ্নগুলি সাক্ষ্য দেয় আত্মার অমরত্ব বিষয়ে, আর সেগুলির নিদর্শন হ'ল বিচিত্র স্মারকলিপি। কখনও বা প্রস্তরমূর্তি কখনও বা কবরের মধ্যে পরলোকের উদ্দেশ্যে ঐ সব দ্রব্য-সামগ্রী দেওয়া হত। এমন লিপি পাওয়া যায়—যার কোনটায় লেখা আছে—আমি আমার স্বামীর জন্য অপেক্ষা করেছি। এই স্মারকলিপিটি হয়তো দেওয়া হয়েছে কোন দাস-পত্নীর মৃতদেহের পাশে। আর এক জায়গায় হয়তো লেখা আছে একজন বিধবা বলছে তার মৃত স্বামীর জন্য—ভিক্ষা করছে পাতালে দেবতার কাছে স্বামীর আত্মার মঙ্গলের জন্য এবং যাতে স্বামী রাত্রিকালে তার কাছে আবার আসে তার জন্য (পিতৃপুরুষদের কাছে) প্রার্থনা জানায়। হয়তো একটা পাথরে লেখা আছে 'মরণে তোমার সত্যিকারের মৃত্যু হয়নি'। আবার হয়তো লেখা আছে পিতা তার পুত্রকে হারিয়েছেন নিউমিডিয়াতে, বলেছেন ঃ না, নীচে পিতৃলোকের স্তরে তুমি যাওনি, নিশ্চয়ই স্বর্গের নক্ষত্রলোকে আছো। ম্যাসিডোনিয়ার ফিলিপ্পির কাছে ডেক্সাটোয় একটা কবরে লেখা আছে ঃ মা তাঁর ছেলের উদ্দেশ্যে তাঁর কবরে লিখেছেন, মরণের ক্রুদ্ধতায় আমরা অভিশপ্ত, কিন্তু তুমি ইলিয়ান ফিল্ড-রূপে স্বর্গে গিয়ে তোমার জীবনকে নূতন করে তুলেছ। ভবিষ্যৎ জীবনের সম্বন্ধে এই যে ধারণা মানুষ মরে গেলে স্বর্গে দেবসমাজের দ্বারা অভিনন্দিত হয় এটা শুধু গ্রীসেই পাওয়া যায় না, রোমান দেশগুলিতেও পাওয়া যায় প্রভৃতি।

(খ) স্যামুয়েল ১, ২৮ অধ্যায় ১৪ দ্রষ্টব্য।

রেভারেণ্ড এ. ডব্লিউ, অক্সফোর্ডও বলেছেন ঃ "ইস্রায়েলের পিতৃপুরুষের কবরেও আমরা এ'ধরণের স্মৃতিচিহ্ন দেখতে পাই। সেগুলি পাহাড়ের (নাম্ব ২০।৩৮, জোস ২৪।৩০) কিংবা কোন গাছ বা পাথরের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক্‌ত। এগুলি থেকে সিদ্ধান্ত না করে পারা যায় না যে, এসব ছিল প্রাক্ জিহোভীয় পূজারই অংগীভূত।"

এ' ছাড়া তিনি আরো উল্লেখ করেছেন ঃ "পবিত্র পাথর ও গাছপূজা থেকে পবিত্র স্তম্ভ 'মেসেব' ও পবিত্র বৃক্ষ 'আসেরা'-র পূজা প্রচলিত ছিল। ** সাধারণত যে 'টেরাফিম' ব্যবহার হত সেটা দেখতে ঠিক মানুষের মতো ছিল, তাই মনে হয় সেটা ছিল 'পিতৃপুরুষেরই প্রতিমূর্তি'। তাছাড়া জেনেসিস ৩১।১৯ থেকে বুঝা যায়—সেই পূজা পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যেই হতো।"

থেকে সামান্য ভিন্ন প্রকৃতির। তাঁরা মৃতদেহকে রক্ষা করতেন, নানারকম ওষুধ দিয়ে তাকে তাজা রাখবার চেষ্টা করতেন; তাদের ওপর স্মৃতিস্তুপ তৈরী করতেন, কবরে ফুল, মালা ও পতাকা রেখে দিতেন। এই প্রথা আজকের দিনেও ইউরোপ, আমেরিকায় অনুষ্ঠিত হ'য়ে আসছে। ব্যবিলনবাসীদের এটাই হল পিতৃপুরুষপূজার নিদর্শন। চীনাদেরও ধর্ম পিতৃপুরুষপূজা করা। প্রাচীন যুগে পারসিকরা বিশ্বাস করতেন বিদেহী আত্মারা থাকে। তাঁদের বিশ্বাস ছিল পুণ্যাত্মা প্রেতাত্মারা স্বর্গে গিয়ে স্বর্গদূত ও স্বর্গদূতের অভিভাবকদের পদ লাভ করে। পারসিকরা তাই তাঁদের পিতৃপুরুষদের নামের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন খাদ্য ও বলিদান উপহার দিত, আর যে কোন অলৌকিক প্রকৃতি তারা পছন্দ করত তাই প্রার্থনা করতো। বলিদান দেওয়া হত ঈশ্বরের নামে এই বিশ্বাস নিয়ে যে, বিদেহী আত্মাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে— যেমন তাদের ছিল রক্ত-মাংসের দেহ নিয়ে পৃথিবর ওপর। সে'জন্য তারা খাদ্য ও পানীয় দিত, আর তাই থেকে বলিদানের প্রথা ক্রমশঃ পৃথিবীর বুকে সৃষ্টি হ'ল।

এই যে খ্রীষ্টান-সমাজের ধন্যবাদের সংগে খাদ্য-পানীয় উপহার দেওয়ার রীতি এবং তাদের প্রভুর 'নৈশভোজন' উৎসবের অনুষ্ঠান-এর সম্পর্ক আছে পিতৃপুরুষপূজার সংগে। আদিমযুগের লোকেরা যে আবৃত্তিমূলক ও প্রশংসা-সূচক গান করত তাদের পিতৃপুরুষদের স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখার বা বিদেহী আত্মাদের বীরত্বপূর্ণ কাজ ও গুণ বর্ণনা করার জন্য, তা থেকেই ক্রমে পরিণতি লাভ করলো আজকালকার প্রশংসাসূচক প্রার্থনাগান।[৩]

যীশুখ্রীষ্ট ও হজরত মহম্মদ দু'জনেই বিশ্বাস করতেন যে, ভাল-মন্দ দু'রকমেরই বিদেহী আত্মা ও দেবদূত আছে। পরলোকগত বিদেহীর দেবদূত, ধার্মিক ও পবিত্র আত্মাদের কাছ থেকে জ্ঞানালোক পায়। মুসলমানরা কবরের উপর মসজিদ ও স্তূপ নির্মাণ করেন। এই সব স্থান-গুলিকে তাঁরা পুণ্য-পবিত্র ব'লে মনে করেন এবং সময়ে সময়ে তাঁরা সেগুলিকে দর্শন করতেও যান। ভারতবর্ষে হিন্দুদের ধর্মাদর্শকে গড়ে তোলার জন্য বিদেহী আত্মাদের ওপর বিশ্বাসকে একটা বড় জিনিস ব'লে গণ্য করা হয়।

৩। অধ্যাপক সেয়েস্ ঠিক এই ধরনের পিতৃপুরুষপূজা ও স্যামোনিজম্' বা নিকৃষ্ট শ্রেণীর প্রেতপূজার গোড়াপত্তন আদিম আক্কাডিয়ানদের ভেতর দেখেছিলেন। গ্রীক ও নাইকার-গুযান, প্রাচীন বৃটেন, ডিগার ইণ্ডিয়ান ও আন্দামানের আদিম লোকদের মধ্যেও এই রকমের রীতি দেখা যায়।

আমরা বেদেও পড়েছি যে, শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে পিতৃপুরুষরা আমন্ত্রিত হন উপহার হিসাবে খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করার জন্য।[৪] কোন একটি লোক যখন মারা যায় তার ১৫ দিন কিংবা ৩০ দিন অর্থাৎ একমাস পরে আত্মীয়-স্বজনরা তার আত্মার উদ্দেশ্যে (হিন্দুরা) সৎকর্মানুষ্ঠান ও যাগযজ্ঞ করেন। সে'জন্য তাঁরা গরীবদের খাওয়ান, টাকা-পয়সা দেন ও নানা পুণ্যকর্ম উপলক্ষ্যে অর্থ দান করেন।

নূতনই হোক আর পুরাতনই হোক, প্রেততত্ত্ববাদীদের কল্পিত কোন ধর্মই ব্যাখ্যা করতে পারে না যে, মরণের পর বিদেহী আত্মারা জীবনযাপন করে কি ভাবে। পরলোকের রহস্যকে তাদের কোন ধর্মই প্রকাশ করতে পারে না এবং তাদের বিশ্বাসের বাইরে কোন খবরই তারা দিতে পারে না এইটুকু ছাড়া যে, মরণের পর আমরাও মৃতাত্মাদের সাথে মিলিত হবো, তাদের সংগে বাস করবো ও অনন্তকাল ধরে সেই স্বর্গীয় লোকের ভিতর তাদের সাথে আনন্দ ও সুখ ভোগ করবো। কিন্তু পিতৃপুরুষপূজক ও আধুনিক প্রেততত্ত্ববাদীদের কল্পিত স্বর্গ মোটেই চরমস্থান হিসাবে গণ্য নয়। আসলে তাদের স্বর্গের কল্পনা যেখানে শেষ হয়েছে বলা হয় সেখান থেকেই আরম্ভ হয়েছে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য-বহির্ভূত শাস্তিনিয়ামক 'লোক'।

হিন্দুদের মধ্যে যাঁরা জ্ঞানী ও দিব্যদ্রষ্টা তাঁরা বলেছেন পিতৃপুরুষরা ঐ আত্মানুভূতির স্তরে পৌছুতে পারে না, তারা পরমশুদ্ধ দেবলোকে উপনীত হতে পারে না, এবং বুঝে না সেই পরমসত্য কি, আর সেই সুদর্শন পরম-লোকে তাদের পক্ষে যাওয়া সত্যিই অসম্ভব, ফলে সত্যজ্ঞানের উপদেষ্টা তারা কোনদিনই হতে পারে না। তবে আধুনিক পরলোকতাত্ত্বিকরা বিদেহী পুণ্যাত্মাদের কাছ থেকে পরমবস্তুর জ্ঞান ও অনুভূতি লাভ করতে চেষ্টা করে,

৪। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে হিন্দুরা কুশঘাসের সাহায্যে এক-রকম ব্রাহ্মণের প্রতিকৃতি নির্মাণ করেন তাকে 'দর্ভময়ব্রাহ্মণ' বলে। কুশ-ব্রাহ্মণটি মৃত আত্মার প্রতীক। বৃষোৎসর্গশ্রাদ্ধে বিল্বকাষ্ঠে একটি যুপ তৈরী করা হয়। এই যুপটিকে 'বৃষকাষ্ঠ' বলে। তাতে মানুষের মূর্তিও থাকে, বৃষ, সূর্য প্রভৃতির মূর্তিও খোদাই করা থাকে। শ্রাদ্ধ হ'য়ে গেল বৃষকাষ্ঠটি মৃতের স্মৃতিচিহ্নরূপে কোন একটি স্থানে রক্ষা করা হয়।

তা'ছাড়া কোন লোক বিদেশী দূরাদেশান্তরে মারা গেলে যদি তার মৃতদেহ না পাওয়া যায় তবে তার প্রতিকৃতি হিসাবে 'পর্ণদেহ' বা 'কুশপুত্তলিকা' তৈরী করে সেটিকে দাহ করা হয়। এই কুশপুত্তলিকা ৩৬০টি পলাশ বা শরঘাস দিয়ে তৈরী করতে হয়। পিতৃপুরুষপূজার এটিও একটি নমুনা।

প্রাণপণ যত্নও করে ঐ সব প্রেতাত্মাদের অনুগ্রহ লাভ করার জন্য, যাতে তারা ঈশ্বর, আত্মার সত্যস্বরূপ ও পরমাত্মার সাথে সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছু জানতে ও শিখতে পারে তারও চেষ্টা করে। সত্যকারের ধর্মপ্রতিষ্ঠার যত্ন করলেও তারা ব্যর্থ হয়, কেননা তারা নির্ভর করে বেশীর ভাগ সেই সব নির্বোধ, অজ্ঞ ও ইহলোকের মায়ায় আবদ্ধ প্রেতাত্মাদের ওপর, তাদের প্রেতবৈঠকে আবাহন করে।

আসল কথা এই যে, সেই সব প্রেতাত্মার মাধ্যম হ'ল মিডিয়ম, অর্থাৎ প্রেতাত্মারা মিডিয়মের সাহায্য নিয়েই আসে, কাজেই কেমন করে সত্য, জ্ঞান, আত্মার স্বরূপ এবং যথার্থ আত্মা ও ভগবানের মধ্যে সম্পর্কের কথা বলতে পারবে? যে-কোন প্রেতই অবশ্য মিডিয়মকে নিমন্ত্রণ করতে পারে, কাজেই নিমন্ত্রণকারী প্রেতাত্মারা প্রায়ই অতিসাধারণ স্তরের হয়, তাদের পক্ষে উচ্চতত্ত্বের রহস্যভেদ করা সম্ভব হয় না। আর যদি ধরাই যায় যে, প্রেতবৈঠকগুলি সত্য ও সঠিক বলেই প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু তাহলেও জিজ্ঞাসা করি, এক কৌতূহল-চরিতার্থের আনন্দলাভ ও জীবিকা-উপার্জনের উপায় করা ছাড়া প্রেতাত্মাদের সংস্পর্শে এসে যোগদানকারী প্রেততাত্ত্বিকরা বড় জিনিস আর কি লাভ করেন? এ'ভাবে তাঁরা কি প্রকৃতির যথার্থ স্বরূপ জানতে পেরেছেন? নিজেদের আত্মস্বভাবকেই কি তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছেন? তাঁরা কি সত্যি-সত্যিই বুঝেছেন—কেন তাঁদের পিতৃ-পুরুষেরা স্বর্গে থাকেন ও কতদিন সেখানে অপেক্ষা করেন!

অনেক সময়েই আমি তাঁদের এসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাঁদের উত্তরের ভিত্তি ছিল সাধারণ ঐ সমস্ত ধারণা ও খ্রীষ্টানধর্মের গোঁড়ামীপূর্ণ মতবাদের ওপর—যেগুলো ছেলেবেলা থেকে তারা শিখেছিল ও বিশ্বাস করতো যে, মানুষ ও জীবজন্তুদের আত্মা সৃষ্টি হয় তাদের জন্মের সাথে সাথে এবং মরণের পরেও তাদের সত্তা থাকে, অথচ তারা নরকাগ্নির কথা স্বীকার করে না। তারপর যদিও মানসপ্রত্যক্ষ ও চিন্তাসঞ্চারণ দ্বারা প্রেতাত্মাদের আবির্ভাব ও যোগাযোগ ব্যাপারের অনেক কিছু ব্যাখ্যা করেছে, তবুও তাদের মধ্যে এমন কতকগুলি ঘটনা আছে যা প্রেততত্ত্ববাদ ছাড়া অন্য আর কিছু দিয়ে বিশ্লেষণ করা যাবে না।

অবশ্য ভারতবর্ষে আমরা প্রায়ই আমাদের কোন জানাশোনা বন্ধুকে মিডিয়ম হতে দিই না, কেননা আমাদের মতে এটা একটা রোগবিশেষ।

যদি কেউ একবার মিডিয়মের অবস্থা লাভ করে তো তা থেকে এড়িয়ে ওঠা তার পক্ষে দায় হয়ে উঠে। সকলের জন্যে সাধারণ প্রেতবৈঠক তো আমরা সমর্থন করি না, কেননা পিতৃপুরুষ ও বিদেহী আত্মাদের আমরা যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা করি, তাই তাদের সাহায্যে (বিনিময়ে) বঞ্চিত হ'য়ে অভাব-অভিযোগের দরুন মৃত্যু বরণ করতে পারি, কিন্তু ঐ সমস্ত বিদেহী আত্মাদের পৃথিবীতে টেনে এনে তাঁদের কাছ থেকে সাহায্য ও সহানুভূতি চাইতে মোটেই ইচ্ছা করি না।

হিন্দুরা অবশ্য এই সব দয়ার পাত্র বেচারা প্রেতানুসন্ধিৎসুদের বিশেষ গ্রাহ্য করেন না। তাঁরা মিডিয়মদের কাছে যান না বা সাধারণ সব প্রেতবৈঠকেও যোগদান করেন না, কেননা ছেলেবেলা থেকে এটাই তাঁরা শিক্ষা করেন যে, বৈঠকে যে সমস্ত প্রেতাত্মারা আসে তাদের বেশীর ভাগই অজ্ঞ ও পৃথিবীর মায়ায় আবদ্ধ, সুতরাং তাদের কাছ থেকে আমরা আর কি সাহায্য চাইব, বরং আমাদের কাছ থেকেই তাদের সাহায্য চাওয়া উচিত। তাই হিন্দুরা তাদের সাহায্যের জন্য সচ্চিন্তাযুক্ত প্রার্থনা করেন, তাদের নামের উদ্দেশ্যে নানারকম সৎকাজ করেন, কারণ তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, সে সবের দ্বারাই প্রেতাত্মারা পৃথিবীর ওপর মায়ারূপ বন্ধন থেকে মুক্ত হবে।

বেদান্তের অনুগামীরা আদৌ স্বর্গে যেতে চান না, কারণ, তাঁরা ভালভাবেই জানেন যে, স্বর্গ শাশ্বত নয়, অনন্তকাল ধরে কেউ সেখানে বাস করতে পারে না। স্বর্গও একটা পার্থিব স্তর বা রাজ্যমাত্র, যে কেউ সেখানে সুখভোগ করতে যায় সেখান থেকে সে ফিরে আসতে বাধ্য হয়, তার সঞ্চিত সুপ্ত অতৃপ্ত বাসনাই সেখান থেকে জোর করে তাকে ধরণীতে নামিয়ে নিয়ে আসে। তার অর্থ স্বর্গে সুখভোগ করার সময় আবার পৃথিবীর অতৃপ্ত বাসনা যখন তাদের মনে জেগে ওঠে তখনই তারা মনুষ্যলোকে ফিরে আসে; পূর্বজীবনে যে সমস্ত সদসৎ কাজকর্ম করেছিল ইহলোকে এসে সেই-সবের ফলভোগ হিসাবে আবার কাজকর্ম করতে থাকে, আবার সেইসব কাজেরও তারা ফল পেতে থাকে। এইভাবেই চলতে থাকে চক্রবৎ তাদের অতৃপ্ত জীবনের ধারা।

আসলে বাসনা বা তৃষ্ণাই হল জন্ম ও পুনর্জন্মের কারণ। আজ আমরা যা হয়েছি অতীত জীবনেই ছিল তার ইচ্ছা সুপ্তভাবে। কাজেই আমরাই আমাদের অদৃষ্টের জন্য দায়ী। আমাদের মধ্যে যদি কোন বাসনা থাকে তো তারই অনুযায়ী আমরা ফল লাভ করবো, আর আমরা যাবও তার অনুরূপ

লোকে। যুগ-যুগ ধরে প্রত্যেকটি আত্মা এইভাবে ইহলোক ও পরলোকে যাওয়া আসা করছে। তারা থাকছে অবশ্য স্বর্গ ও পার্থিব জীবনের মাঝামাঝি সমস্ত জায়গায়, তাদের কৃতকর্মের ফল সেখানে ভোগ করে, ভিন্ন ভিন্ন ভোগের স্তরে গিয়ে নিজেদের বিচিত্র বাসনার চরিতার্থ করে এবং বিভিন্ন ফল ও বিভিন্ন কাজের পরিণতিও লাভ করে।

কর্মের এই সুন্দর নিয়মটি আবিষ্কার ক'রে, অর্থাৎ কর্ম করলেই তার ফল আছে এই নিয়মসূত্রটি জেনে, সত্যদর্শী জ্ঞানীরা কর্মভূমি পৃথিবীতে এসেই তাদের চলার পথ শেষ করেননা, তাঁরা পুনর্জন্মচক্রকে অতিক্রম করে যেতে যান এমন একটি দিব্য ও শাশ্বত লোকে যেখান থেকে আর ফিরে আসতে হয় না। তাঁরা পার্থিব সকল স্তর ও এমন কি পিতৃরাজ্যগুলিকেও অতিক্রম করে যান। ভগবদগীতায় ও আছে: সামান্য থেকে শুরু করে উচ্চতম স্বর্গ পর্যন্ত সমস্ত লোকই স্থূল ও অনিত্য। সেখানকার অধিবাসীরাও কার্য-কারণ অথবা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ারূপ নিয়মের অধীন, কেউ এই নিয়ম থেকে মুক্ত নয়। সত্যকে জেনে যিনি সত্যস্বরূপ হতে পেরেছেন, ব্রহ্মকে জেনে যিনি ব্রহ্মস্বরূপ হতে পারেন, একমাত্র তিনিই মায়িক জগতের নিয়মকে ছাড়িয়ে মুক্ত হন।[৫]

মরণের পর প্রেততত্ত্ববাদী ও পিতৃপুরুষরা যে পথ দিয়ে যায় স্বর্গে, তার নাম 'পিতৃযান' অর্থাৎ 'পিতৃপুরুষদের যান', ঐ তাদের অভিলষিত স্বর্গে যাবার পথ।[৬] কিন্তু এ' থেকে আর একটি ভিন্ন পথ আছে—যা নিয়ে যায় আত্মজ্ঞানের দিকে। সংস্কৃত একে বলে 'দেবযান'[৭] দেবতাদের পথ বা দিব্যপথ; অর্থাৎ যে পথ দিয়ে গেলে দেবত্ব, অধ্যাত্মজ্ঞান ও পরমাত্মা লাভ করা যায় (ব্রহ্মানুভূতি হয়)। সৎকাজ ক'রে যে-কেউ স্বর্গে যেতে পারে। কাজেই স্বর্গে যাওয়াটা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে মানুষের ভাল চিন্তা ও

৫। গীতা ৮।১৬

৬। 'পিতৃষ'ন-কে 'ধুমম' বলে। 'ধুমমার্গ' কিনা পিতৃগণের অন্ধকারময় পথ। ছান্দোগ্য বৃহদারণ্যক, কঠোপনিষদ ও অন্যান্য উপনিষদে এবং গীতায়ও এই পিতৃযান বা ধুমমার্গের কথা সুন্দরভাবে উল্লেখ আছে। কিন্তু এ'কথার বীজ পাই আমাদের ঋগ্বেদে। শব-সৎকারের অনুষ্ঠানে যে সব মন্ত্র পাওয়া যায় সেগুলিতে আছে: "পন্থামনপ্রবিশৎ পিতৃযানম্" (৫।২।৭)—অর্থাৎ হে অগ্নি, তুমি আকাশ ও পৃথিবী থেকে জন্মলাভ করেছ। ** তুমি জান সত্যকারের পিতৃলোকের পথ কোনটি। সেখানে তুমি সেই পথ আলোকিত করতে যথেষ্ট উজ্জ্বল হও।

৭। এর বীজও পাওয়া যায় ঋগ্বেদে। একটি মন্ত্র আছে: "পরমমৃত্যো অণুপ্রেহি পন্থাম্ যস্তে স ইতরো দেবযানাৎ" (১০।১৮।১), অর্থাৎ—'হে মৃত্যু তুমি ভিন্ন পথে যাও। যে পথে দবতারা যায় সে পথ ত্যাগ করো (অর্চিরমার্গ) এবং দেবযান ছাড়া অন্য পথ দিয়ে অতিক্রম করো।

সৎকাজের ওপর। তবে এ'কথা সত্য যে, যে রকম পরিমাণই সচ্চিন্তা ও সৎকাজ আমরা করি না কেন, তা সকল চিন্তার পারে—সকল কাজের পারে সত্যকার ভাবে আমাদের নিয়ে যেতে পারে না।

দেবযানের দিব্যপথচারীরা আমাদের দেবত্বের দিকে নিয়ে যান। এই পথচারীরা হলেন একান্ত একনিষ্ঠ ও পরম সত্যানুসন্ধিৎসু। তাঁরা ইহলোক ও পরলোকের কোন-কিছু আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং সাধারণ মানুষের আত্মসূর্য যেমন বাসনারূপ মেঘে আবৃত থাকে, তাঁদের সেরূপ নয়। তাঁরা সকল বাসনার বহু উর্ধ্বে মুক্তভাবে বিচরণ করেন। আধুনিক প্রেততত্ত্ববাদের কতকগুলি প্রত্যক্ষ ঘটনা কোন কোন লোককে সাহায্য ক'রে তাদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য বা তাদের আশান্বিত করে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মরণের পর মিলিত হবার জন্য। কিন্তু এটা হ'ল তাদের অন্তরে এক রকম সান্ত্বনা দেওয়ার ভাব, কারণ তারা চায় পরলোকে মিলিত হতে বিদেহী আত্মাদের সাথে, কিন্তু এইটুকু ছাড়া সত্যানুভূতি বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ তা দিয়ে হয় না। সত্যকারের ধর্মের উদ্দেশ্যই হ'ল আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন করানো এবং প্রত্যেকটি আত্মাকে সচেতন করা সেই মিলনের দিকে এইভাবে যে, তারা পবিত্র ও শাশ্বত এবং সকল বন্ধন সকল সুখশান্তিলাভের আকাঙ্খা ও বাসনা হ'তে তারা সম্পূর্ণ মুক্ত। এই সহানুভূতি যিনি পেয়েছেন তিনি সকল অজ্ঞান ও স্বার্থপরতা এবং সকল রকম অসম্পূর্ণতা অতিক্রম করেছেন। তিনি কখনও জ্ঞানের ভিখারী হয়ে প্রেতাত্মাদের দ্বারে যান না, কিন্তু সকল জ্ঞানের ভাণ্ডার খোঁজেন নিজের অন্তরে। সমস্ত জ্ঞানের উৎস ব্রহ্মসমুদ্রে তিনি উপনীত হন এবং আকণ্ঠ পান করেন অমৃতের বারি। প্রেতাত্মারা সেই দিব্যবস্তু সম্বন্ধে কোন শিক্ষাই কাউকে দিতে পারে না। যিনি অখণ্ড পরমসত্তার সংগে নিজের একত্বকে অনুভব করেছেন, কোন পিতৃপুরুষই আর তাঁকে কোন নতুন-কিছুই শেখাতে পারে না, পরন্তু বিশ্বপিতার মতোই তিনি লাভ করেন পরমপবিত্র আত্মজ্ঞান এবং জীবন্ত ঈশ্বররূপে ধরণীতে প্রতীত হন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

॥ প্রেততাত্ত্বিক মিডিয়মের কাজ ॥

আধুনিক যুগের পরলোকতত্ত্বের চর্চা বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটা নতুন দিক খুলে দিয়েছে ; আর য়ুরোপ ও আমেরিকান নরনারীর ভেতর প্রবলভাবে সৃষ্টি করেছে তাদের পরলোকগত বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের আত্মার সংগে যোগাযোগ স্থাপন করার আগ্রহ ও ইচ্ছা। অনেক নাস্তিক ও অবিশ্বাসী—যাঁরা মরণের পর আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না তাঁরাও এখন প্রত্যক্ষভাবে বিদেহী আত্মাদের সাথে সংযোগ স্থাপন ক'রে ভবিষ্যৎ জীবন অর্থাৎ মরণের পরও যে আত্মার সত্তা থাকে সে-সম্বন্ধে কিছু সত্যের আভাষ পেয়েছেন। তাঁরা এখন জেনেছেন যে, দেহের মরণে আত্মার মরণ হয় না, আত্মা মৃত্যুর পরও থাকে, আর মৃত্যুর পরপারে সেই স্বপ্নময় বিস্ময়কর একটা দেশ বা স্থান যেখানে বিদেহীদের আত্মারা যায়, থাকে ও সাথে সাথে সঞ্চয় করে তাদের নতুন অভিজ্ঞতা ও নতুন সুখ-শান্তি।

আগেই বলেছি যে, আধুনিক প্রেততত্ত্ববাদ খ্রীষ্টানদের নরকাগ্নিবাদ, তাদের অন্যান্য ধর্মমত ও বিশেষ ক'রে তাদের মতবাদ : মরণের পর মানুষের আত্মা অনন্তকাল ধরে দুঃখকষ্ট ভোগ করতে বাধ্য—এ' সবের বিরুদ্ধে চরম আঘাত দিয়েছে। প্রেততত্ত্বের মারফৎ আমরা বরং এ তথ্য জানতে পারি যে, বিদেহী বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনদের আত্মারা উৎকণ্ঠিত থাকে সংবাদ দিতে যে, তারা সুখেই আছে, আমাদের কাজ-কর্মব্যাপারে তাদের প্রবল আগ্রহ থাকে, তারা সদুপদেশ দেবার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত ও দূরাগত যে সমস্ত বিপদ-আপদ ও বিপত্তি আমাদের ভয়ের কারণ হয়ে থাকে তা হতে রক্ষা করতেও সর্বদা সচেষ্ট থাকে। প্রেততত্ত্ববাদীরা মিডিয়ম হওয়ার উপযোগী অবস্থাগুলির উন্নতি সাধন করে এবং তাদের পরলোকগত বন্ধুবান্ধবদের সাথে যোগাযোগ রাখার দরুন এগুলি ও আরো অনেক এই ধরনের বিশ্বাস ও ধারণাগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করে। অবশ্য মিডিয়ম হবার অভ্যাস কি করে বাড়াতে হয় তা আমরা অনেকেই জানি। মিডিয়ম যারা হ'তে ইচ্ছা করে তারা এমন সব বন্ধুবান্ধবদের সংগে মিশতে চায় যাদের ভেতর ঐ মিডিয়ম হবার ইচ্ছা থাকে। তারা যে একটি বৈঠক তৈরী করে তার নাম 'মিডিয়মগঠক-বৈঠক' (ডেভেলপিঙ

সার্কেল)। অপরাপর মিডিয়ম বা প্রেতাত্মা-নিয়ন্ত্রণকারীরা তাঁদের এমন একটি নির্দিষ্ট ঘর বেছে নিতে বলেন যেখানে অন্তত সপ্তাহে একবারও তাঁরা বৈঠকে বসতে পারে। বৈঠকও আহ্বান করতে হয় একটি নির্দিষ্ট সময়ে, কেননা আমরা যেমন ইহজগতে নানা কাজকর্মে ব্যস্ত থাকি, পরলোকের বিদেহী আত্মারাও তেমনি অনবরত কর্তব্য কাজে লিপ্ত থাকতে বাধ্য হয়। তাই এই জগতের স্তরে আসতে গেলে ও ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে (প্রেতবৈঠকে যোগদান ক'রে বৈঠকের কাজে সাহায্য করতে হলে তাদের আগে একটা সময় ঠিক করে নিতে হয়। ঘরটির পরিবেশ প্রেততত্ত্বানুশীলনের উপযোগী করে নিতে অন্ততপক্ষে পাঁচটি কিংবা ছ'টি বৈঠক-আহ্বানের দরকার। ঘরটির পরিবেশ পুরোপুরি অনুকূল হলেই মিডিয়মের কাজকর্ম আরম্ভ হয়। বৈঠকটি একবারে অন্ধকার ঘরে করতে হয়। একজন আলোকচিত্রশিল্পীর পক্ষে যেমন অন্ধকার ঘর দরকার তার তোলা ছবির প্লেট (পরকোলা) থেকে ফটো ছাপার জন্য, যিনি মিডিয়ম হ'তে চান তাঁর পক্ষেও ঠিক তেমনি। মনে রাখা উচিত যে, মিডিয়ম হবার ভাবটি হল একজন মানুষের দেহ ও মনের স্থির তন্দ্রাবিষ্ট অবস্থা (নেগেটিভ কন্‌ডিশন)।[১] বৈঠকে যাঁরা বসেন এই অবস্থাটা সহজে তাঁদের আসতে পারে যে সময়ে তাঁরা কোন রকম চিন্তা না করে মনকে শূন্য অবস্থায় রাখেন, অর্থাৎ এমনই অবস্থায় রাখেন যাতে করে মন অপেক্ষা করতে থাকে কোন-কিছুকে গ্রহণ করার জন্য (রিসেপ্‌টিভ এ্যাটিটিউড)। বৈঠক-ঘরটি আলোকবিহীন অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ায় কোন রকম জড় জিনিস দেখার আর সুযোগ-সুবিধা হয় না, আর সেজন্যই ইন্দ্রিয়ের কাজগুলিকে স্তব্ধ করে দিতে স্বভাবত সাহায্য করে ও তাদের সম্পূর্ণ একটি অচল অবস্থায় এনে দেয়। এইসব কাজে মিষ্টি গান খুব সাহায্য করে। বৈঠকে যাঁরা বসবেন তাঁরা নিজেরা কিন্তু কোন গান করবেন না, কেননা গান করতে গেলেই সচেতন মন চাই ও সাথে সাথে মনে ক্রিয়া বা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হবে। বৈঠকে যোগদান-কারীদের মধ্যে যাঁরা সহজে সব চিন্তাকে দূর করে মনকে খালি (ব্ল্যাঙ্ক) করতে পারেন না তাদের বাদ দিয়ে তার পরিবর্তে নিতে হবে সেইসব লোকেদের যাঁরা তা পারেন। বৈঠকে যোগদানকারী কোন-কিছুই চিন্তা করবেন না, মনে কোন রকম প্রশ্ন তোলারও চেষ্টা করবেন না, বরং তাঁদের অদৃশ্য প্রেতনিয়ন্তার ইচ্ছাশক্তির হাতে নিজেদের ইচ্ছাকে ছেড়ে দেবেন এবং

১। সেই সময়ে দেহ ও মনের কোন কাজ থাকে না, স্থিরভাবে তন্দ্রাবেশের মত থাকে।

প্রেতাহ্বানের ব্যাপারে কি আশ্চর্য ফল ফলে তার জন্য স্থিরভাবে অপেক্ষা করবেন।

মিডিয়ম হওয়ার কাজে সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়—যদি বৈঠকে যোগদানকারীরা তাঁদের প্রেত-নিয়ন্ত্রণকারীদের ইচ্ছার ওপর নিজেদের দেহ, মন ও ইচ্ছাকে সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দেন। ক্রমে ক্রমে প্রেতশক্তি মিডিয়মের ইচ্ছা, ইচ্ছাকৃত শক্তি ও ইন্দ্রিয়গুলির ওপর প্রভাব বিস্তার ক'রে তাদের আয়ত্তে আনে। অবশ্য এই কর্তৃত্ব আংশিক কিংবা পূর্ণ উভয় রকমেই হতে পারে। আংশিক কর্তৃত্ব মস্তিষ্কের কোন একটি অংশের ওপর কিংবা নির্দিষ্ট ইন্দ্রিয় বা স্নায়ুকেন্দ্রে বা কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অথবা দেহের মাংসপেশীতে হয়। আংশিক কর্তৃত্বকে সাধারণ দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ একটি সচেতন ও অপরটি অচেতন। আবার প্রত্যেকটি পরিবেশ অনুযারী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হতে পারে। এমন সব অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোক এদেশে আছেন যাঁদের কতক মানসিক ক্রিয়াকলাপ আংশিকভাবে বাইরের কোন প্রেতশক্তির আয়ত্তে আছে; তাদের কাছ থেকে তাঁরা মাঝে মাঝে কোন সংস্কার বা ইঙ্গিতের আকারে সংবাদ পেয়ে থাকেন, তাদের সম্বন্ধে হয়তো তাঁরা কোন কিছুই জানেন না, কিন্তু তাই বলে তাঁদের শরীরের বা পারিপার্শ্বিক কোন অবস্থায় জ্ঞান বা চেতনা তাঁরা হারান না। এই সচেতন ও সংস্কারযুক্ত মিডিয়মের ভিতর কোন কোন ব্যক্তি হয়তো এমন সব জিনিসের বিষয় বলেন বা লেখেন যেগুলির সম্বন্ধে তাঁরা হয়তো কিছু জানেনও না বোঝেনও না। এই শ্রেণীর কতক লোক অনুপ্রেরক বক্তা ও লেখক হিসাবে পরিচিত। অপর শ্রেণীর মিডিয়ম আবার বাইরের কোন প্রেতাবেশ বা প্রেতশক্তির প্রভাব সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারে না, অথচ তাদের মন আংশিকভাবে প্রেতশক্তির দ্বারা আচ্ছন্ন হয়। তারা কথা কয় ও লেখে কিন্তু জানে না তারা কোন্ শক্তির বশীভূত হয়ে আছে। কতকগুলি মিডিয়ম আবার বলার বা লেখার সময় আংশিকভাবে দেহ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে একেবারে অচেতন থাকে। মাংসপেশী ও স্নায়ুকেন্দ্রের ওপর আংশিক কর্তৃত্ব দিয়েই মিডিয়মের কাজ যে নানাভাবে বিভক্ত তা বুঝা যায়। প্ল্যানচেটে-লিখন, ওজাবোর্ড-নিয়ন্ত্রণ, স্বয়ংলিখন, শব্দ-প্রেরণ প্রভৃতি মিডিয়মের পৈশিক ও স্নায়ুবিক বিভিন্ন শক্তিরই বিকাশ ছাড়া অন্য কিছু নয়। যখন কোন প্রেতাত্মা বাহুর পেশীর ওপর নিয়ন্ত্রণ চালায় তখন মিডিয়ম ভারি ভারি জিনিস নাড়াচাড়া করতে পারে। যখন চোখের

স্নায়ুতন্ত্রী ও দৃষ্টিশক্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ চালায় তখন মিডিয়ম নানা রকমের ছবি বা প্রতিকৃতি দেখে, সেগুলি প্রেতনিয়ন্ত্রিণকারীদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে তাদের জ্ঞানে প্রতিফলিত হয়। সে রকম কর্ণ ও শ্রবণেন্দ্রিয় যখন প্রেতাত্মা-কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় তখন মিডিয়মরা এখন সব শব্দ শুনতে পায় যেগুলো প্রেতাত্মা শুনতে ইচ্ছা করে। এইরকমভাবে মিডিয়মের ঘ্রাণ, স্বাদ বা স্পর্শ যে কোন ইন্দ্রিয়কে প্রেতাত্মারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তবে এই নিয়ন্ত্রণরীতি কোন কোন মিডিয়ম জানতে পারে, কেউ বা পারে না। আংশিক নিয়ন্ত্রণ ব্যাপার আবার পূর্ণ-নিয়ন্ত্রণে পরিণত হতে পারে যদি নিত্যনিয়মিতভাবে প্রেত-আহ্বাহক বৈঠকে বসে মিডিয়ম হবার কেউ চেষ্টা করে। অবশ্য মিডিয়মের দেহ-মনের ওপর প্রেতের পূর্ণ-আবেশ তখনই সম্ভব হয় যখন সে অচৈতন্য হয়ে পড়ে যা অচেতন অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ে। এই ধরণের বিকাশ নানা রকমের ও বিশেষ চিত্তাকর্ষকও হয়, কেননা এই শ্রেণীর মিডিয়ম হওয়ার কার্যক্রম একটু রহস্যপূর্ণ। এ রকম প্রণালীতে মিডিয়ম সাধারণত গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে সম্মোহন-ঘুমের মতো। সেই অবস্থায় যা-কিছু ঘটুক না কেন মিডিয়ম কিছুই জানতে পারে না! তখন প্রেত-নিয়ন্ত্রণকারীর পূর্ণ-প্রভাব মিডিয়মের দেহের ইন্দ্রিয়গুলোর ওপর দেখা যায়। প্রেতাত্মারা ইচ্ছানুযায়ী মিডিয়মের বাক্‌যন্ত্র বা যে-কোন ইন্দ্রিয়ের ওপর কর্তৃত্ব করতে পারে। মিডিয়মের নিজের সকল রকম ইচ্ছা ও শক্তি তখন রুদ্ধ হয়ে যায়। মিডিয়মের দেহকে আশ্রয় করে তখন প্রেতাত্মারা কথা কওয়া কিংবা যে কোন রকমের কাজই করতে পারে, অথচ মিডিয়ম তার কোন-কিছুই জান্‌তে পারে না, কিংবা তার কোন রেখাপাতই করবে না মিডিয়মের মনে। নিয়ন্ত্রণকারীর ইচ্ছাশক্তি ও ইঙ্গিতের সম্পূর্ণ অধীন হয়ে সম্মোহনী-নিদ্রায় আচ্ছন্ন অবস্থায় মানুষ-যেমন কথা কয়, খায়, বা নাচে কিংবা অন্য কিছু করে, অথচ স্বাভাবিক জ্ঞানের অবস্থায় ফিরে এসে তাদের কোনটার বিষয়ই কিছু স্মরণে আনতে পারে না, ঠিক সেই রকম তন্দ্রাচ্ছন্ন মিডিয়মও প্রেতাবিষ্ট হয়ে অজ্ঞানের অবস্থায় বৈঠকে কি করেছিল তার কিছুই মনে করতে পারে না।

প্রত্যেক দেশেই প্রেততত্ত্ব অনুশীলকদের ভেতরে এই ধরণের অনেক নিদ্রাবিষ্ট মিডিয়ম দেখা যায়। এইরকম মিডিয়ম হওয়ার অভ্যাস থেকেই ক্রমশ মিডিয়মকে অবলম্বন ক'রে প্রেতাত্মাদের বাস্তব বা পার্থিব শরীর নিয়ে

আত্মপ্রকাশ করার কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে।[২] এ অবস্থায় মিডিয়ম গভীর তন্দ্রায় আবিষ্ট হয়। প্রেতনিয়ন্ত্রণকারীদের মধ্যে যারা জড়দেহ ধারণ করার ব্যাপারে বিশেষ দক্ষ ও পারদর্শী, অর্থাৎ মিডিয়মের দেহকে আশ্রয় করে দেহ-ধারণের কৌশল যে'সব প্রেতাত্মা জানে তাদের কাছেই ঐ রহস্যপূর্ণ সমস্ত কাজ বেশ ধরা পড়ে। তারা মিডিয়মের জড়-দেহ ও মন থেকে শক্তি আহরণও করতে পারে। বাইরের বিচিত্র রকমের উপাদান দেহজাত তেজোময় পদার্থের[৩] সংগে ঐ আন্তর শক্তির মিশ্রণের প্রণালীও তারা জানে, কাজেই এমন একটি পদার্থ (জড়দেহ) তারা সৃষ্টি করে যা বৈঠকে যোগদানকারী সকলেই দেখ্‌তে পায়।

অবশ্য বিদেহী প্রেতাত্মাদের জড়দেহ-ধারণব্যাপারে অনেক মিথ্যা প্রতারণাও য়ুরোপ আমেরিকায় ধরা পড়েছে। কিন্তু এমন সব সত্যিকারের ঘটনাও আছে যা আমি নিজের চোখে ওদেশে (পাশ্চাত্যে) প্রত্যক্ষ করেছি এবং সুযোগ অনুযায়ী সেই সেই সময়ে ভাল করে পরীক্ষা করেও দেখেছি। এমনও হয়েছে যে, প্রেতবৈঠকের ভেতরে আমাকে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, আমি গেছি এবং অনুভব করেছি যে, অন্তত প্রেতাত্মাদের কুড়িটা হাত আমার পিঠের ওপর, অর্থাৎ কুড়িটা বিদেহীদের হাত আমার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করছে। কেউ কেউ আমার জামার কলার কিংবা পকেট ধরে টানছে, অথবা একই সংগে অনেকগুলো হাত আমার পিঠে দিয়েছে। এ'সব আমি স্পষ্টভাবে অনুভব করেছি। তারপর একজন প্রেতাত্মা হয়তো আমায়

২। একে বলে মেটিরিয়ালাইজিং মিডিয়মশিপ। বিদেহী আত্মারা ঐরকম করেই মিডিয়মের দেহকে আশ্রয় করে, তাদের দেহ থেকে দেহ ধারণ করার মতো উপাদান সংগ্রহ করে এবং পার্থিব শরীর নিয়ে আত্মীয়-স্বজনদের দেখা দিতে পারে। মিডিয়মরাই সেই শরীর ধারণের উপায় বা মাধ্যম স্বরূপ।

৩। দেহজাত ঐ তেজোময় পদার্থকে প্রেততত্ত্ববাদীরা 'একটোপ্লাজম' বলেন। স্যার আর্থার ক্যানোন্ ডয়েল বলেছেন : *** সাক্ষ্য পাই যে, কতগুলি লোককে তারা প্রেতাত্মার পার্থিব শরীর-ধারণের-সহায়ক 'মিডিয়ম' বলেন। তাঁদের মধ্যে অনেক অসাধারণ শারীরিক শক্তির বিকাশ দেখা যায়। দেহ থেকে তাঁরা আংশিক তরল ও স্বাদহীন একরকম স্বচ্ছ পদার্থ নিসৃত করতে পারেন। যে কোন জড়পদার্থ থেকে সেই তরল বাষ্পীয় পদার্থটি দেখতে সম্পূর্ণ পৃথক, অথচ তা আবার জড় আকার ধারণ করতে পারে, দেহ থেকে নির্গত ও অন্তপ্রবিষ্ট হয়, কিন্তু কাপড়ে কোন দাগ হয় না। সেই বাষ্পীয় তরল অর্থাৎ ধোঁয়ার মতো পদার্থটিকে একজন উদ্যমশীল গবেষক আবিষ্কৃত করেন। তিনি পরীক্ষা করে বলেছেন সেটি একরকম নমনীয় পদার্থ, ইচ্ছা করলে তাকে রবারের মতো বাড়ানো-কমানো যায়, অথচ বেশ সচেতন বলে মনে হয়। সেটিকে যেন মিডিয়মের দেহ থেকে নির্গত কোন পদার্থ বলেই মনে হয়। সেই পদার্থকেই 'একটোপ্লাজম্' বলে।

জিজ্ঞাসা করলো : 'আপনি কি মনে করেন যে, মিডিয়মই এই সব ব্যাপার করছে ?' প্রেত-বৈঠকের ঘরটা একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢাকা ছিল, যদিও ঘরের কোণে কাঠের বাক্সে ঢাকা একটা আলো মিটমিট ক'রে জ্বলছিল। আবার সেই একই গলার শব্দ এলো : 'আপনি মিডিয়মের গায়ে হাত দিন তো।' আমি দেবার আগেই দেখি সেই প্রেতাত্মা আমার হাতটা ধ'রে মিডিয়মের গায়ে স্পর্শ করালো। আমি স্পর্শ করে দেখলাম মিডিয়মের সমস্ত দেহটা একেবারে শক্ত মড়ার মতো অর্ধশায়িত অবস্থায় রয়েছে। তার হাতদুটি শক্ত করে ফিতা দিয়ে বাঁধা ছিল। আমি যে প্রেতের হাতটা ধরেছিলাম সেটা ছিল একজন আমেরিকান নিগ্রোর। ধরার একটু পরেই সেই হাতটা আবার আমার হাতের মধ্যেই গলে বাতাসে মিলিয়ে গেল। তাছাড়া একেবারে চাক্ষুষভাবে আমি দেখেছি আমার কলকাতার একজন বন্ধুর মৃতাত্মার জড়দেহ-ধারণ।[৪]

প্রেতাত্মাদের এই যে পার্থিব দেহধারণের রহস্য এটা খুব কম লোকেই বোঝেন।[৫] প্রত্যেক দেশেই এ'ধরনের অনেক ঘটনাই দেখা গেছে—যেখানে প্রেতাত্মারা মিডিয়মদের কোন রকম সাহায্য না নিয়েই পার্থিব শরীর (ইহলোকের পূর্বশরীর) ধারণ করতে পারে। তবে প্রেতবৈঠকে বিদেহীদের দেহধারণ-ব্যাপারে যেসব ঘটে তাতে প্রধানভাবে সহায়ক মিডিয়মরা ও বৈঠকে যোগদানকারীদের আত্মিক ও আকর্ষণ শক্তি। আমি মিডিয়মদের সংগে কথাবার্তা কয়েছি এবং বৈঠকের পর তাঁরা কি রকম অনুভব করেন একথাও জিজ্ঞাসা ক'রে দেখেছি। সমস্ত মিডিয়ম ঠিক এইভাবে আমার প্রশ্নের জবাব দিয়েছে যে, বৈঠক শেষ হবার পর তাঁরা অনুভব করেন তাঁদের সর্বদেহ যেন খালি বা ফাঁকা হ'য়ে গেছে, কোন রকম জীবনের চিহ্ন বা শক্তিই যেন তাঁদের শরীরে থাকে না তাঁদের শরীর ও মন থেকে সব-কিছুই

৪। আমরা আগেই কলিকাতা বাগবাজারনিবাসী বলরাম বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি প্রেতমূর্তির উল্লেখ করেছি।

৫। বি, ভি. ক্রেনক্ নটজিঙ তাঁর 'ফেনোমেনা অব মেটিরিয়লাইজেশন'-গ্রন্থে (পৃ ২৮২) উল্লেখ করেছেন : "এই প্রেতাত্মারা পার্থিব জড়শরীর ধারণ করতে পারে, এর দুটো কারণ আছে। তাদের মধ্যে একটা হল : মিডিয়মের দেহ থেকে স্বভাবতই একটা বাষ্পের মতো জিনিস নির্গত হতে থাকে এবং তাই তাদের আকার, গঠন ও চেতন ইন্দ্রিয়গুলোকে গড়ে তোলায় সাহায্য করে। ** কিন্তু ঐ ধারণা করার ব্যাপারে যে-কোন নিয়ম ও শক্তিই সাহায্য করুক না কেন মিডিয়মের আত্মা দেহধারণের প্রধান নিয়ন্তা বা অন্তত কারণবিশেষ

বার ক'রে নেওয়া হয়েছে। প্রকৃতই বৈঠকের পর তাঁরা সজাগ ও সচেতন হন সত্য কিন্তু কোন রকম চিন্তা বা মানসিক কাজ কিছুই করতে পারেন না। এটা কি খুবই তাঁদের পক্ষে শোচনীয় অবস্থা নয়? নিঃসংশয়েই এই সব মিডিয়মদের আত্মহত্যাকারী বললেও অত্যুক্তি হয় না। অজ্ঞতার জন্যই তাঁরা প্রেতশক্তির কাছে নিজেদের প্রাণশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি বলিদান দেন, ফলে দাঁড়ায় এই—দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক সকল রকম শক্তিই তাঁদের নষ্ট হয়, এমন কি আত্মার অর্থাৎ নিজের ক্রমোন্নতি ও বিকাশের পথও তাঁদের রুদ্ধ হয়ে যায়। আরও অন্য রকম অবস্থার প্রেতাবিষ্ট মিডিয়ম দেখা যায়: অংকনরত মিডিয়ম, ট্রাম্পেট্‌বাদক মিডিয়ম ও স্বাধীনভাবে শ্লেটে লিখনরত মিডিয়ম প্রভৃতি। তাছাড়া আর এক রকম নিয়ন্ত্রিত মিডিয়ম আছেন যাঁদের আগেকার সময় বলা হত 'আবিষ্ট' বা 'কোন দুষ্ট প্রেত আত্মা-কর্তৃক অধিকৃত' মিডিয়ম। কিন্তু চিকিৎসকেরা এখন এ'ধরনের মিডিয়মদের উন্মাদ বলে গণ্য করে থাকেন।

এ'সকল এবং আরও অনেক রকমের যে মিডিয়মের কথা বলা হয়েছে তাঁদের সকল ঘটনা প্রমাণিত ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষিত হয়েছে। তাঁদের ঘটনাগুলিকে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করার জন্য নানা রকমের মতবাদও সৃষ্টি হয়েছে।[৬] কিন্তু প্রেততত্ত্ববাদ ছাড়া আর সব বেশীর ভাগ মতবাদকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করার পক্ষে কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

বেশীর ভাগ লোকেই যাঁরা প্রেততত্ত্বানুশীলনের সংগে পরিচিত তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, পরলোকের বিদেহী আত্মারা ইহলোকের মানুষের সংগে মেলামেশা বা তাদের সংগে সংবাদ আদান-প্রদান করতে পারে;

৬। ভন্‌ নটজিঙ বলেছেন: মিডিয়মের কাজে বাইরে সাধারণত যা প্রকাশ পায়—দুটি প্রধান বিভাগে ভাগ করা যায়। 'টেলিকাইনেটিক ফেনোমেনা' ও টেলিপ্লাসটিক ফেনোমেনা'।

(ক) 'টেলিকাইনেটিক ফেনোমেনা' হ'ল কোন রকম সাহায্য ছাড়া অচেতন জড়পদার্থের ওপর প্রভাববিস্তার, যেমন কোন জিনিসকে নাড়াচাড়া করা বা সরানো, টেবিলকে এদিকে ওদিকে আকর্ষণ করা, কোন জিনিসকে শূন্যে তুলে রাখা, মশারীকে দোলানো, কোন যন্ত্রকে সরানো, কোন গানের সুর, ভাঁজা বা দূরে কোন শব্দ করা যেমন, ঘড় ঘড় বা খস্‌ খস্‌ শব্দ যা কানে শোনা যায়। সোজাসুজি বাদ্যযন্ত্র বাজানো; কোন-কিছু লেখা প্রভৃতি।

(খ) 'টেলিপ্লাসটিক ফেনোমেনা হল প্রেতাত্মাদের কাজ, যেমন চেতনা বা অচেতন দেহ সৃষ্টি করা। মিডিয়ম হয়তো মনে. কিছু একটা ভাবলে বা কল্পনা করলে, তৎক্ষণাৎ সেটাকে বাস্তব আকারে পরিণত করা। কিংবা মিডিয়ম ছাড়া প্রেতাত্মার ইচ্ছাশক্তি অনুসারে কোন-কিছু গড়ে তোলা (—'ফেনোমেনা অব মেটিরিয়ালাইজেশন পৃঃ ১৩)।

নিজেদের পার্থিব শরীর তৈরী করতে পারে ও চিত্তাকর্ষক অনেক-কিছু কাজ সম্পাদন করে। এখন প্রশ্ন ওঠে যে, ঐ সকল কাজ কর্মের দ্বারা মিডিয়মের কল্যাণ সাধন হয় বা শক্তি বাড়ে কিনা? ঐ সব সাহায্যের দ্বারা সত্যিকারের মিডিয়ম হওয়া উচিত কিনা, কিংবা যে সব প্রেততত্ত্ববাদীরা মিডিয়ম হবার শক্তি অর্জন করতে চান তাঁদের আমরা উৎসাহ দেব কিনা? আমরা আগেই বলেছি যে, মিডিয়ম হওয়া মানেই দেহ ও মনকে শূন্য ক'রে অপর শক্তির কাছে বিলিয়ে দেওয়া।[৭]

কোন লোক যদি তার নিজের কর্তৃত্ব মনের ওপর রেখে দেয় তবে ভালো একজন মিডিয়ম হওয়া তার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই এই প্রকৃতির লোকেদের মিডিয়ম হবার শক্তির বিকাশ হয় না। একথা সত্য যে, এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা মিডিয়ম হবার স্বভাব নিয়েই জন্মেছেন, স্বভাবতই তাঁদের প্রকৃতি কোন-কিছুকে বাধা দিতে চায় না, আর তাই জীবিতই হোক আর বিদেহী আত্মাই হোক তাদের অধীনে নিজেকে তাঁরা সহজে ছেড়ে দিতে পারেন। মিডিয়ম হবার শক্তি বল্‌তে বুঝায় না তা কোন-কিছু এক দেবতার দান বা পৃথক কোন একটা প্রতিভা অথবা অস্বাভাবিক উচ্চ অধ্যাত্ম চেতনার কোন শক্তি। আর যদিই এ'ধরনের কোন-কিছু কেউ ভাবে তো সে ভুল করবে। সত্যিকারভাবে বলতে কি—'বিকাশ' এই শব্দটি মিডিয়ম হওয়ার কাজ-সম্পর্কে ব্যবহৃত হওয়া উচিত নয়, কেননা 'মিডিয়ম হওয়া'-র মানে হ'ল দেহ ও মনকে কোন কিছু একটা শক্তির অধীনে থাকবার মতো ক'রে তৈরী করা, কোন একটা বাইরের ভৌতিক শক্তি যা মিডিয়মের দেহকে নিয়ন্ত্রণ করে তার কাছে নিজের ইচ্ছাশক্তিকে সঁপে দেওয়া, আর 'বিকাশ' বলতে বুঝায় আমাদের মধ্যে যে শক্তি সুপ্ত রয়েছে তাকে স্বাভাবিকভাবে অভিব্যক্তিধারার ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে জাগ্রত ক'রে তোলা।

অবশ্য শেষের যে নিয়ম সেটি হল গঠনমূলক আর আগেরটি ধ্বংসমূলক। কোন মিডিয়ম অর্ধ কিংবা পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থার ভেতর থাকলে সে তার নিজের এমন কোন শক্তির বিকাশসাধন করতে পারে না যাকে 'দান' বা 'প্রেরণা' বলা যেতে পারে। মিডিয়মকে যে তার কাজে প্রেরণা যোগায় সেটা কিন্তু

৭। মিডিয়মের শরীর ও মনের ওপর তাঁর নিজের কোন কর্তৃত্ব থাকে না,' প্রেতাত্মার' নিয়ন্ত্রণ শক্তিরই তিনি বশীভূত হন। তখন দেহ ও মন হয় যেন যন্ত্র আর যন্ত্রী বা বা চালক হয় প্রেতাত্মা।

তার নিজের কোন শক্তি নয়, বরং তার ইচ্ছা ও বুদ্ধিশক্তি আচ্ছন্ন হয়েই পড়ে এবং তার দেহ ও মনকে নিয়ন্ত্রণ করছে যে প্রেতাত্মা তার ইচ্ছার ওপরই মিডিয়ম সম্পূর্ণভাবে আত্মবিক্রয় করে। অবশ্য এটা যেন প্রেতাত্মা'র কাছে মিডিয়মের দান বা আত্মনিবেদন করা বোঝায়, একে ঠিক ঠিক 'বিকাশ' বলা যায় না।

কোন মিডিয়ম যদি তাঁর দেহ ও মনকে সম্পূর্ণভাবে নেতি বা ইতিবাচক অবস্থায় রাখতে পারেন তবে যে সব প্রেতাত্মা ইহলোকের মায়ায় আবদ্ধ তিনি তাদের আবেষ্টনী শক্তির অধীন হয়ে পড়েন, কেননা ঐ সকল বিদেহী আত্মারা ক্রমাগতই সুযোগ-সুবিধা খুঁজতে থাকে—কিভাবে কাকে আয়ত্তাধীনে এনে তাকে বন্দী করবে, অর্থাৎ তাকে বা সেই মিডিয়মকে সহায় করেই সে ভোগের ক্ষেত্রে ধরণীতে এসে হাজির হয়। আর হয়ও তাই, কারণ মিডিয়মরা অজ্ঞতাবশতঃ যখন তাঁদের প্রেতাবতরণ-পথটিকে খুলে রাখেন তখনই ইহলোকের প্রতি আসক্ত প্রেতাত্মাদের ইচ্ছা দ্বারা প্রভাবিত হন। এমনও আমরা দেখেছি যে, একটিমাত্র বৈঠকে একজন মিডিয়মকে আশ্রয় ক'রেই অসংখ্য প্রেতাত্মা ইহলোকের স্তরে আসার জন্য ভিড় করে। ইহলোকে আসার জন্য তাদের কতই না আগ্রহ! তাই একবার যদি মিডিয়ম তাঁর মধ্যে প্রেতাবতরণের পথটি খুলে রাখেন—তো কতো সব অজ্ঞাত আকাশচারী প্রেতাত্মাদের আসার ভিড়কে তখন বন্ধ করা শক্ত হয়ে পড়ে, আর তাতে হয় কি—অসহায় নির্বোধ মিডিয়মদের ঐসব প্রেতাত্মাদের প্রভাব ও অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করা দায় হয়ে ওঠে। প্রেতাত্মারা যে মিডিয়মের প্রাণশক্তিরও ক্ষয় সাধন করে তা থেকে তাঁদের বাঁচানো যায় না। আমি কয়েকজন লোকের এমন সব ঘটনা জানি—যাঁরা এক সময় মিডিয়ম ছিলেন কিন্তু এখন ভিন্ন ভিন্ন প্রেতাবেশ ও উৎপাত-উপদ্রব থেকে তাঁরা কষ্ট পাচ্ছেন ক্রমাগত চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁদের দমন করতে পারছেন না। কাজেই কোন রকম অবস্থাতেই মিডিয়ম হওয়ার অভ্যাসটা বাঞ্ছনীয় নয়। শুধু তাই নয়, নিজের ইচ্ছা আর একজনের কাছে সঁপে দেওয়া ও নিজের দেহ-মনকে ইহলোকের মায়ায় আসক্ত বিদেহী প্রেতাত্মাদের খামখেয়ালের ওপর ছেড়ে দেওয়াটাও কল্যাণকর নয়। অনেক মিডিয়ম আছেন যাঁরা এই ধারণায় প্রলুব্ধ যে, যদি তাঁরা ঐভাবে অভ্যাস করেন তবে দূরদর্শন, দূরশ্রবণ বা ভবিষ্যতে যেসব ঘটনা ঘটবে সে সম্বন্ধে জানার শক্তি তাঁদের বাড়বে। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে

মিডিয়মের আত্মসমর্পণ প্রণালীর মাধ্যমে দূরদর্শন ও দূরশ্রবণ প্রভৃতি যে-সব শক্তি তাঁরা লাভ করেন তাঁরা যোগসাধনায় লব্ধ শক্তির মতো ইচ্ছা করলেই প্রয়োগ করতে পারেন না। কেননা তাঁরা মাত্র সেই সব জিনিসই দেখতে শুনতে পান যেগুলি তাঁদের নিয়ন্ত্রণকারী প্রেতাত্মা দেখ্‌তে ও শুন্‌তে ইচ্ছা করে; অর্থাৎ তাঁদের দেখাশোনা নির্ভর করে নিয়ন্ত্রণকারী প্রেতাত্মাদের খামখেয়ালের ওপর। তাই সম্মোহন প্রভৃতি কাজ যেমন পুরোপুরি অপারেটার বা নিয়ন্ত্রণ-কারীর ইচ্ছা ও ইংগিতের ওপর নির্ভর করে, তেমনি তাঁরা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্তা প্রেতাত্মাদের অনুগ্রহের অধীন হয়ে থাকেন। আর এটা খুবই সত্য ঘটনা যে মিডিয়মরা ক্রমশ তাঁদের আত্মসংযম শক্তিও হারিয়ে ফেলেন, নিজেদের ওপর কর্তৃত্বশক্তি ধীরে ধীরে লোপ পেতেই থাকে। ক্রমশ তাঁদের ইন্দ্রিয়-শৈথিল্য দেখা দেয়, আর তাই থেকেই কখনো কখনো স্নায়ুতন্ত্রী সব শিথিল ও অকেজো হয়ে যায়। নানা রকমের মাথার অসুখ—যেমন জীবনীশক্তির হ্রাস পাশব আসক্তি, স্থায়ী উন্মাদ রোগ প্রভৃতিও দেখা দেয়, ফলে নানা ক্ষতিকর উপসর্গের আমদানী হয়ে মিডিয়মদের আয়ুষ্কালও কমে যায়।

কাজেই একজন ভালো মিডিয়ম হওয়া মানেই তাঁর মানসিক অবস্থার শোচনীয় অবনতি সাধন করা। মিডিয়মদের প্রায়ই আবার স্মৃতিশক্তির হ্রাস হয়, আর তার জন্য তাঁরা কষ্টও পান। কিছুক্ষণের জন্য কোন একটা জিনিসের ওপর মনঃসংযোগ করতেও তাঁরা পারেন না। ধারাবাহিকরূপে তাঁরা কোন জিনিস চিন্তা করতে বা বিচার করতেও পারেন না, তাঁদের মনঃ-শক্তিই নষ্ট হয়ে যায় এবং তাঁদের খিট্‌খিটে স্বভাব দেখা দেয়। তাঁরা অত্যন্ত গর্বিত, অহংকারী ও স্বার্থপরও অনেক সময় হয়ে পড়েন। পাশব প্রবৃত্তি ও বাসনা প্রভৃতিরও বিকাশ তাঁদের মধ্যে দেখা দেয়। অনেক মিডিয়ম আবার দুশ্চরিত্র, অসৎপ্রকৃতি এবং মিথ্যাবাদীও হন।

সংখ্যাবিজ্ঞান থেকে জানা যায় মিডিয়মদের মধ্যে শতকরা ৭৪ জন পশু প্রবৃত্তিসম্পন্ন হয়ে পড়েন; শতকরা ৬০ জন মূর্ছারোগগ্রস্ত হন এবং ৮৫ জনের স্নায়বিক দৌর্বল্য ঘটে। এ'ছাড়া জানা যায়—একশোটার ভেতর ৫৮ জন মিডিয়ম জালিয়াৎ ও প্রতারক হন, ৯৫ জনের নৈতিক সাহস নষ্ট হয়, আর ৭৪ জন প্রায় দাম্ভিক ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েন।

এইসব হচ্ছে মিডিয়ম হওয়ার দোষ ও বিপদ। এ'থেকেই বোঝা যাবে কেন ভারতীয় সত্যদ্রষ্টা মনীষীরা মিডিয়ম হওয়া দূষণীয় ব'লে মনে করেন।

বেদান্তদর্শন কেন প্রেততত্ত্বানুশীলনে মিডিয়মের কাজকে অনুমোদন করেন না তা বুঝতে কি আর বাকী থাকে? ভারতীয় যোগীরা তাই তাঁদের ছাত্র ও শিক্ষার্থীদের কখনও মিডিয়ম হতে দেন না। যদিও তাঁরা স্বীকার করেন যে পরলোকগত পিতৃপুরুষ ও বিদেহী অথচ ইহলোকের প্রতি আসক্ত আত্মাদের সংগে আমরা যোগাযোগ স্থাপন করতে পারি, কিন্তু একথা তাঁরা ভালোভাবেই জানেন যে, মিডিয়ম হওয়াটা সম্পূর্ণ অন্যায় ও ধ্বংসমূলক অভ্যাস, গঠনমূলক মোটেই নয়। তাই তাঁরা আবিষ্কার করেছেন রাজযোগ সাধনার প্রণালী—যা থেকে পাওয়া যাবে বৈজ্ঞানিকভাবে সব-কিছু অলৌকিক শক্তি, অথচ মিডিয়মের মতো প্রেতাত্মাদের কাছে নিজেদের দেহ, মন ও ইচ্ছা কোনটাকেই বলিদান দিতে হবে না।

যোগী যোগাভ্যাসে মনের ইতিমূলক (পজিটিভ) কার্য মনঃসংযোগ ও ধ্যান-ধারণার দ্বারা দূরশ্রবণ ও দূরদর্শন-শক্তির অধিকারী হতে পারেন। তিনি যেকোন সময়ে যেকোন বস্তু দেখতে বা শুনতে পারেন। তিনি দিব্যানুভূতি লাভ করলে স্বর্গের দেবতারাও তাঁর সেবা করেন, তাঁর আজ্ঞাবহ হন। প্রেতাত্মাদের কাছে তিনি কোনদিনই দাসত্ব স্বীকার করেন না, বরং প্রেতাত্মারাই তাঁর আজ্ঞাবহ দাস হয়ে থাকে। দিব্যদ্রষ্টা যোগী সর্বশক্তিমান ও সর্বদর্শী বিভুচৈতন্যের মিডিয়ম হন, তাঁর ভেতর দিয়েই ঐশীশক্তির বিকাশ হয়, আর সাধারণ মিডিয়মরা হন অজ্ঞ ও বদ্ধ এবং বাঁধা থাকেন তাঁরা ইহলোকে আসক্ত প্রেতাত্মাদের কাছে। কোন মিডিয়মই আজ পর্যন্ত প্রেতাত্মাদের সাহায্যে নিয়ে অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ করতে পারেন নি, অনন্ত জীবন-রহস্যের নিয়মসূত্রগুলিও বুঝতে পারেন নি। কিন্তু প্রকৃত যোগী অতিচেতনলোকে উন্নীত হয়ে পূর্ণজ্ঞান ও ব্রহ্মানুভূতি লাভ করেন। তিনিই বুদ্ধ, যীশুখ্রীষ্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতির মতো সত্যকারের মানবজাতির আদর্শস্বরূপ প্রকৃত মানব হন এবং এই জীবনেই যোগীজীবনের পরিপূর্ণতা লাভ করেন। মিডিয়ম কিন্তু আত্মিক বিকাশের সকল সুযোগসুবিধা নষ্ট ক'রে অজ্ঞানের অন্ধকারে পড়ে থাকেন। মৃত্যুর পরও মিডিয়মকে তাঁর নিয়ন্ত্রক প্রেতাত্মার সংগী হয়ে চিন্তা ও কর্মের ফলভোগী হতে হয়। প্রকৃত যোগী এই পার্থিব শরীরেই পূর্ণতা লাভ করেন, প্রেতলোক স্বর্গলোক ও সমস্ত লোক অতিক্রম ক'রে তিনি সর্বজ্ঞত্ব ও শাশ্বত আনন্দের অধিকারী হন।

চতুর্দশ অধ্যায়

॥ স্বয়ংশ্লেট-লিখন ॥

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে নিউ ইয়র্কের অন্তর্গত লিলি-ডেলে এক আধ্যাত্মিক সম্মেলনে বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রিত হ'য়ে আমি 'হিন্দুধর্ম' ও 'পুনর্জন্মবাদ' সম্বন্ধে বলি। একটা অডিটোরিয়মে সভার আয়োজন হয়েছিল, তার চারদিক খোলা ছিল ও প্রেততত্ত্ববাদে বেশ আগ্রহশীল শ্রোতার দ্বারা আসনগুলি ভর্তি ছিল। একটা বাৎসরিক উৎসবদিনের উপলক্ষ্যে আমি ছিলাম বক্তা। টিকিটবিক্রয় ফটকে গণনা ক'রে দেখা গেল যে, যে-সব শ্রোতা শুনতে এসেছিল তাদের সংখ্যা ছিল সাত হাজার। এই সভায় অনেক মিডিয়ম উপস্থিত ছিলেন। এঁদের কেউ-কেউ আমায় বলেছিলেন যে, আমি যে-সব কথা তাঁদের বলছি সে-সব কথা তাঁরা তাঁদের প্রেতাত্মা-নির্দেশকদের কাছ থেকেও শিখেছেন। তাঁরা তাদের এক উপবেশনে যাবার জন্য আমায় আমন্ত্রণ করলেন। ১৮৯৯-এর ৪ঠা আগষ্ট, এক উপবেশনে থেকে এক টাইপ্-রাইটারে আপনা-আপনি টাইপ্-রাইটিং হতে দেখলুম। সকলেই আপন-আপন মত আত্মীয়-বন্ধুদের নাম দিলেন। আমিও আমার গুরুভাই যোগেনের নাম দিলাম। নীল পেন্সিলে লেখা যোগেনের নাম পাওয়া গেল। এতে আমার কৌতূহল জাগলো; কে লিখলেন আমার জানতে ইচ্ছা হ'ল।

পরদিন ৫ই আগষ্ট, সকালে ১০টার সময় স্বয়ংশ্লেট-লিখনের প্রখ্যাত মিডিয়ম মিঃ কিলারের আমন্ত্রণ পেয়ে আমি তাঁর সংগে দেখা করি। কিছুক্ষণ পরে উপবেশন-কক্ষে জানালার ধারে মিঃ কিলারের সামনে বসলুম। সূর্যকিরণ জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে পড়ছিল। আমাদের দুজনের মাঝখানে একটি ছোট সমচৌকো টেবিল ছিল। কার্পেটে ঢাকা ছিল সেটি। মিষ্টার কিলার দুটি শ্লেট বার করলেন। আমি নিজের হাতে শ্লেট দুটির-দু-পিঠই মুছে দিলুম। তিনিও তাঁর রুমাল দিয়ে আর একবার মুছে নিলেন। এরপর আমি যে-প্রেতাত্মার সংগে সংযোগ করতে চাই তাঁকে সম্বোধন ক'রে আমায় কিছু প্রশ্ন লিখতে বললেন মিঃ কিলার। আমি জিজ্ঞাসা করি—বাঙলায় লিখতে পারি কিনা। তিনি বল্লেন—হ্যাঁ, লিখতে পারেন। আমি তখন এক টুকরো

কাগজে বাঙলায় লিখে সেটি ভাঁজ ক'রে শ্লেট দুটির ওপর রাখলুম। কিলার সাহেব ইতিমধ্যে শ্লেটদুটির মধ্যে একটি পেন্সিল রেখে দিয়েছিলেন। তারপর শ্লেট দুটির ওপর একটি রুমাল আল্‌গা ক'রে জড়ানো ছিল। শ্লেটদুটির দুই কোণ আমি আর দুই কোণ কিলার সাহেব ধরেছিলেন। তারপর শ্লেটদুটিকে সেইভাবে টেবিলের কিছুটা ওপরে তোলা হ'ল। মিঃ কিলার বললেন: 'আপনার বন্ধু আসবেন কি না বলতে পারিনে, আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব'। কিছুক্ষণ পরে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম কাগজের ওপর আমার নাম লিখে দেবো কিনা। তিনি বল্লেন—'হ্যাঁ'। তারপর আবার জিজ্ঞাসা করলেন আমি আমার বন্ধুর নাম ইংরেজীতে লিখেছি কি না। আমি 'না' বলেই উত্তর দিলাম। তিনি বল্লেন: 'আপনি যাকে চান তাঁকে আমার গাইড্ (পরিচালক) ডেকে দিতে হয়তো পারবেন না, কারণ তিনি আপনার ভাষা পড়তে পারবেন না। এই কথা শুনে আমি আর এক টুকরো কাগজে ইংরেজীতে লিখে দিলাম: 'যোগেন, তুমি কি এখানে আছো? যদি থাকো তো বাঙলায় লেখা আমার প্রশ্নগুলির উত্তর দিও।' কাগজটিতে আমার নাম সই ক'রে দিলাম—'স্বামী অভেদানন্দ'। তারপর কাগজটি মুড়ে শ্লেটের ওপর রাখলুম। শ্লেট ধ'রে আমরা কিছুক্ষণ কথা কইতে থাকলুম। মিঃ কিলার আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—আমার পরলোকবাসী বন্ধু ইতিপূর্বে আর কখন ও মিডিয়মের সাহায্যে এসেছে কি না। আমি বল্লাম, 'গত সন্ধ্যায় মিঃ ক্যামবেলের বৈঠকে আমার বন্ধুকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলুম, কিন্তু উত্তরের পরিবর্তে একখণ্ড কাগজ পেয়েছিলুম যার ওপরে নীল পেন্সিলে মাত্র 'যোগেন' নামটি লেখা ছিল, তাছাড়া আর কিছু নয়'। তার এক মূহূর্ত পরেই কিলার টেবিলের ওপর শ্লেটটি রাখলেন ও একটি পেন্সিল নিয়ে শ্লেটের মাথার এককোণে লিখলেন—'যোগের এখানে'। তিনি আমায় লেখাটি পড়তে বল্লেন। আমি পড়ে জানলাম—নাম নির্ভূলই আছে। আবার তিনি দুখানা শ্লেটের দুই কোণ দু'হাতে ক'রে ধ'রে আমাকে শ্লেটের অপর দুটো কোণ ধরতে বল্লেন। শ্লেটদুটো টেবিল থেকে ছ'ইঞ্চি উর্ধ্বে বাতাসে আমাদের হাত-দুটির মাঝখানে ভাসতে লাগল, আমরা টেবিলের দু'পাশে হাত ছড়িয়ে বসেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে শ্লেট-পেন্সিল দিয়ে লেখার খস্‌-খস্ শব্দ শোনা গেল। কিলার সাহেব বল্লেন: 'পেন্সিলের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন?' আমি বললাম—হ্যাঁ। একটু পরে হাতের ওপর ইলেকটিক শক্ (বৈদ্যুতিক স্পন্দন)

অনুভব করলুম। কিলার সাহেব বললেন : তিনিও তাই অনুভব করেছেন। তারপর শ্লেটদুটি খুললে দেখা গেল যে, এই কথাগুলি তাতে লেখা রয়েছে ইংরেজীতে।

'এই ভদ্রলোকের প্রশ্নগুলির জবাব দিতে পারেন এমন কাউকেই এখানে দেখছি নে'। সই করা—'জি. সি.'।

আমি কিলারকে জিজ্ঞাসা করলাম : 'কে এই জি. সি. ?' উত্তর এলো—আমার চালক প্রেতাত্মা। তার গোটা নাম হ'ল জর্জ ক্রিষ্টি'। কিছুক্ষণ পরে কিলার বল্লেন : 'কেন, তোমার বন্ধুই তো এখানে, তিনি কিছু লিখবেন'। তারপর শ্লেটটা মুছে যেমনটা আগে ছিল সে রকম ক'রে রেখে দিলেন। তারপর প্রশ্ন-লেখা কাগজ-টুকরো কিছুক্ষণ হাতে ধরে রাখলেন। আমাকেও তাই করতে বললেন তিনি। আমিও তাই করলাম : তারপর আমরা আগের মতো শ্লেটদুটি ধ'রে থাকলাম। কিছুক্ষণ পর হাতে ইলেকট্রিক্ শক্ অনুভব করলাম। শ্লেটের ভিতর থেকে পেন্সিলের খস্খসানি শোনা গেল। তারপর আওয়াজ থেমে গেল। শ্লেট খুলতে চারটি ভাষায় লেখা দেখা গেল, সংস্কৃত, গ্রীক, ইংরাজী, বাঙলা। কিলার সাহেব তো দেখে অবাক হয়ে গেলেন। এখানে বলে রাখি যে, লিলি ডেলে এক আমি ছাড়া কেউ সংস্কৃত কি বাঙ্লা লেখার বা পড়বার লোক ছিল না। হাতের লেখাটি আমার বন্ধু যোগেনের লেখার মতো দেখে আমিও আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম।

এই অদ্ভুত ব্যাপারের জন্য কিলারকে ধন্যবাদ জানালাম, কিন্তু এর কারণ তখন আমি প্রকাশ করতে পারলাম না। আমি তাঁর কাছ থেকে শ্লেট দুটো চেয়ে নিলাম, কেননা অপরাপর মিডিয়ম বা প্রেততত্ত্ববাদীদের দেখিয়ে আমি জানতে চেষ্টা করবো কিভাবে সেটা হ'ল। কিলারও জানালেন, এ'ধরণের শ্লেট লেখা তিনি কখন দেখেন নি। আমি শ্লেটদুটি নিয়ে অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিলাম। এভাবেই সেদিনকার বৈঠক সমাপ্ত হয়েছিল :

স্বামী যোগানন্দ ও আমি কেউই গ্রীকভাষা জানতুম না। আর একটি উপবেশনে ঐ প্রেতাত্মার কাছে শুনেছিলাম যে, আমার বন্ধু এক গ্রীক-দার্শনিকের প্রেতাত্মাকে সংগে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি গ্রীক কবিতা

লিখেছিলেন। প্রথমে আমার বিশ্বাস হয়নি। তারপর কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীকভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপককে লেখাটি দেখালে তিনি বল্লেন: 'হ্যাঁ, ওটি প্লেটোর একটি সুন্দর রচনা; লেখাটির মধ্যে একটিও ভুল নেই, ঠিক আছে'। তিনি তার অনুবাদ ক'রে আমায় শোনালেন।

আর একটি বৈঠকে যোগেনকে সশরীরে দেখতে চেয়েছিলাম। সে তাতে অসম্মতি প্রকাশ করেছিল। তবে লিলি-ডেলে মিসেস্ মসের এক উপবেশনে আমি ৫৭, রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটের বলরাম বসুকে দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। জীবিত অবস্থার মতোই তিনি ঠিক তাঁর সেই সাদা পাগ্ড়ীটি পরেছিলেন। তবে তাঁর পাগড়ীটি আরো উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যেন তার মধ্যে ছোট ছোট ইলেকৃট্রিক বাল্ব জলছে। শ্মশ্রুগুম্ফিত গম্ভীর বদন আর জ্যোতির্ময় চেহারা দেখে আমার চোখ ঝল্‌সে গিয়েছিল। তিনি অবশ্য কোন কথা বলেন নি; তবে মাথা নেড়ে আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। আমার মাথার ওপর ডান হাত-রেখে আশীর্বাদ করেছিলেন। মিডিয়ম মিসেস্ মস্‌কে আমি তখন দোলক-চেয়ারে অজ্ঞান অবস্থায় বসে থাকতে দেখেছিলাম। বলরামবাবু আমায় আশীর্বাদ করার পর কুয়াশার মতো মিলিয়ে গেলেন।

আমি প্রথমে বুঝতে না পেরে আশ্চর্য হয়েছিলাম যে, কেন তিনি কথা বলেন নি। পরে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম ইহজীবন ত্যাগ করবার ঠিক আগেই তাঁর কথা বন্ধ হয়ে যায়। এই ঘটনা আবার সমর্থিত হয়েছিল যখন আমি জেনেছিলাম যে বলরাম বসু ডবল-নিউমোনিয়ার আক্রান্ত হওয়ায় এক সপ্তাহের বেশী কারু সঙ্গে তিনি কথা কইতে পারেন নি।

আর একটি উপবেশনে আমি যোগেনের কণ্ঠস্বর শুনেছিলাম। একটি টিনের চোঙার ভেতর দিয়ে সে আমায় বাংলায় বলেছিল: 'এই জায়গা (আমেরিকা) কি তোমার ভালো লাগে?' আমি বলেছিলুম: 'হ্যাঁ'। সে বল্লে: 'আমার এ'জায়গা ভালো লাগে না, শ্রীমাকে দেখবার জন্য আমি ভারতে যাচ্ছি'।

এখানে একটা কথা আমি ব'লে রাখি যে, জীবিতকালে যোগেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী আমাদের শ্রীমার মন-প্রাণ দিয়ে সেবা করেছিল।

আমেরিকায় আমি অশরীরি আত্মার অদৃশ্য হস্তে আমার সামনে মূর্তি অংকনও দেখেছি।[১]

১। আমরা স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের কাছ থেকে শুনেছি যে, শ্রীশ্রীসারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ (লাটু মহারাজ) নাট্যকার গিরিশচন্দ্র, ভগিনী নিবেদিতা বিদেহ অবস্থায় স্বামীজীকে দেখা দিয়েছেন ঠিক তাঁদের মৃত্যুর পরক্ষণেই। আশ্চর্য এই যে, দেখা দেবার পরে ভারতবর্ষ থেকে তিনি তাঁদের দেহত্যাগের দুঃসংবাদও কেবল গ্রামে পেয়ে ছিলেন।

তিনি বলেছিলেন, একবার আমেরিকায় থাকা-কালে একদিন সন্ধ্যার সময় তিনি দেখলেন কেবল একটা মুখ শূন্যে ভেসে আসছে—মুখে দুঃখ-কষ্ট মাখানো—মলিন, একটা কাতর শব্দ এলো—'আমায় সাহায্য করো আমায় সাহায্য করো। আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি। আমি আত্মহত্যা করেছি স্বামী অভেদানন্দ তাকে আশীর্বাদ করলেন এই ব'লে যদি তুমি মনে করো যে আমার আশীর্বাদে ও সদিচ্ছায় তোমার কল্যাণ হবে তবে আমি প্রার্থনা করছি তুমি শান্তি লাভ করো। সত্যই প্রেতাত্মার মুখ তখন হঠাৎ যেন আলোকিত হয়ে উঠলো, সে শান্তির ভাব নিয়ে বাতাসে মিশে গেল।

আর একবার একটা ঘটনা ঘটেছিল: একজন নাবিক সমুদ্রে ডুবে মারা গিয়েছিলো, তার আত্মাও স্বামী অভেদানন্দের সামনে এসে অন্ধকারের মধ্যে যেন হাতড়াচ্ছিল। স্বামীজী মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন: 'তোমার কি হয়েছে? প্রেতাত্মা বল্লে: 'আমি ঠিক জানি না, তবে আমি সমুদ্রে ডুবে মরেছি। আমায় আশীর্বাদ করুন, আমি শান্তি চাই। স্বামীজী মহারাজ তাকে আশীর্বাদ করলে সেও হাসিমুখে বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছিল।

এখানে আর একটা ঘটনা উল্লেখ করলে বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। একদিন হঠাৎ স্বামী অভেদানন্দ তাঁর গুরুভ্রাতা স্বামী অদ্ভুতানন্দের (লাটু মহারাজ) কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন শূন্যে বাতাসে—'কালি! কালি! স্বামীজী মহারাজ তৎক্ষণাৎ চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন।' কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: কে আপনি? উত্তর এল —'আমি লাটু তোমায় দেখতে এসেছি। তখন স্বামী অভেদানন্দ অনুমান করলেন যে, তাঁর প্রিয় গুরুভ্রাতা লাটু মহারাজ নশ্বর দেহ ত্যাগ করেছেন। আর ঘটনা সত্যও হয়েছিল কারণ তার কিছু পরেই কেবেলগ্রামে খবর এলো স্বামী অদ্ভুতানন্দের মৃত্যুসংবাদ।

নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রের বিদেহী আত্মাকে স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকা থাকাকালে বিশ্রাম করছেন এমন সময় হঠাৎ বাতাসে গিরিশবাবুর মুখ দেখতে পেলেন। গিরিশবাবু চারিদিকে 'থু থু শব্দ করতে লাগলেন ও তৎক্ষণাৎ আবার বাতাসে মিলিয়ে গেলেন। আমরা স্বামী অভেদানন্দকে গিরিশবাবুর ঐ 'থু থু শব্দ করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন: 'গিরিশবাবু মুক্ত আত্মা। দুনিয়ার সব-কিছু তাঁর কাছে তুচ্ছ, তাই থু থু শব্দ করে বোঝাচ্ছিলেন যে পার্থিব সকল জিনিষই ক্ষণভঙ্গুর, সুতরাং তাদের মূল্য কি? একমাত্র ভগবানই সত্য।

এধরনের কত ঘটনাই না স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের জীবনে ঘটেছিল!—সম্পাদক

পঞ্চদশ অধ্যায়

॥ মরণের পর কি হয় ॥

মরণের পর কিছু থাকে কি-না—এ' প্রশ্নই সাধারণত জাগে আমাদের মনে, আর সেজন্যই আমরা জান্‌তে ইচ্ছা করি যে, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আত্মা দেহ থেকে বার হয়ে গেলে তারপর আমাদের অবস্থা কি দাঁড়ায়। বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পড়লে এ'ধরনের প্রশ্ন ও তার উত্তর আমাদের চোখে পড়ে, কখনো বুদ্ধির নজিরে, কখনো পৃথিবীর সম্বন্ধে অভিজ্ঞতায়, কিংবা অনুভূতির সাহায্য নিয়েই ঐ প্রশ্ন ও উত্তর করা হয়েছে। অনাদিকাল থেকে মৃত্যু-সম্বন্ধে ঐ প্রশ্নের উত্তরগুলির মধ্যে ওল্ড-টেষ্টামেণ্টে আমরা দেখি যে, যোভের মনেও যখন এই প্রশ্ন উঠেছিল তিনি উত্তর দিয়েছিলেন নেতিমূলক-ভাবে। তিনি মানসিক দুঃখ-যন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য মৃত্যু কামনা ক'রেছিলেন। বিভিন্ন প্রার্থনা গানে (সামস্‌) আমরা পাই—

(ক) হে ঈশ্বর, তুমি কি পরলোকবাসীদের পক্ষে কোন আশ্চর্য কার্যসম্পাদন করবে? মৃতাত্মারা কি কবর থেকে উঠে তোমার মহিমা কীর্তন করবে?—৮৮।১০

(খ) মৃত্যুর পর তোমার কোন স্মৃতি থাকে না। কবরে তোমার উদ্দেশ্যে কে ধন্যবাদ জানাবে।—৬।৫

(গ) যে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে, সে এই পৃথিবীর মাটিতে মিশে যাবে। ঠিক মৃত্যুর দিনই তার সকল চিন্তা নষ্ট হয়ে গেছে।—১৪৬।৪

(ঘ) মৃতাত্মারা ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করে না, কিংবা কোন-কিছুই তারা করে না যাদের প্রাণবায়ু শুব্ধ হয়ে গেছে—১১৫।১৭

(ঙ) সকলের ভাগ্যে সকল জিনিস একই রূপে আসে। একই পরিণতি ধার্মিক ও পাপীর পক্ষে ঘটে, একই পরিণতি সৎ ও অসৎস্বভাবসম্পন্নের ভাগ্যে ঘটে। * * * পুণ্যাত্মার পক্ষেও যেমন, পাপীর পক্ষেও তেমনি।—৯।২

(চ) তুমি তোমার পথে যাও, তুমি আনন্দের সংগে তোমার খাদ্য গ্রহণ কর, প্রফুল্লচিত্তে সুরা পান কর। * * আনন্দের সংগে তুমি তোমার পত্নীর সাথে বাস কর, * * কেননা মৃত্যুর পরে কবরে যেখানে তোমাকে যেতেই

হবে সেখানে কোন কাজও নেই, উদ্দেশ্যও নেই, বুদ্ধিও নেই, বোধিও নেই।—৭।৯।১০

(ছ) মৃত ব্যক্তিরা কোন-কিছুই জানে না, এমন কি পুরস্কার পাবারও তারা কোন আশা রাখে না, কারণ মৃত্যুর পর কোন স্মৃতিশক্তিই তাদের থাকে না।

(জ) মানুষের ভাগ্যে যা ঘটে, পশুর ভাগ্যেও তাই। দু'জনারই পরিণতি এক, মানুষ মরে, পশুও মরে। দুজনার প্রাণস্পন্দন একই রকমের, সুতরাং পশু থেকে মানুষের মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য নাই।

(ঝ) (১) সকলেই মরণের পর একটি জায়গায় যায়। সকলেই পৃথিবীর ধূলি থেকে এসেছে, আবার মরণের পর ধূলিতে মিশে যায়। (২) কেউ কি জানে যে মানুষের আত্মার উর্দ্ধগতি হয় আর পশুর আত্মা নিম্নগামী হয়?—২।৯-২১

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে এমন অনেক অংশ আছে যা আমাদের মনে নানা রকমের সন্দেহ এনে দেয়। সন্দেহ এ'ধরনেরও হয় যে, মৃত্যুর পর আমাদের আত্মার অস্তিত্ব থাকে, কিংবা কোন অস্তিত্ব থাকে না—কবরেই সব মিলিয়ে যায়।

খ্রীষ্টানসমাজ মনে করে যীশুখ্রীষ্টই প্রথমে মানুষের আত্মার অমরত্ব প্রকাশ করেছেন। অবশ্য একথা সত্য যে, ইহুদীজাতির মধ্যে মানবত্মার অনন্তের ধারণা যীশুখ্রীষ্টই সৃষ্টি করেছেন, কেননা মরণের পর আত্মা থাকে কিংবা কবরস্থ হওয়ার পর আত্মার অস্তিত্ব থাকে—এই তথ্যের মধ্যে কোন সত্য আছে ব'লে ইহুদীরা বিশ্বাস করতো না। সে সময়কার, অর্থাৎ আদিম 'যুগ' থেকে 'ব্যাবিলোনীয়-ক্যাপটিভিটি'র (ব্যাবিলোন-অবরোধের) সময় পর্যন্ত ইহুদীরা দেহ ছাড়া আত্মার অস্তিত্ব থাকতে পারে একথা বিশ্বাস করতো না। বরং ইহুদীদের ধারণা ছিল—জিহোবা থেকে প্রাণবায়ু এসেছে, আবার মৃত্যুর পর তাতেই ফিরে যাবে। কি পশু কি সাধু বা পাপী সকলের আত্মার পক্ষে ঐ একই কথা সত্য। আমরা পূর্বে ধর্মসংগীতগুলির উদাহরণ দিয়েছি সেগুলি ঐ প্রাচীন যুগেরই বিশ্বাস বা মনের ধারণা। কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব ৫৭৬—৫৩৬ শতকে ব্যাবিলন-অবরোধের সময় ইহুদীরা সুসভ্য জরথুষ্ট্রধর্মী বা পারস্যের অধিবাসীদের সংস্পর্শে এলে তাঁদের কাছ থেকে আত্মার অমরত্বের ধারণা গ্রহণ করে। সুসভ্য পারস্যবাসীরা স্বর্গ ও নরক, দেবদূত ও উন্নতমনা দেবদূত

এবং শেষ বিচারের দিন এই তিনটি জিনিস বিশ্বাস করত। প্রাচীন ইহুদীজাতির কাছে এ'সকল ধারণা বা বিশ্বাস সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু ইহুদীদের মধ্যে কতকগুলি লোক আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী হয়েছিল, আর কতকগুলি লোক বিশ্বাস কর্‌তে পারেনি। ইহুদীদের ভেতর যারা আত্মার অমরত্ব, দেবদূত, বা উন্নতমনা দেবদূতে বিশ্বাসবান হয়েছিল তারাই 'ফেরিসী' নামে কথিত হয়েছিল। ফেরিসী'-শব্দটি পারসীক শব্দেরই হিব্রু-রূপায়ণ। ফেরিসীরা পারস্যদেশের অধিবাসী ছিল ও জরথুষ্ট্রধর্মের অনুগামী। কিন্তু অপর সমস্ত ইহুদীরা অত্যন্ত গোঁড়ামতাবলম্বী ছিল, নূতন কোন মতের তারা পক্ষপাতী ছিল না। আত্মা যে অমর এই বিশ্বাস তাদের মতে ছিল ধর্মবিরোধী এবং তাদের বলা হ'ত 'স্যাডুসী'। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, স্যাডুসীরা অত্যন্ত গোঁড়াভাবাপন্ন ছিল, মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বে তারা মোটেই বিশ্বাসী ছিল না। এমন কি নিউ-টেষ্টামেণ্টের মধ্যে একজন স্যাডুসীর উল্লেখ পাই : সে এসে প্রশ্ন করছে মৃত ব্যক্তির পুনরুত্থান ব'লে কোন জিনিস আছে কি-না। কিন্তু 'আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস' এই ধারণাটি প্রাচীন জরথুষ্ট্রধর্মীর মধ্যে যেভাবে ছিল, খ্রীষ্টানদের মধ্যে ছিল তা ভিন্নভাবে।

জরথুষ্ট্রধর্মাবলম্বীরা মানুষের মরনোত্তর দেহ বা আত্মার পুনরুত্থানবাদে বিশ্বাসী ছিল। তারা বিশ্বাস করত যে, পার্থিব শরীর নষ্ট হবার পরও আত্মার অস্তিত্ব থাকে। তাদের রীতি অনুযায়ী মৃত্যু থেকে চতুর্থ দিনে দেহকে কবরস্থ করা হয়, অর্থাৎ মৃত্যু হবার তিন দিন পরে দেহকে কবরে প্রোথিত করা হয় এবং তাদের বিশ্বাস যে, চতুর্থ দিনের সকালে সবার আত্মাই কবর ত্যাগ করে ওঠে এবং এটিকেই বলা হয় প্রেতাত্মার আত্মিক-উত্থান'। যাঁরা পুণ্যবান, তাঁদের আত্মা যায় 'স্বর্গে' বলতে এখানে বোঝাচ্ছে সচ্চিন্তা, সৎকথা ও সৎকর্মের লোক। অবশ্য অসৎ আত্মারা কবর থেকে ওঠে, কিন্তু তারা অসচ্চিন্তা, অসৎ কথা অসৎ কর্মরূপ, নরকে যায়। বিচারের শেষ দিন পর্যন্ত তারা অন্ধকারে বাস করে, আর যতক্ষণ না সৎ বা কল্যাণের স্রষ্টা আহুরমজদা অকল্যাণস্রষ্টা আহ্রীম্যানকে জয় বা অভিভূত করে। কথিত আছে, আহ্রীম্যান প্রথমে আহুরমজাদার সংগে বন্ধুত্বভাবাপন্ন ছিল, পরে বিদ্রোহ করে পৃথিবীতে নেমে আসে প্রতিহিংসা নেবার জন্য; পৃথিবীতে নেমে আসে যেহেতু স্বর্গরাজ্য থেকে সে বিতাড়িত হয়েছিল। এভাবেই আহ্রীম্যান খ্রীষ্টানজগতে 'শয়তান'-রূপে পরিচিত হয়। এই

শয়তানের ধারণা জরথুষ্ট্রধর্মের গ্রন্থগুলির মধ্যে—বিশেষ ক'রে জেন্দাবেস্তায় পাই।[১]

আহ্রীম্যান বা শয়তানই একদিক থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কর্তা।[২] চতুর্থ গস্‌পেলে শয়তানকে রাজাই বলা হয়েছে। সুতরাং শয়তান আহ্রীম্যানের কাজই স্রষ্টা আহুরমজদার সৎকাজগুলিকে নষ্ট করা, বা পৃথিবীতে পাপ ও মৃত্যুকে ডেকে আনা। আহ্রীম্যান ক্রমাগত কল্যাণস্রষ্টা আহুরমজদার কাজের বিরুদ্ধে জেহাদ চালিয়ে যাচ্ছে এবং কাজে কাজেই আহুরমজদাও আহ্রীমানের প্রভাবকে খর্ব করার চেষ্টা করেন এবং তাকে পরাভূত ক'রে সৃষ্টি করেন আবার নূতন জগৎ—যেখানে শয়তান আহ্রীম্যানের প্রভাব বা ক্ষমতা আর কাজ করে না। ঠিক তখনই আরম্ভ হয় শেষবিচারের দিন। জরথুষ্ট্রধর্মাবলম্বীরা একজন ধর্মপ্রবক্তা স্বীকার করে। তারা বলে, ধর্মপ্রবক্তা স্বর্গে বা মেঘলোকে আবির্ভূত হয়। তাঁর নাম 'সোশিয়াণ্ট'। যে সমস্ত ধার্মিক আত্মা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ ও স্বর্গসুখ ভোগ করতে চান তাঁদের তিনি সাহায্য করেন। এমন কি যারা অজ্ঞান-অন্ধকারে পড়ে আছে তাদেরকেও তিনি পাপমুক্ত ক'রে স্বর্গরাজ্যে নিয়ে যান। জরথুষ্ট্রধর্মীদের আসলে ঠিক এ'ধরনের বিশ্বাস ছিল।

খ্রীষ্টান ও প্রাচীন জরথুষ্ট্র এই উভয়ের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে তুলনা করলে দেখা যায়, আত্মার পুনরুত্থান, শেষবিচারের দিন ও স্বর্গে গমন এই ধারণাগুলি উভয়ের মধ্যেই সমান। যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাবের অনেক পূর্বে পারস্যে এই সকল ধারণা ছিল এবং খ্রীষ্টপূর্ব ৫৬৮—৫৮৬ অব্দে ব্যাবিলোন-অবরোধের সময় ফেরিসীরা এই সকল ধর্মবিশ্বাসে নিয়মিতভাবে উদ্বুদ্ধ হ'ল। কাজেই তাদের আত্মার পুনরুত্থানের ধারণা পুরোপুরি যীশুখ্রীষ্টের দেহের

১। প্রকৃতপক্ষে শয়তানের ধারণা প্রথমে পাই সুপ্রাচীন বৈদিক সাহিত্য ঋগ্বেদেই। ঋগ্বেদে এমন কি অথর্ববেদে ও শতপথ ব্রাহ্মণে পাপ মার শব্দের উল্লেখ পাই (—ঋগ্বেদ ১০।১৩।১২ অথর্ব ২।৯৩।২, শতপথ ব্রাহ্মণ ৮।৪।২)। বৌদ্ধসাহিত্যে পুনঃ পুনঃ 'মার' এই শব্দটির উল্লেখ আছে। 'মার বলতে বুঝায় অপদেবতা বা অকল্যাণের বা পাপের প্রতিমূর্তি। বৈদিক সাহিত্যের রূপকভাবে মেঘ ও 'অহি শব্দ দুটি ও উল্লিখিত হয়েছে। চীনারা একে 'ড্রাগন' ও গ্রীকেরা 'টাইফুন বলে। প্রকৃতপক্ষে 'শয়তান,' পুরুষ পাপ 'মার' শব্দগুলি একমাত্র মৃত্যুর পরিবর্তেই ব্যবহৃত হয়েছে। উপনিষদে এই মৃত্যুর অপর নাম 'অন্ধকার বা 'রাত্রি। ভারতীয় দর্শনে বাসনা কামনাকেই মৃত্যু বা অন্ধকাররূপে অভিহিত করা হয়েছে, কেননা বাসনা কামনাই মানুষকে মায়ার সংসারে আবদ্ধ করে মোহমুগ্ধ করে। বৌদ্ধসাহিত্যেও 'মার বা মৃত্যুকে 'তনহ বা তৃষ্ণা (বাসনা) বলা হয়েছে।

২। ভারতীয় দর্শনেও শয়তানরূপ তৃষ্ণা বা বাসনাকে সৃষ্টির কারণ বলা হয়েছে।

পুনরুত্থাননীতির ওপর নির্ভর করতো না। এ'গুলি অবশ্য ঐতিহাসিক কাহিনী।

এখন কেমন ক'রে আমরা বিশ্বাস করি সত্যিকারভাবে যীশুখ্রীষ্টই অনন্ত শাশ্বতজীবনের ধারণা সাধারণের সমাজে প্রকাশ করেছিলেন, কেননা তাঁরও অনেক পূর্ব থেকে জরথুষ্ট্রধর্মী ও মিশর, চ্যালডিয়া, ব্যাবিলোন, চীন ও ভারতের এবং সংগে সংগে রোম, গ্রীস ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া প্রভৃতি প্রাচীন দেশের অধিবাসীদের ভেতর এই বিশ্বাস বা ধারণা ছিল। এ'সকল দেশের মধ্যে শাশ্বতজীবনের বা অমর-আত্মা সম্বন্ধে বিশ্বাস বর্তমান ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ১২০০০ বছর পূর্বেও মিশরবাসীদের ভেতর এর প্রমাণ পাওয়া গেছে খ্রীষ্টপূর্ব ১২০০০—৮০০০ সময়ের মধ্যে ইজিপ্টের লেখকেরা উল্লেখ ক'রে গেছেন —প্রাচীন ইজিপ্টের অধিবাসীরা বিশ্বাস ক'রত যে, জড় পার্থিব শরীরের পুনরুত্থান সম্ভব এবং সে'জন্যই সৎস্বভাবসম্পন্ন ও পুণ্যচরিত্রের আত্মারা স্বর্গে যেত ও স্বর্গসুখ ভোগ করতো। অবশ্য গোড়ার দিকে তারা বিশ্বাস ক'রত পরলোকগামী আত্মা পার্থিব দেহ নিয়েই স্বর্গ অথবা ভিন্ন ভিন্ন লোকে গমন করে, কিন্তু পরে তারা বিশ্বপ্রকৃতির সূক্ষ্মশক্তি ও ক্ষমতার বিষয় জানতে পারলে এবং অনুভব করলে যে, প্রতিটি মানুষের মধ্যে তার দ্বিতীয় সত্তা ব'লে একটি বস্তু আছে যেটি সূক্ষ্ম ও বায়বীয় পদার্থ দিয়ে সৃষ্টি। জড়শরীরের মতো মানুষের পারলৌকিক একটি সূক্ষ্মসত্তা থাকে—এই বিশ্বাস যখনই তাদের মধ্যে দৃঢ় হয়ে জন্মালো তখনই ইজিপ্টবাসীরা জড়দেহের মৃত্যুর পরও কবর থেকে অক্ষতভাবে ওঠে ধারণা পরিত্যাগ ক'রেছিল। এ'কথাই রাজাদের পঞ্চমবংশের অধিবাসী, অর্থাৎ যীশুখ্রীষ্টের ৩১০০ বছর পূর্বে প্রাচীন ইজিপ্টে যে সমস্ত লোক বাস করতেন তাঁরা জোর গলায় ব'লে গেছেন—'স্বর্গে যাবে আত্মা আর পৃথিবীতে যাবে দেহ'। এর মানেই হল আত্মা স্বর্গীয় ও দেহ পার্থিব কেননা পৃথিবীর ধূলির সঙ্গে দেহের সম্পর্ক। সেদিন থেকেই মৃতশরীরকে সংরক্ষণ-করার ধারণা ইজিপ্টবাসীদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল, কেননা এটা তারা বিশ্বাস করেই নিয়েছিল যে, স্থূলদেহর অনুযায়ী প্রেতশরীরের আকার ও গঠন হওয়ায় জড়দেহকে যতদিন নষ্ট হতে না দিয়ে ঠিকভাবে রক্ষা করা যাবে ততদিন সমগ্র আত্মার অস্তিত্বও টিকে থাকবে। এই ধারণা থেকেই মিশরে মৃতদেহকে ওষুধপত্র দিয়ে সংরক্ষণ করার রীতির উদ্ভব হয়েছিল। অবশ্য এই

রীতি বা বিশ্বাসের পিছনে ভিত্তি হিসাবে ছিল এই ধারণা, মৃতদেহের কোন অংগ যদি বিচ্ছিন্ন হয় তো মৃতাত্মার ঠিক সেই অংশ বা অংগও বিকৃত হয়, আর সেজন্যই মানুষ মরে গেলে তার দেহটাকে কবরের ভিতর অক্ষতভাবে সংরক্ষণ করতে ইজিপ্টবাসীরা চেষ্টা ক'রতো।

তাছাড়া তাদের বিশ্বাস ছিল যে, পুণ্যবানদের মৃত্যু হলে তাঁদের আত্মা যায় স্বর্গে ও সেখানে দেবতাদের সাথে তাঁরা বাস করেন ও তাঁদের সহিত পান-ভোজন করেন। মৃতাত্মাদের জড়দেহ থাকে, যদিও বায়বীয় শরীরের মতো তা সূক্ষ্মপদার্থ দিয়ে তৈরী, আর জড়দেহ থাকে বলেই তাদের খাদ্য এবং পানীয়ের প্রয়োজন হয়। সে'জন্য মৃতাত্মাদের আত্মীয়-স্বজন কবরের মধ্যে খাদ্য ও পানীয় রেখে দেয়। এই ধরনের রীতি অনেকদিন ধরে ইজিপ্টে বর্তমান ছিল। অনেকে আবার এতদূর পর্যন্ত করতো যে কবরের মধ্যে মৃতাত্মাদের জন্য মন্ত্রপূত মাদুলি রেখে দিত, কেননা তাদের ধারণাই ছিল: অশুভ ও অমঙ্গলের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য পরলোকগত বন্ধু ও আত্মীয়দের ঐসকল মন্ত্রশক্তির বিশেষ দরকার। তাদের পুঁথিতে এ'সবও লেখা ছিল নাকি যে, ধর্মভীরু প্রেতাত্মারা স্বর্গে যায় ও স্বর্গীয় সিল্কের তৈরী পোশাক পরিচ্ছদ ও সাদা জুতা পায়ে স্বর্গের শক্তিময় ক্ষেত্রে ভ্রমণ করে। স্বর্গে সুখে স্নান করার জন্য অনেক নদী-হ্রদও আছে। যে সকল গভীর সুখ এই পৃথিবীতে বর্তমান ইজিপ্টবাসীদের স্বর্গেও সেই সব আছে।

ব্যাবিলোন ও চ্যাল্‌ডিয়ার পুঁথিপত্র পড়লে দেখি যে, তারাও মৃত আত্মার শরীরের পুনরুত্থান বিশ্বাস করতো, আর সে'জন্য মৃতশরীরে নানা রকম ওষুধ-পত্র দিয়ে মাটির নীচে কবরে সে'গুলিকে রক্ষা করতে চেষ্টা করতো। চ্যাল্‌ডিয়া ও ব্যাবিলোনবাসীদের ঐ অনুষ্ঠানরীতি বা প্রথাই পরে খ্রীষ্টানদের ভেতর প্রবেশ করে, তাই তারাও মৃতদেহকে কবর দেয়। কিন্তু চ্যাল্‌ডিয়া ও ব্যাবিলোনবাসীদের ঐ রীতি থেকে একথাই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তারা মৃত্যুর পরেও অনন্তজীবনে বিশ্বাস ক'রতো, আর তা থেকেই প্রমাণ হয় যে, কবর দেওয়ার প্রথা ও মৃত্যুর পর শাশ্বত-জীবনের বর্তমান ধারণা যীশুখ্রীষ্টের কাছ থেকে বা তাঁর সময় থেকে বিশ্ববাসী পায় নি, আসলে ঐ প্রথা ভগবান ঈশপুত্রের জন্মের অনেক শত বছর আগে থেকেই সমাজে প্রচলিত ছিল।

গ্রীক ও রোমীয়দের ইতিহাস পড়লেও আমরা দেখি, গ্রীকদের ভেতর 'ইলিসিয়ান-ফিল্ড' বা স্বর্গের ধারণা ছিল এবং তারা বিশ্বাস করতো যে

পুণ্যাত্মারা মরণের পরে স্বর্গে যায় এবং পৃথিবীতে অভ্যস্ত কাজের অনুষ্ঠান সেখানেও করে। সেখানে বন্ধু-বান্ধবের সংগে তারা সাক্ষাৎ করে, স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে, মাতাপিতার তাঁদের পুত্র-কন্যাদের সঙ্গে দেখাশোনা হয়; সেইখানেই তারা অনন্ত কাল ধ'রে বাস ক'রে জীবনে মঙ্গলাশীর্বাদস্বরূপ সকল রকম সুখভোগ করে।

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়াবাসীদের মধ্যেও স্বর্গ বা 'ভালালা'-র ধারণা আছে। তারা সাধারণত যোদ্ধা ও সংগ্রামজীবি, কাজেই মৃত্যুর পর স্বর্গদেবতা ওডিনের কাছে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাদের আত্মা হাজির হয়। স্ক্যাণ্ডিনেভীয় বীর যোদ্ধা যারা সম্মুখ-সমরে প্রাণ দিয়েছে তারাও স্বর্গে যায়, সেখানে শত্রুদের সংগে যুদ্ধ ক'রে আহত হয়, কিন্তু ওডিনদেবতার অত্যাশ্চর্য শক্তিগুণে তাদের ক্ষত নিরাময় হয়, কাজেই; আবার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তারা শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। যুদ্ধের পরে যুদ্ধক্ষেত্রেই তারা একটি বন্যশূকরকে তাড়া করে, তাকে হত্যা ক'রে মাংস খায় এবং এ'ভাবে বিরাট একটি ভোজের আয়োজন করে। এই ব্যাপার কিন্তু স্বর্গে নিত্য-নৈমিত্তিক ভাবে অনন্ত কাল ধরে চলতে থাকে। তবে এই অনন্তকালের অর্থ এ নয় যে, হাজার, দশ হাজার, লক্ষ কিংবা এক কোটী বছর, বরং সীমাহীন কালকেই 'অনন্ত' বলে।

আমেরিকান-নিগ্রোদের ভেতর স্বর্গ সম্বন্ধে ধারণা আবার ভিন্ন। তাদের বিশ্বাস যে, স্বর্গে সুখকর একটি শিকারের স্থান আছে। মুসলমানদের ভেতর আবার আলাদা ধারণা। তাদের ধারণা—যে-সব ধার্মিক মুসমান আল্লার আদেশ মেনে চলে তারা স্বর্গে বা বেহেস্তে যায়। সেখানে প্রচুর পরিমাণে ছায়া, স্বচ্ছ জলপূর্ণ নদী, দুধ, মদ্য ও মধু-পরিপূর্ণ স্রোতস্বিনী সর্বদা প্রবহমান। স্বর্গে সুন্দরী হুরী বা পরীরা আছে, তারা পুণ্যাত্মাদের পেয়ালায় সুরা ঢেলে দেয়, তারাও আকণ্ঠ সুরা পান করে এবং ঐসকল পরীদের সংগে বিহার করে। পুণ্যাত্মা মুসলমানরা মৃত্যুর পর স্বর্গে প্রকাণ্ড বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম করে এবং গাছে যে সমস্ত সুস্বাদু ফল ধরে, সেই সকল গ্রহণ করে। আসল কথা এই যে, আরববাসীরা যে মরুভূমিতে বাস করে, সেখানে জল ও গাছের ছায়ার একান্ত অভাব। আরববাসীরা জলের অত্যন্ত পিয়াসী, তাই তাঁদের ধারণা—স্বর্গ এমন একটি জায়গা যেখানে প্রচুর পরিমাণে গাছের ছায়া' সুস্বাদু ফল এবং ধরণীতে যতরকমের ভোগের জিনিস পাওয়া যায় সেই সবই আছে। মনের কল্পনাকে তারা বাইরে বাস্তব আকারে দেখতে চায়, তাই তাঁদের স্বর্গ হল

জলসিক্ত ও জলপূর্ণ একটি জায়গা। সুখের বিষয়, আমি কিন্তু এমন একটি দেশ থেকে এসেছি যেখানে বাৎসরিক বৃষ্টির পরিমাণ ৫৪০ ইঞ্চি; কাজেই ভিজে স্যাঁৎসেতে স্বর্গে যেতে আমার ইচ্ছা নাই।

এ'সকল বর্ণনা থেকে আমরা শিখি কি? শিখি যে, প্রত্যেক জাতিই, প্রত্যেক দেশের লোকই—তাদের স্বর্গসম্বন্ধে চরম-ধারণা বা কল্পনাকে বাইরের জগতে প্রকাশ করে ও সৃষ্টি করে স্বপ্নময় দেশ। তারা স্বর্গকে ধারণা করে একটি স্থান হিসাবে, আর সেখানে জীবনের সকল রকম সুখ তারা ভোগ করবে। সেই ভোগের বিরাম কোনদিন হবে না, দুঃখ কোন রকম থাকবে না, আর হবে না কোনদিন অন্তত সুখের বিচ্ছেদ। অর্থাৎ অনন্তকাল ধ'রে তারা স্বর্গসুখই ভোগ করবে এটাই তাদের বিশ্বাস ও ধারণা। অনেকে চিন্তা করে যে, স্বর্গে তাদের কাজই হবে গান গেয়ে বেড়ানো, বীণারতারে অন্তত সঙ্গীতের ঝঙ্কার তোলা আর দিনরাত্তিরই গান গাওয়া ও গান শোনা। গোঁড়াপন্থী খ্রীষ্টান চার্চে গাওয়া হ'ত এমন একটি স্তোত্র যাতে পাওয়া যায় স্বর্গসুখের বর্ণনা। তাতে দেওয়া হয়েছে,

যেখানে পূজার ক্ষেত্রে মিলনের
হবে নাকো কভু অবসান,
অটুট যে রবে স্যাবাথের অভিযান।[৩]

অবশ্য এ'ধরনের স্বর্গ তাদের জন্যই নির্দিষ্ট থাকে যারা স্বর্গের এই রকম আদর্শে বিশ্বাস করে। যাঁদের ঈশ্বর বিশ্বাস আছে তাঁদের জন্য একটি স্থান বা একটি রাজ্য নির্বাচিত থাকে সেখানে মৃতাত্মারা মিলিত হয় ও পরিত্রাণকারী প্রভুর উদ্দেশ্যে স্তুতিগান গায়, এখন সেই পরিত্রাতা যীশুখ্রীষ্টই হোন, বুদ্ধই হোন বা মহম্মদ বা হিন্দুদের আর কোনা অবতার হোন। একটা বড় গ্রহের চারদিকে উপগ্রহরা যেমন একত্র হ'য়ে ঘুরতে থাকে, মৃতাত্মারাও তেমনি তাদের আদর্শময় পরিত্রাতার চারদিকে সমবেত হয়। আসলে বিশ্বাসী ও একনিষ্ঠ যারা তারাই লোকনায়কদের কাছে উপস্থিত হয়, আর এঁরা যীশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধ বা অন্য কোন অবতার এ'কথা আগেই বলেছি। সুতরাং মহান্ সাধু-সন্তরা মরণের পরে যে লোকে যান তাকেই স্বর্গ ও আদর্শ স্থান বলে।

কিন্তু এই ধারণা যে অতীত কাল থেকে চলে এসেছে এতে ঠিক আমাদের বিশ্বাস হয় না। এ থেকে আমরা মোটেই বুঝে উঠতে পারি না যে, মরণের

৩। "Where congregation ne'er break up and Sabbaths never end."

পর আমাদের আত্মা স্বর্গে যায় কিংবা অনন্ত নরকে গমন করে। তাই এ'ছাড়া আরো অনেক রহস্য-সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছা করি। শুধু তাই নয়, প্রমাণও চাই এর সপক্ষে। তবে 'প্রেতাবতরণ-বৈঠক' থেকে আমরা জান্‌তে পারি যে, মৃতাত্মারা মৃত্যুর পর কবর থেকে উঠে নানান্ রকম অবস্থা লাভ করে ও এমন-কি স্বর্গদূত পর্যন্ত হয়। ঐ সব আত্মা তখন সব-কিছু জানতে পারে। এমন কি তারা মানবসমাজে, বন্ধুবান্ধব ও স্বজনপরিজনদের সাহায্য করে। অনেক লোকেরই বিশ্বাস যে, মৃতাত্মারা নানান্ রকম উপায়ে পৃথিবীর মানুষকে সাহায্য করে। অনেকে আবার সেই কথা বিশ্বাস করে। তবে যারা অবিশ্বাস করে তারা কিন্তু মরণের পর আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করে না; অর্থাৎ বিদেহী আত্মারা যে মরণের পর থাকে তা তারা বিশ্বাস করে। তবে কোন মাধ্যমের (মিডিয়ম) সাহায্যে তারা আমাদের সহায়তা করে কিনা সেটা হ'ল ভিন্ন বিষয় এবং সে বিষয়টিও আমাদের বুঝতে হবে। পরলোকগামী আত্মাই বা কারা—যারা আত্মাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং মাধ্যমের সাহায্যে ভাব আদান-প্রদান করে? কো'ন্ সব আত্মারাই সাহায্য করে? সাধারণ বিশ্বাস হ'ল, মানুষ কেমন ক'রে পৃথিবীতে বাস করে সেটা মোটেই আলোচনার বিষয় নয়। কিন্তু যখনি তার মৃত্যু হয় ও সে কবরে সমাহিত হয় তখনি সে কর্মলোকে প্রবেশ করে ও সমস্ত জিনিস জানতে পারে, প্রকৃতির নিয়মকানুনও জানে ও সেজন্য তাকে তখন সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান বলা যায়। আর ঠিক তখনই তার শক্তি জন্মায়, সে মানুষের সমাজে সংবাদ প্রেরণ করতে ও তাদের নানান রকমভাবে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু যারা এই ধরনের আদর্শে বিশ্বাস করে তারা আবার বোঝে না—মরণের পর ভবিষ্যৎ জীবন বর্তমান জীবনের চলমান অবস্থা।

গোঁড়া খ্রীষ্টানধর্ম মৃত্যুকে মনে করে জীবনের মহাশত্রু। খ্রীষ্টানধর্মের মতে মানুষ যখন মৃত্যুরাজ্যে প্রবেশ করে তখনি তার জীবন হয় একঘেয়ে, তখন হয় সে সমস্ত রকম স্বর্গসুখ ভোগ করে—নয় অনন্ত নরকে গিয়ে চিরতরে দুঃখকষ্ট পায়। আসলে কিন্তু মৃত্যু জীবনের শত্রু নয়, একটা অবস্থাভেদ-মাত্র।

এখন যদি মরণোন্মুখী এমন একজন লোকের অবস্থা আমরা পর্যবেক্ষণ করি তবে সহজেই বুঝব যে—মৃত্যু একটা অবস্থা বা অবস্থান্তর যাওয়ার পথ-মাত্র। মানুষ যখন মরে তখন তার অবস্থা হয় কি রকম? আমরা দেখি যে, তার দেহ ও ইন্দ্রিয়গুলো আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে আসে। অনুভূতি বা সকল

রকম সংবেদনও তার নিষ্প্রভ হয়, জড়দেহটা নিশ্চল হয়ে যায়, কিন্তু তার মানসিক শক্তিগুলো তখন ক্রমশ তীক্ষ্ণ ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তাদের ভেতর অনেকে সম্ভবত দূরদর্শন ও দূরশ্রবণ প্রভৃতি শক্তিকে বাড়িয়ে তোলে। অনেক দূরের জিনিসকে তারা কাছে দেখতে পায় ও অনেক দূরের শব্দ তারা শুনতে পায়। তাদের সূক্ষ্ম আন্তর ইন্দ্রিয়গুলির শক্তি তখন অনেকগুণ বেড়ে যায়, আর যে-সব শক্তি মনের অচেতন স্তরে ঘুমিয়েছিল সেগুলো চেতনার বা জ্ঞানের স্তরে ভেসে ওঠে। স্মৃতিশক্তি তখন প্রবলতর ও তীক্ষ্ণ হয়। এমন সব ঘটনা ঘটেছে যে মরণোন্মুখী আত্মারা বায়বীয় শরীর ধারণ ক'রে দূর-দেশান্তরে খবর নিয়ে গেছে। তাদের আত্মীয়-স্বজনদের বলেছে তাদের অনাথ ছেলে মেয়েদের যত্ন নিতে কিংবা যে কার্য তারা ইহজগতে অসম্পূর্ণ রেখে গেছে সেগুলোকে সম্পূর্ণ করার জন্য। এসব রীতিমত বিবরণ রাখা হয়েছে। কয়েক বছর আগে য়ুরোপে এসব ঘটনার বিবরণ রাখা হয়েছিল কোন-কিছুই বাদ দেওয়া হয়নি। এমন কি কোন সময়ে ঘটেছিল, তার ঘণ্টা মিনিটও যথাযথভাবে পরীক্ষা করে দেখে লেখা হয়েছিল। 'সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটি-র বিবরণ এবং ইতিহাসেও এসব বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লেখা আছে। সেই বিবরণ থেকে প্রমাণ হয় কি? প্রমাণ হয় যে, এখন যে শক্তি আমাদের ভিতরে সুপ্ত রয়েছে, মরণের সময় সেগুলো দ্বিগুণতর আকার ধারণ করে। এমনও শোনা যায়, মরণোন্মুখ লোক তাদের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সংগে কথাবার্তা বলেন—যারা অনেকদিন আগে পৃথিবীলোক থেকে চলে গেছে ও পরলোকে বাস করছে। তারা যে শুধু তাদেরই দেখতে পায় তা নয়, এমন আত্মাদের সংগে কথা বলে যারা আবার পৃথিবীতে বাস করছে। মরনের পর আত্মারা বিদেহী অবস্থার ভেতর দিয়ে অতিক্রম করে অর্থাৎ আমরা যেমন ঘুমিয়ে পড়লে আমাদের জাগ্রত অবস্থার সমস্ত শক্তি একটা কেন্দ্রে একীভূত হয় তেমনি মরণের সময় বিদেহী আত্মারা তাদের যে সকল শক্তি জীবিত অবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলিতে ছড়ানো থাকে সেগুলোকে সংকুচিত ক'রে নেয়। মৃত্যুর সময়ে বুদ্ধি ও বোধির উৎসস্বরূপ আমাদের যে কেন্দ্রীয় জীবন বা প্রাণ থাকে তা দেহ ও ইন্দ্রিয়গুলিতে ছড়ানো সকল শক্তি তার নিজের মধ্যে টেনে এক ক'রে নেয়। একে অনেকটা নিউক্লিয়স্ বা অণুকেন্দ্রের মতো বলা যায়। এই নিউক্লিয়স ঘুমের সময় জাগ্রতের সব শক্তি আকর্ষণ ক'রে নেয়। মৃত্যুর সময় ঠিক এই একই রকম ঘটে। মৃত্যুটা

আসলে হ'ল সাধারণ ঘুমের গভীরতর অবস্থা। এই গভীরতর ঘুমের অবস্থা মৃত্যু এবং মৃত্যুতে আত্মা নিজের আয়তন বা পরিসরকে যেন সংকুচিত করে এবং প্রাণবিন্দুতে বা মুখ্যপ্রাণে সকল শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়। এই প্রাণবিন্দু বা মুখ্যপ্রাণই আমাদের জীবনীশক্তিরূপ আত্মা। এটি জীবমাত্রেরই অপরিহার্য ও অন্তর্নিহিত সম্পত্তি। আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তি, চিন্তাশক্তি, স্মৃতিশক্তি ও আর সকল রকম শক্তি এই মুখ্যপ্রাণে একীকৃত হয়। 'জীবমাত্র' বা 'ব্যষ্টি-আত্মা' বল্‌তে চিন্তার নায়ক চৈতন্যকে বুঝি। তিনিই সকল রকম চিন্তা করেন, অনুভব করেন, প্রত্যক্ষ করেন ও জানেন। একটি কচ্ছপকে যেমন তার অংগ-প্রত্যংগ নিজের ভেতর গুটিয়ে নিতে দেখি, ঠিক তেমনি প্রত্যেক জীবাত্মা মৃত্যুর সময়ে তার শক্তিগুলিকে একটি প্রাণকেন্দ্রে আকর্ষণ ক'রে নেয়। কচ্ছপ ভয় পেলে করে কি? সে তার দেহের খোলের মধ্যে অংগ-প্রত্যংগকে গুটিয়ে নেয়। ঠিক এই উদাহরণটিই ভগবদ্‌গীতায় দেওয়া হয়েছে: "যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঙ্গানীব সর্বশঃ" (২।৫৮)।

প্রাণীদের মরণের ঠিক অব্যবহিত পূর্বে এই ধরনের আহরণ-ক্রিয়া ঘটে। তখন সেই প্রাণসত্তা মনলোকবাসী হয় ও মানসদেহ ধারণ করে। সংস্কৃত ভাষায় একে বলে 'সূক্ষ্মশরীর'। একে ভৌতিক বা বায়বীয় শরীরও বলে। মরণের সময়ে এই মানস বা বায়বীয় শরীরই কুয়াসার আকারে জড়দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। এই কুয়াসাকে দেখা বা অনুভব করা যায় না। অনেক সাইকিক্ বা মানসশক্তিসম্পন্ন লোক আছে যারা ঐ কুয়াসাকে দেখ্‌তে পায়। সাধারণ মানুষের চোখে ঐ কুয়াসা ধরা পড়ে না বটে, কিন্তু আলোকচিত্র গ্রহণের এমন শক্তিসম্পন্ন কাঁচ (সেন্‌সিটিভ্ ফটোগ্রাফিক্ প্লেট) আছে যাতে তার প্রতিচ্ছায়ার ছবি অনায়াসে নেওয়া যায়। এখন আবার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ হয়েছে যে, কোন মানুষ বা প্রাণী যখন মরে তার অব্যবহিত পূর্বে ও পরে দেহকে যদি কোন সূক্ষ্ম ও অত্যন্ত শক্তিসম্পন্ন দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা যায় তবে তার ব্যবধান বেশ বোঝা যায়। মৃত্যুর আগে শরীরের ওজন ও মৃত্যুর পরেকার ওজন সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে। আগের চেয়ে পরেকার ওজনে প্রায় এক আউন্সের ½ কিংবা ৩/৪ ভাগ কম পাওয়া যায়। এই শরীরে ওজন কম বল্‌তে শরীর থেকে কুয়াসার মতো যে ওজনের সূক্ষ্ম-পদার্থটি মৃত্যুর সংগে সংগে বার হ'য়ে যায় সেই ওজনেরই ব্যবধান। এর

আলোকচিত্রও নেওয়া হয়েছে। এ'ধরনের অনেক ঘটনা পাওয়া যায়, নিয়মিতভাবে তাদের বিবরণও লেখা আছে।

একটি ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে। কোন একটি বালিকার ভাই যখন মরে যাচ্ছে তখন বালিকাটি তার পাশে দাঁড়িয়েছিল। বালিকাটি হঠাৎ তার মাকে ব'লে উঠলো: 'মা, মা, ঐ দেখ, আমার ভাইয়ের দেহের চারপাশে একটা কুয়াসার মতো কি জিনিস রয়েছে?' তার মা কিন্তু কোন কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছিল না।

ঐ কুয়াসাই আত্মার সূক্ষ্ম-আবরণ যাকে সূক্ষ্মশরীর বলে। ওকে ঠিক আত্মা বা জীবাত্মা বলে না। জীবাত্মা হ'ল যেন কেন্দ্র—যা মুখ্যপ্রাণ, আর তার পরিচ্ছদ হিসাবে ঐ কুয়াসা। প্রাণাদি বায়ু ও সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয়াদি-সমন্বিত আবরণকেই প্রেতশরীর বা সূক্ষ্মদেহ বলে। ঐ সূক্ষ্মদেহই মৃত্যুর পর থাকে। কিন্তু ঐ সূক্ষ্মদেহ মরণের পর যায় কোথায়? সেটি কিছুক্ষণের জন্য মৃতদেহের চারপাশে ঘোরে। সম্ভবত দেহটিকে যদি কবরে রক্ষা করা যায় তাহলে তার ওপর বিদেহী জীবাত্মার মায়ায় আকর্ষণ থাকে, কেননা বহুকাল ধরে যে দেহের প্রতি তার আসক্তি ছিল, তাকে ভালোবেসেছে প্রাণ দিয়ে, সে'জন্য হিন্দুদের বিশ্বাস যে, মৃতদেহকে কবরে ধরে না রেখে নষ্ট ক'রে ফেলা ভালো। তাতে আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মাও দেহ বা দেহের মায়া থেকে মুক্ত হয়ে যায়, নইলে দেহটাকে যদি কবরেই রেখে দেওয়া হয় তবে তাকে দেখার জন্য আত্মার মায়ায় আকর্ষণ তার ওপর থাকবে। এই ইচ্ছা ও কৌতূহল তার শরীর চলে গেলেও অনেক দিন অবধি থাকে, জীবাত্মা আগ্রহ নিয়ে দেখতে চায় কবরের ভেতর শরীরের অবস্থাটি কি হ'ল। কিন্তু আত্মা বা জীবাত্মার পক্ষে এটি অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয় অবস্থা, কেননা তাকে এতে অসুখী ও বেদনাতুর হতে হয়। তাছাড়া অমন সুন্দর আদরের দেহ নষ্ট ও গলিত হয়ে যাচ্ছে দেখ্‌লে জীবাত্মার দুঃখ হবারই কথা। কাজেই পরলোকে গিয়েও জীবাত্মারা দুঃখ-কষ্ট পাবে এটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। এ'জন্যই হিন্দুদের মধ্যে দেহটাকে অগ্নিসংযোগে পোড়ানোর ব্যবস্থা আছে এবং এটাকেই তারা শরীর-সৎকার করার শ্রেষ্ঠ উপায় ব'লে মনে করে। মৃতদেহ যত শীঘ্র নষ্ট হয়ে যায় তত শীঘ্র জীবাত্মার পক্ষে সেটাকে ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক। যে শরীরটাকে আত্মা একবার (জীর্ণ হিসাবে) পরিত্যাগ করেছে সেটার সত্তাকে ভুলে যাওয়াই তার পক্ষে শ্রেয়।

এখন দেহকে ছেড়ে যাওয়ার পর জীবাত্মার অদৃষ্টে ঘটে কি? তখন সে সূক্ষ্ম দেহ (মানস বা বায়বীয় দেহ)-রূপ পরিচ্ছদ পরিধান ক'রে পৃথিবীর এলাকা সেখানে শেষ হয়েছে ও নূতন পরলোকের সীমানা আরম্ভ হয়েছে এমন নিরপেক্ষ একটি জায়গায় যায়। একেই 'বর্ডারল্যাণ্ড' বা 'নিরপেক্ষ সীমান্তদেশ' ('নো-ম্যানস ল্যাণ্ড') বলে। আসলে সেটি কিন্তু একটি স্থান নয়,—একটি স্তরবিশেষ। আকাশের দিকচক্রবালের যেমন একটি সীমা আছে, তেমনি বর্ডার-ল্যাণ্ড বা নিরপেক্ষ সীমান্তক্ষেত্র প্রেতলোক ও জগতের মাঝে একটি সীমারেখা আছে। সেটি এক ভিন্ন কম্পনবিশেষের অবস্থা। সেটি সীমামাত্রা (ডাইমেন্‌সন্) বা স্তর হিসাবেও ভিন্ন। এখন যে পৃথিবীতে আমরা (তৃতীয় স্তরে) বাস করি, সেখানকার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার জ্ঞান-সম্বন্ধে আমরা সচেতন। কিন্তু এর গভীরতা (ডেপ্‌থ) কতটুকু তা আমরা জানি না। এই গভীরতাকেই বলে চতুর্থ স্তর। চতুর্থ স্তরে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা কোনটাই থাকে না, অথচ সেটি এক জায়গায়ই অবস্থিত, অর্থাৎ একটি দেশের মধ্যেই তার অবস্থিতি এবং সেই দেশের ভেতর এখনও আমরা বাস করি। এখন অনুমান করুন—পৃথিবী যেন একটা ফাঁপা বস্তুবিশেষ, বাইরের আকারমাত্রই তার আছে এবং তার ভেতর জমাট জড়পদার্থ কিছুই নেই। ওখানেই বিদেহী জীবাত্মারা যেন বাস করে। ঐ চতুর্থ স্তর থেকেই যেন ওরা আমাদের তৃতীয় স্তর পৃথিবীতে নেমে আসে, আর তখন তাদের আমরা দেখতে পাই ও অনুভব করি। এটি যেন সাগরের গভীর তলদেশে যাওয়ার মতো। আত্মারা যে পৃথিবীতে নেমে আসে, এটি যেন তাদের সাগরের গর্ভে ডুব দেওয়ার মতো। সমুদ্রের নীচে যখন আপনারা নামেন তখন কি করেন? নিশ্চয়ই অনেক টন ভারী ডুবুরীর পোশাক আপনাদের পর্‌তে হয়, কেননা ঐ ভারী লোহার পোশাক না পর্‌লে সমুদ্রের তলায় পৌঁছানো যায় না। হাল্কা দেহ অথবা সূক্ষ্মশরীরে কোন মতেই আপনি পৃথিবীতে থাকতে পারবেন না। কাজেই মরণের পর আমাদের যেতে হয় এদেশ ছেড়ে ভিন্ন একটি দেশ, ভিন্ন একটা জায়গায়—যেখানে বায়ুকম্পন আমাদের সূক্ষ্মদেহের কম্পনের সংগে মেলে বা সমান হয়। সে'জন্যই তাকে আমরা বলি 'বর্ডার-ল্যাণ্ড' বা 'সীমান্তক্ষেত্র'। তা এখানকার মতো একটি স্থান নয়, কিংবা দেওয়ালের পেছনে একটি থেকে অপরটিতে যাবার মতো কোন পথও নয়; সেইখানকার বায়ু বা ইথারকম্পনই হল সম্পূর্ণ আলাদা রকমের। আমাদের যদি খুব সূক্ষ্মইন্দ্রিয় থাকতো তাহলে

নিশ্চয়ই তার সত্তা আমরা দেখতে বা অনুভব কর্‌তে পারতুম। যেমন ধরুন, একটি সংগীত বা ঐকতানবাদন হচ্ছে, তার ভিন্ন ভিন্ন স্বরগুলি ভিন্ন ভিন্ন শব্দতরঙ্গ বা বায়ুতরঙ্গ সৃষ্টি করছে বিভিন্ন পর্দায় ভিন্ন ভিন্ন চাবির সাহায্যে। সেই সকলগুলিকে একত্র ক'রে একটি সুন্দর সুরসাম্যের (হার্মনি) সৃষ্টি হয়, আর আমরা ভিন্ন ভিন্ন চাবি থেকে সৃষ্টি হচ্ছে যে সুর বা শব্দ তাদের প্রত্যেকটিকে আলাদা ক'রে যদি শুনতে চাই তাহলেই তাদের আমরা চিন্‌তে পারি। কম্পনসংখ্যা কিন্তু প্রত্যেকের ভিন্ন। কল্পনা কর্‌তে পারি যে, এই স্থান বা দেশের (স্পেস) ভেতর দিয়ে পাঠানো হচ্ছে যে ভিন্ন ভিন্ন বেতারবার্তা—তাদের একটা অন্য একটার বাধা সৃষ্টি করছে না, কেননা কম্পন বা বায়ুতরঙ্গ হিসাবে তারা ভিন্ন ভিন্ন। সে' রকম প্রতিটি জীবাত্মা দেহ থেকে যখন বার হয়ে যায় তখন তার নিজের বায়ুকম্পনও সংগে নিয়ে যায়। তার চিন্তাধারা—তার ধারণা সমস্তই কম্পন ছাড়া অন্য-কিছু নয়। সেই কম্পনগুলি তাকে কেন্দ্র ক'রে ক্রমাগতই বিকাশ লাভ করছে। মরণের পর জীবাত্মা সমস্ত কম্পনই নিজের সংগে নেয়, আর অপরের কম্পনের সংগে তার কম্পনকেন্দ্রের কোন সংঘর্ষও বাঁধে না। ঐগুলিকে সে নিজের রাজ্যের এলাকায় বহন ক'রে নিয়ে যায়। সেখানে দিন কয়েকের জন্য থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে সে এসে পড়ে। তন্দ্রা প্রেতাত্মার একরকম নিদ্রার অবস্থা। পৃথিবীতে বাস ক'রে নানা কর্মের মধ্যে পরিশ্রান্ত হ'য়ে সে কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম করতে চায়, তাই সে বিশ্রামপূর্ণ নিদ্রাকে আশ্রয় করে। যখন সে নিদ্রাচ্ছন্ন থাকে তখন কোন-কিছুই তার ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না। এমন কি স্বয়ং ভগবানও তার সেই বিশ্রামময় নিদ্রায় বাধা দেন না। কিন্তু যে-সকল জীবাত্মা পৃথিবী থেকে উৎকণ্ঠা, দুঃখ ও নানা যন্ত্রণার অনুভূতি (সংস্কার) নিয়ে পরলোকে যায় তাদের নিদ্রা পরলোকে শান্তিপূর্ণ হয় না, বরং তাদের নিদ্রা বা সুপ্তির ব্যাঘাতই ঘটে। পৃথিবীতে, ভোগের জিনিসের ওপর আসক্তি ও মায়া থাকার জন্য তারা স্বপ্ন দেখে—যেন তাদের ইহলোকের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনরা কাঁদছে, শোক করছে ও দুঃখ করছে, আর সে'জন্যই তারা ভোগভূমি পৃথিবীতে আবার ফিরে আসে। ইহলোকের আকর্ষণ ও আসক্তিই তাদের পৃথিবীতে টেনে নিয়ে আসে। তখন মনে করে, তারা যেন ঘুমের মধ্যে বেড়াচ্ছে—যেমন আধোঘুম ও আচ্ছন্ন অবস্থায় লোকেরা (সোমনাম্বুলিষ্ট) ঘুমের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। সে'জন্য দেখি যে, বেশীর ভাগ

প্রেততত্ত্বানুশীলন-বৈঠকে (সিয়ান্স) আহূত প্রেতাত্মাদের তন্দ্রাচ্ছন্ন, আধঘুমন্ত ও নির্বোধের মতো দেখায়। বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের আহ্বানই তাদের পৃথিবীলোকে টেনে নিয়ে আসে। সুতরাং তারা নেমে আসে ও তাদের তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় বন্ধু-বান্ধবদের সাহায্য করার চেষ্টা করে। কিন্তু সাহায্য করলেও তারা নিজেরা বুঝতে পারে না যে, সত্যিকারের তারা কি সাহায্য করছে। অনেক প্রেতাত্মার জ্ঞান থাকে, অর্থাৎ তারা সচেতন হয়, কিন্তু তাহলেও তারা জানতে পারে না তারা যথার্থ মারা গেছে কি-না। সেই সময়ে তাদের সব-কিছু গোলমাল হ'য়ে যায়, তাই নানা বিশৃঙ্খল অবস্থায় তারা বাস করে। কাজেই তাদের কিছুদিন সময় লাগে তারা সত্যিকারভাবে যে মরে গেছে তাই বুঝতে। কতদিন তারা আবার ধরণীর ওপর আসক্তিযুক্ত (আর্থ-বাউণ্ড) হয়ে বাস করে। সেই সময়ে যদি একান্ত ভালবাসার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের জন্যে তার বেশী আসক্তি বা আকর্ষণের ভাব থাকে তো সে বিদেহ অবস্থায়ই তাদের চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু সেই অবস্থা তাদের অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনাদায়ক হয়, কেননা বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনেরা তাদের উপস্থিতিকে বুঝতে পারে না, কাজেই ঠিকভাবে আদর-যত্নও করে না। এ' কথা ঠিক যে, প্রতিটি প্রেতাত্মা তার নিজের পরিবেশ—নিজের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে তার চিন্তাধারা ও কর্ম দিয়ে।

কাজেই আমরা জানতে পারি যে, প্রত্যেক প্রেতাত্মার জন্য একটি নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। যেমন দুটি ব্যক্তি কখনই একই ধরনের হয় না, তেমনি মরণের পর দুটি প্রেতাত্মার কম্পনস্তরও কখনো এক রকমের হয় না। মৃত্যুর পরই জীবাত্মারা সীমান্তদেশে (বর্ডার-ল্যাণ্ডে) গিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ কতক প্রেতাত্মা ঘুমের অবস্থায় দীর্ঘদিন কাটায়, আর কতকগুলো খুব কম সময়ের জন্য থাকে। যাদের ভেতর খারাপ ও পশু-প্রবৃত্তিগুলো প্রবল থাকে তারা আবার দীর্ঘসময় বিশ্রামপূর্ণ ঘুমের মধ্যে কাটাতে পারে না, সে অবস্থায় তারা আবার পৃথিবীর মায়ায় জড়িয়ে থাকে এবং ঘুমের ভেতর যে সব কামনা-বাসনাগুলো গজিয়ে ওঠে সেগুলি তারা ভোগ করতে থাকে। তারা অনেক মিডিয়ম বা মাধ্যমেরও সাহায্য নেয়, তাদের ভেতর দিয়ে তাদের পান-ভোজন ও অসৎ কামনাগুলোকে ভোগ করে নেয়, সে'জন্যই অনেক মিডিয়মও পানাসক্ত হয়ে অনৈতিক জীবনযাপন করে। এর জন্য দায়ী অবশ্য মিডিয়মরা নয়, দোষী প্রেতাত্মারাই, কেননা তারাই

মিডিয়মদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তাদের অসৎ-প্রবৃত্তি ও কামনাগুলোকে চরিতার্থ করার চেষ্টা করে। সে'জন্য আমাদের শরীরকে আশ্রয় ও পার্থিব ইন্দ্রিয়কে ব্যবহার করতে দেওয়াও অনেক সময় বিপজ্জনক হয়। এ'সম্বন্ধে একটি নিয়ম প্রচলিত আছে ও সেটি পরিষ্কার ক'রে বুঝা উচিত। আমরা যে শরীর ধারণ করি তা আমাদের অতীত জীবনের চিন্তা ও কাজের ফলস্বরূপ। শরীরও সৃষ্টি করি আমরা নিজের জন্যই আরো উন্নত জীবন ও অধিকতর অভিজ্ঞতা লাভ করতে, অপর কারু জন্য নয়। আচ্ছা মনে করুন যে, আমাদের শরীরকে আশ্রয় ক'রে প্রেতাত্মাদের আবির্ভূত হ'তে দিলুম, কিন্তু তাতে লাভ কি হয়? বরং তাদের কাছে আমাদের সুযোগ-সুবিধাকেই বলিদান দিলুম বলা যায়। সেটা তো আমাদের পক্ষে ক্ষতিকরই। আমরা হয়তো বল্‌তে পারি—মানবসমাজকে আমরা সাহায্য করছি। কিন্তু সত্যিকারের কি তাই? সত্যিই কি আমরা মানবসমাজের কিছু কল্যাণ করি তাই দিয়ে? মোটেই নয়, বরং আমরা সম্মোহনী-নিদ্রার কবলে পড়ে অজ্ঞান হই। আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম আশ্রয় করে অপর কোন জীবাত্মা বা অপর কোন শক্তি। তারপর ঐ জীবাত্মা তার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে আমাদের ভেতর দিয়ে, কাজেই প্রেতাত্মাদের কল্যাণ-সাধনের অজুহাতে আমরা বঞ্চিত হই আমাদের নিজেদের কল্যাণ করার সুযোগ-সুবিধা লাভ থেকে। যারা প্রেতাবতরণ ও পরলোকবাসী আত্মাদের সাথে যোগাযোগ রাখার ব্যাপারে উৎসাহী তারা বেশীর ভাগই সেই বিবেচনাকে অবহেলা করে। ভারতে হিন্দুরাই একমাত্র অবিস্মরণীয় যুগ থেকে এই প্রেততত্ত্ব নিয়ে অনুশীলন ক'রে আসছেন, সে-সম্বন্ধে তাঁদের অভিজ্ঞতার সকল বিবরণ লিখে রেখেছেন এবং সেগুলোই পুরুষানুক্রমে আজ পর্যন্ত চলে আসছে তাঁদের সমাজে। পৃথিবীতে আর কোন জাতি নাই যাদের মধ্যে ভারতীয়দের মতো প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে এতো সুস্পষ্ট জ্ঞান আছে। তাই আমরা আমাদের বন্ধুবান্ধবদের সম্মোহিত (ট্রান্স) মিডিয়ম হ'তে দিই না। কারণ এতে অত্যন্ত বিপদের সম্ভাবনা আছে। একবার যদি প্রেতাবতরণের দ্বার খুলে যায় তো তাকে সহজে বন্ধ করা যায় না। আবার অনেক প্রেতাত্মা আছে যারা ছল-চাতুরী করে, প্রবঞ্চনা করে, অপরের নাম নিয়ে পৃথিবীতে আসে ও মানুষদের ঠকায়। এ'ধরনের কতকগুলি প্রবঞ্চনাকর ঘটনার বিবরণও পাওয়া গেছে। কোন প্রেতাত্মা হয়তো আত্মপ্রকাশ করলো একজন মহাত্মা বলে পরিচয়

দিয়ে, কিন্তু আসলে সে মহাত্মাই নয়। এখন কেমন করেই বা তাদের বেছে নেওয়া যাবে? নিশ্চয়ই তাদের দেখানো গতিবিধি দিয়ে নয়, কেননা ঐগুলো তারা যেকোন মানুষের অচেতন মন থেকে ধার ক'রে নেয়, তাই কোন্ প্রেতাত্মা ভালো, কোন্‌টি মন্দ তা বেছে নেওয়াও দরকার; অল্প ও উচ্চতর শক্তিবিশিষ্ট প্রেতাত্মাদের পার্থক্যটা আমাদের নিশ্চয়ই জানা উচিত তারপর সেই বিষয়েও হুঁশিয়ার হওয়া দরকার যখন কোন খবর দেওয়ার জন্য আমাদের সংস্পর্শে আমরা তাদের আসতে দিই, কেননা তার জন্য তাদের আমরা প্রেতলোক থেকে পৃথিবীতে টেনে আনি। এ'রকম করাতে তাদের সত্যিই কোনই সাহায্য করা হয় না। হিন্দুরা তাই বিশ্বাস করেন যে, প্রেতাত্মাদের যতদূর সম্ভব না ডাকাই উচিত, আর তাদের পরলোকের রাজ্যে বিব্রত করা উচিত নয় এবং যদি তন্দ্রাচ্ছন্নই থাকে তো তারা সে অবস্থায়ই বিশ্রাম লাভ করুক। বরং তাদের কল্যাণচিন্তা ও সাধু-উদ্দেশ্যে সচ্চিন্তা প্রেরণা করা উচিত।

মৃতদেহের সৎকার ও তার প্রাসঙ্গিক অনুষ্ঠানরীতি হিন্দুদের মধ্যে যেমন, খ্রীষ্টানদের ভেতর ঠিক তেমনটি নয়। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হ'ল— পরলোকগামীদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনার অনুষ্ঠান করায়, তাদের উদ্দেশ্যে সৎকাজ ও দাতব্য প্রভৃতি কল্যাণকর্ম করায়, কেননা ঐসব কাজের শুভফল মৃত আত্মাদের কাছে পৌঁছোয় ও তার জন্য তারা যে পৃথিবীর মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ থাকে তা থেকে মুক্তি পায়। বিদেহী জীবাত্মারা আমাদের যত না পারে, আমরা তার অনেক বেশী তাদের কিন্তু সাহায্য করতে পারি, তারা আমাদের চিন্তা বা মনোজগতের অনেক কাছে থাকে।[৪] আমরা যদি এখান থেকে মৃতাত্মাদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা ও সচ্চিন্তা করি তবে সেগুলি তাদের কাছে যায় ও তাদের সাহায্যে করে। তাদের নামের উদ্দেশ্যে যে কোন ভাল কাজ করলেই, অর্থাৎ যদি এই চিন্তা নিয়ে আমাদের মনকে নিবিষ্ট করি যে, কোন ভালো কাজের ফল তাদের কাছে যাক ও তাদের কল্যাণ করুক তাহলে সত্যিই

৪। এখানে উল্লেখ করা সমীচীন যে, মানুষের মৃত্যু হলে সে মনোময় শরীর নিয়ে মানসলোকে থাকে, যেমন নিদ্রা পেলে আমরা (আমি বা আত্মা) থাকি স্বপ্নের তথা মনের জগতে। কোন-কিছুকে জানা মনেরই কাজ বা মনের ক্রিয়া ও গুণ-বিশেষ। জানা-রূপ ক্রিয়াও কম্পনের সমষ্টি, কাজেই সংস্কাররূপ কম্পনের সাথে জানা-রূপ মনের কম্পনের সম্পর্ক হলেই সংস্কারকে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করা যায়।

তাদের উপকার করা হয়। আর তারা আমাদের উপকার কর্‌তে পারে বল্‌তে তারা আমাদের কিছু খবর দিতে পারে মাত্র। যারা বেশ উন্নত ধরনের, অর্থাৎ যারা এ'জগতে উন্নত মনের লোক ছিল তারা পরলোকে গিয়ে আমাদের কাজের বা অদৃষ্টে কি ভবিষ্যৎ ফল হবে তা বুঝতে ও জানতে পারে —অবশ্য যদি তাদের কার্য-কারণরূপ প্রাকৃতিক নিয়ম সকল জিনিসের হেতু-সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান থাকে তবেই, নইলে নয়। কিন্তু সকল বিদেহী আত্মা তা পারে না।

উদাহরণ যেমন, আমাদের মনে যেন কোন একটি চিন্তা এলো। এখন ভবিষ্যতে যখন কোন একটা ফল নিশ্চয়ই আসবে তখন বুঝতে হবে যে, ভবিষ্যৎ ফল বর্তমানেরই পরিণতি। এমন যদি হয় যে, আমাদের মনে বীজাকারে যে চিন্তা রয়েছে তা কেউ জান্‌তে পারে—তাহলে সে বলে দিতে পারে আমাদের ভবিষ্যতে কি ঘট্‌বে। অবশ্য যাদের মনোপঠনীশক্তি আছে তারাই তা পারে। আসলে সকল জিনিসই তো মনের মধ্যে আছে। অতীতে যা ঘটেছে ও বর্তমানে যা ঘটছে তাদের সকল সংস্কারই অবচেতন-মনে সঞ্চিত আছে। কাজেই মনঃসংযোগ করলেই সকল ঘটনার খবর বলে দেওয়া যায়, কারণ কোন ঘটনার সংস্কারকে চেতনস্তরে আনার অর্থই তাকে কম্পনের আকারে পরিণত করা। আমাদের মনের কম্পনের সংগে এক হ'লেই তাকে জানা যায় এবং তা' চেতনার স্তরে ভেসে ওঠে। এই কার্যরূপ চিন্তা ও মন এ'দুয়ের কম্পনের ঐক্যকে জানতে পারেন একমাত্র উন্নত মানসিক শক্তিসম্পন্ন জীবাত্মারা; অর্থাৎ যাঁদের মনোশক্তি বিশেষভাবে বিকাশলাভ করেছে তাঁরাই জানতে পারেন। কাজেই আমরা কখনো সকলের জন্য একটা নির্দিষ্ট আইন সৃষ্টি করতে পারি না। কতকগুলি বিদেহী আত্মা তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে দীর্ঘদিন ধরে ঘুমোয়, আর যে-সব আত্মা অধ্যাত্মজ্ঞানে উন্নত ও অধিক শক্তিসম্পন্ন তাঁরা অত্যন্ত কম দিনের মধ্যেই যেটাকে খোলস বা আবরণ বলা যায় সেই সূক্ষ্মশরীরকে ত্যাগ ক'রে সদ্গতি লাভ করেন। সূক্ষ্মশরীরও আত্মার বন্ধন-বিশেষ। এখন এই সূক্ষ্মশরীরে থাকে কি? থাকে পশুপ্রবৃত্তি ও কামনা—তৃষ্ণা ও জড়পার্থিব জিনিসের জন্য ভালবাসা।[৫] কিন্তু এগুলো সমস্তই শুদ্ধ

৫। সূক্ষ্মশরীর জড় ও পার্থিব, সুতরাং তা সূক্ষ্ম হলেও ধ্বংসশীল পৃথিবীর সংগে তার সম্পর্ক থাকে। সূক্ষ্মশরীর বল্‌তে বোঝায় মনোশরীর, অর্থাৎ বাসনা তৃষ্ণা প্রভৃতির রাজ্য। বেদান্তে বাসনা বা তৃষ্ণাকে বন্ধন বলা হয়েছে, কেননা বাসনা বা তৃপ্তির জন্য মানুষ ধরণীতে যাওয়া-আসা

আত্মার সীমা ও বন্ধনবিশেষ। এই পরলোকে ঘুমের নেশা কেটে গেলে জীবাত্মারা বুঝতে পারে তারা বন্ধনের মধ্যে আছে, সুতরাং বাসনা-কামনাজড়িত সূক্ষ্মদেহ তারা তখন ত্যাগ করে। ঐ সূক্ষ্মদেহকেই বায়বীয় শরীর বা জীবাত্মার আবরণ বলে। সেটা আকাশে ও বাতাসে সর্বত্র ভেসে বেড়াতে পারে। ঐ খোলসটার নিজের কোন আত্মা নেই। আসলে ঐ সূক্ষ্মদেহের আবরণরূপ খোলোসগুলোর চিন্তা দিয়ে তৈরী আকার-বিশেষ সেটি। ব্রহ্মাণ্ডে কোন জিনিস একবার সৃষ্টি হ'লে তার আর নাশ হয় না, তাই কোন-না-কোন আকারে তা থাকেই। তাই চিন্তার আকাররূপ সূক্ষ্মদেহের আবরণগুলো অনন্তকাল ধরে থেকেই যায়। মিডিয়মরা সে'জন্য তাদের ইচ্ছারূপ চিন্তা দিয়ে ঐ আবরণগুলোকে আবার জীবন্ত ক'রে তুলতে পারে। বিদেহী আত্মাদের শরীর নিয়ে তাই আমাদের সামনে কখনো আবির্ভূত হ'তে দেখি। তাদের শরীরও ঐ পরলোকগামী আত্মাদের খোলস বা আবরণের মতোই। নিম্নশ্রেণীর পশুদের প্রেতশরীরও সৃষ্টি হ'তে পারে। পশুপ্রেতশরীরের অর্থ হ'ল তারা তখনও মানুষের শরীর পায় নি, বিকাশের উন্নত স্তরে উঠতে তাদের এখনও বাকী আছে। প্রেতদেহগুলি আবির্ভূত হয়, বা তাদের দেখা যায় যখন বিদেহী জীবাত্মারা তাদের ঘুম থেকে জাগে। তখনই তারা চন্দ্রলোকে (অ্যাসট্রোল-প্লেন) প্রবেশ করে। সেখানে তারা শান্তিপূর্ণ বিশ্রাম লাভ করতে পারে। সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্য তাদের সকল রকম বাসনা-কামনা সেখানে তারা চরিতার্থ করতে পারে। ঐ স্তরগুলিকেই 'স্বর্গ' বলে। ঐ স্বর্গেই বিদেহী জীবাত্মাদের যাবতীয় বাসনা, চিন্তা ও কাজ পরিপূর্ণ হ'তে পারে (অবশ্য এটাই তারা ইচ্ছা বা কল্পনা করে)। আমরা যদি ইহজগতে সৎকাজ করি তবে সংস্কার আমাদের মনের অবচেতন-স্তরে সঞ্চিত থাকে। বীজের আকারে সংস্কারগুলিই ক্রমশঃ আবার জাগ্রত হয় ও কার্য-কারণের নিয়ম-অনুসারে তারা ফল সৃষ্টি করে। আমরা যাকে স্বর্গ বলি ওটি প্রাণীদের নিজেদের কর্মের ফল হিসাবে সৃষ্টি করা 'লোক'-বিশেষ। স্বর্গ ই সমস্ত জাতির যেন পরমপুরুষার্থ। সুতরাং দেখা যায় যে, ইচ্ছানুরূপ আত্মারা নির্দিষ্ট কোন স্বর্গে যায় ও সেখানে প্রচুর পরিমাণে খায়,

রূপ ফল সৃষ্টি করে। পরিবর্তনশীল জগতে যাওয়া-আসাই বন্ধন। তাই কামনা তৃষ্ণা বন্ধন, সেগুলি মানুষকে শাশ্বত শান্তিলাভ থেকে বঞ্চিত করে। কাজেই তারা অপার্থিব নয়, পার্থিব বা অন্য তথা ধ্বংসশীল জীব-জগতেরই উপাদান। যাঁরা আত্মজ্ঞান লাভ করতে চান তাঁদের এই ধরণীর সব-কিছু বন্ধনকে অতিক্রম করতে হয়, আর তবেই তাঁরা শান্তি বা মুক্তি লাভ করেন।

পান করে, শান্তি ও শীতল স্থান লাভ করে। যারা স্বর্গে আনন্দ বা সুখলাভ করবে তারা ঠিক ঐ অবস্থারই স্বপ্ন দেখে। ঐ স্বপ্ন যেন তাদের ক্রমশঃ বাস্তবে পরিণত হয় অবশ্য এটাই তারা মনে করে। তাকেই বলে চিন্তা বা কল্পনার রাজ্য। বিদেহী জীবাত্মারা মনে করে যে, তাদের চিন্তা বা কল্পনাগুলি ঐ রাজ্যেই সত্যে অর্থাৎ বাস্তবে পরিণত হবে। অর্থাৎ যেমন আমরা ভাবি বা কল্পনা করি স্বপ্নে, ঠিক তেমনটি হয় প্রেতলোকে। বাস্তবিক যখন আমরা স্বপ্ন দেখি তখন কখনই তাকে মিথ্যা স্বপ্ন বলে ভাবি না, বরং তাকে সত্য বলেই মনে করি। আসলে স্বপ্নটা আমাদের চিন্তারই আকার বা পরিণতিবিশেষ আর সেটাকেই আমরা মন দিয়ে দেখি। সুতরাং স্বপ্নে আমরা দেখ্‌তে পারি, স্বপ্নে আমরা কোন জিনিস স্পর্শ কর্‌তে পারি, যেকোন শব্দ শুন্‌তে পারি, কিন্তু আসলে সে সমস্তই চিন্তা-রাজ্যের উপাদান। কাজেই স্বপ্নে দেখা কোন দৃশ্য—যেমন গাছ, বিভিন্ন রাস্তা, নদনদী ও নালা সমস্তই চিন্তা বা চিন্তার আকার ছাড়া অন্য কিছু নয়। প্রেতলোকের বায়বীয় স্তর যেন একটি স্বপ্নরাজ্য, আর সেখানে আত্মারা থাকে ও বিভিন্ন সুখভোগ করে কল্পনা দিয়ে। তারা এগুলোকে চায় বলেই পায়। সুতরাং সেটা যেন একটা ভোগ-চরিতার্থের স্থান। আমাদের সব-কিছু চিন্তা, ও সব-কিছু বাসনার সেখানে পরিপূরণ হয়। কিন্তু বাসনা পূর্ণ করার কিছুক্ষণ পরেই আত্মারা আবার সেই ভোগে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, বেশীক্ষণ সেই সুখভোগ তাদের ভাল লাগে না। তখন তারা আবার অন্য জিনিস চায়। তারা পরিবর্তন চায় এবং পূর্বের ভোগের ইচ্ছা ত্যাগ করে। অপর অপর স্বর্গে বায়বীয় স্তরে এমন অনেক আত্মা আছে যারা ক্লান্ত হয়ে ও ভোগে পরিশ্রান্ত। তার কারণ তারা (আগের চেয়ে) আরো চাক্ষুস, আরো প্রত্যক্ষ, আরো স্পষ্ট আদর্শের বা চিন্তার অনুভূতি চায়। সুতরাং তখন তারা ভিন্ন একটা স্তরে বা রাজ্যে অর্থাৎ স্বর্গে যেতে চায়। অনেকে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে চায় কেননা সেখানে তারা বেশী পরিমাণে সুখভোগ ও তাদের শক্তির বিকাশ সাধন করতে পারবে, আর সেজন্য তারা ভোগলোক ধরণীতে জন্মগ্রহণ করে এবং পুনর্জন্ম লাভ করে। অনেকের এমনও শক্তি থাকে যে, তারা তাদের ইচ্ছানুযায়ী মনের মতো মাতাপিতাদেরও নির্বাচন করতে পারে। কোন কোন আত্মা আবার পরলোকের তন্দ্রার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ে।

এই যে মরণের পর ঘুম এটা ধরণীতে আসার পূর্ব-ঘুমেরই মতো কাজেই

বিদেহী জীবাত্মাকে দ্বিতীয় ঘুমের মধ্য দিয়েও যেতে হয়[৬] অর্থাৎ ধরণীতে আবার জন্ম নেবার (পুনর্জন্ম গ্রহণের) আগে প্রত্যেক আত্মা দ্বিতীয়বার তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে ও আপন বাঞ্ছিত পরিবেশের দিকে অগ্রসর হয়। হয়তো আমাদের ভেতর প্রবল ইচ্ছা থাকে যে, আমরা শিল্পী হবো' অথচ যদি তা না হতে পারি, কিংবা সেই ইচ্ছা পূরণ হবার আগেই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাই তো শিল্পী হবার বাসনা কিন্তু ঘুমের অবস্থায়েও আমাদের মধ্যে থেকে যায়। তারপর আবার সেই ঘুমন্ত ইচ্ছা অঙ্কুরিত হবার মতো এমন জাগ্রত হ'তে পারে যে, হয়তো শিল্পীদের স্বর্গেই আমাদের ইচ্ছা টেনে নিয়ে যায়, সেখানে অপরাপর যে শিল্পী-আত্মারা থাকে তাদের সাথে আমাদের যোগাযোগ ও সম্পর্ক হয় ও সম্ভবত তাদের সংগে আমাদের চিন্তারও আদানপ্রদান চলে। তারপর আবার সেই ইচ্ছা ইহলোকে যাতে চরিতার্থ হয় তার জন্য আমরা চেষ্টা করি, শরীরধারণের উপযোগী ক্ষেত্র ও পরিবেশ বেছে নেবারও, যত্ন করি, কেননা পার্থিব শরীরযন্ত্র ছাড়া তো আর আমাদের আদর্শ বা লক্ষ্য পরিপূর্ণ হবার কোন উপায় নেই। এই ধরনের ব্যাপারটাই তখন ঘটে থাকে।

কাজেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত স্বর্গ বা অনন্ত নরকের কোন স্থান নেই। যদি কোন শাস্তির স্থান থাকে তো তা ইহলোক ধরণীই। পৃথিবীতেই মানুষ অসৎ-কর্মের ফলস্বরূপ শাস্তি বা সাজা পেয়ে থাকে। শাস্তি সকল জীবাত্মাকেই পেতে হবে। কিন্তু আসলে 'নরক' কাকে বলে ? যখন কোন জিনিস পাবার জন্য ইচ্ছা বা বাসনা আমরা করি অথচ তা না পাই আর তার জন্য যে অতৃপ্তির অবস্থা তাকেই বলে 'নরক'। অবশ্য সে ধরণের অবস্থা হয় যখন আমাদের ইচ্ছা খুব প্রবল হয় কোন-কিছু পাবার জন্য। যেমন কৃপণ লোকে অভ্যাসই তৈরী করছে তারা টাকাকড়ি নাড়াচাড়া করতে ও তা সাজিয়ে রাখতে, কেননা ওটাকেই প্রাণ দিয়ে সে ভালবাসে। এখন সে মরণের পর প্রেতালোকে সূক্ষ্ম বায়বীয় স্তরে গেলে তার সংগে থাকে কিন্তু সেই টাকাকড়ির ওপর মমতা ও ভালবাসাই, কিন্তু সেই লোক বা সেই অনির্দেশের রাজ্যে

৬। এখানে প্রথম ঘুম ও দ্বিতীয় ঘুমের অর্থ হল মানুষ মরণের ঠিক পরে অজ্ঞানের ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় আত্মা সূক্ষ্মদেহে পরলোকের দেশে অবস্থান করে। পরলোকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য থাকার পর আবার যখন ধরণীতে জন্মগ্রহণ করার প্রবল ইচ্ছা হয় তখন ঠিক পরলোকে ও ইহলোকে এই দুইয়ের ব্যবধানে বায়ুস্তর দিয়ে অতিক্রম করার সময় আবার সে অজ্ঞানাচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ঐ লোকের ব্যবধানকে 'বর্ডারল্যাণ্ড বা 'সীমান্তক্ষেত্র বলে।

পার্থিব টাকাকড়ি আর থাকে না যে, তাই নিয়ে সে নাড়াচাড়া করবে। কাজেই সে হা-হুতাশ করে কষ্ট পায়। তার সেটাই (সে অবস্থায়) হল নরক ও শাস্তিভোগ। কাজেই সত্যিকার নরক যে কি জিনিস তা নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে কঠিন। অথবা বলা যায়, কোন অন্যায় কাজ করলে তার জন্য যে শাস্তি পাবার অবস্থা সেটাই নরক। কাজেই নরক আমরা সৃষ্টি করি আমাদের অসৎ-চিন্তা ও অসৎকাজ দিয়ে। নরক যন্ত্রণা বা স্বর্গসুখ আমরা ভোগ করি কিছুকাল ধরে। এই ভোগও সাময়িকভাবে কিছুক্ষণের জন্য সত্য ব'লে মনে হয়। যেমন স্বপ্ন যতক্ষণ আমরা দেখি ততক্ষণের জন্য সেটা বাস্তব এবং সত্য, কিন্তু আসলে অনন্তকালের কিংবা অনন্তের পরিমাপের সংগে তুলনা করলে সেই সময়টুকু অকিঞ্চিৎকর বলেই মনে হয়। কাজেই স্বর্গ —কি অনন্ত নরক এটা মোটেই সত্য নয়। ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন : "আব্রহ্মভুবনোল্লেকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন",—'হে অর্জুন, পৃথিবী হইতে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত শান্ত ও ক্ষণস্থায়ী। কাজেই পরলোকে যারা যায় তারা অল্পই হোক আর দীর্ঘই হোক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সেখান থেকে ফিরে আসতে বাধ্য।'

স্বর্গ ও নরক দুটোই অনিত্য। একই অবস্থায় তারা অনন্তকাল থাকে না তবে মরণের পরে মানুষ বা প্রাণীদের পক্ষে এ'ধরনের একটা অগ্রগতি হয় : হয় তারা আনন্দলোকে স্বর্গে যাবে, নয় ন্যায়বিচারের নীতি[৭] অনুযায়ী শাস্তিভোগের স্থান নরকে যাবে। ন্যায়বিচারের নীতি বা আইন বেশ কড়া। সেখানে দয়া বলে কোন জিনিস নেই, আসলে তার দোষ বা ত্রুটি যদি কিছু হয় সেটার সামঞ্জস্য-সাধন করে।[৮] কার্য ও কারণের মধ্যে সমতা এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম, একে রদ করা যায় না, অর্থাৎ কার্য থাকলেই তার কারণ থাকবে, আর যেখানেই একটা কারণ পাওয়া যায় তার পিছনে বিকাশ হিসাবে

৭। ন্যায়বিচার নীতি বা 'ল-অব জাসটিস্' হল ভালো কাজ করলে তার ফল হয় ভালো আর মন্দ কাজ করলে তার ফল হয় মন্দ, এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না।

৮। এখানে সামঞ্জস্য করার বা ব্যালান্স রাখার অর্থ হল : মানুষ যদি অন্যায় ও অসৎ কাজ করে তার ফল মন্দ হতে বাধ্য, তাই শাস্তি হয় মন্দ কর্মের ফল অনুসারে। মানুষ সংসারে দুঃখ কষ্ট পায় মন্দ কর্মের ফল হিসাবে কিন্তু ফলভোগের সাথে সাথে তা কেটে যায় আর পরজন্মের জন্য জমা থাকে না, আর এটাই সামঞ্জস্যসাধন।

ফল থাকবেই, যেমন কায়া থাকলে ছায়া থাকে। এটাই হ'ল কার্য-কারণ-নীতির মধ্যে সমতা, অর্থাৎ একটা থাকলে অপরটা থাকবেই। বাইবেলে আছে: 'আমরা যে বীজ রোপণ করি তার ফল অবশ্যম্ভাবীরূপে পাই। এ'নিয়ম এতই প্রবল ও এতই সত্য যে, যদি আমরা কোন জায়গায় বসে থাকি তা যেমন চাক্ষুষভাবে প্রমাণ করা যায়, তেমনি এই অপরিহার্য নিয়মও বাস্তব। আমরা মুখে মুখে এই নিয়মকে অস্বীকার করতে পারি, কিন্তু এর কবল থেকে রেহাই পাবার আমাদের জো নেই। যেমন জোর ক'রে হয়তো মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে[৯] আমরা অস্বীকার করতে পারি আমাদের অজ্ঞানের জন্য, কিন্তু তাকে অস্বীকার ক'রে কিছুতেই আমরা চল্‌তে-হাঁটতে পারি না, কিংবা এই পৃথিবীর বুকে থাকতেই পারি না, কেননা আমাদেরও সকল জিনিসের প্রত্যেকটি গতিই সম্ভব হচ্ছে মাধ্যকর্ষণশক্তির জন্ম। কোন শিশু মাধ্যাকর্ষণশক্তি ব'লে কোন জিনিস আছে কিনা জানে না সত্য, কিন্তু তার অজ্ঞতার জন্য কি ঐ শক্তির বিকাশের কোন ব্যতিক্রম হয়? আমাদের ছেলেমানুষী ক'রে না মানার জন্য প্রকৃতির কোন জিনিস নেই বলে প্রতিপন্ন হয় না, বরং এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, ঐ শক্তি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ভালভাবে নেই। সুতরাং এই যে কার্য-কারণ নিয়ম বা 'কর্মসূত্র' তা কোনদিনই বিধবার অশ্রু বা শিশুর ক্রন্দনের জন্য অপেক্ষা করে না। আমরা যা করি তার ফল ইহলোকেই হোক আর পরলোকেই হোক আমাদের পেতেই হবে। কাজেই সচ্চিন্তা ও সৎ-কাজের ফলে মরণের পর স্বর্গলোকে আমরা সুখ ভোগ করতে পারি।

পরলোকেও নাকি আমাদের কাজকর্ম করতে হয়। আসলে ইহলোকে বা এই ধরণীতে আমাদের মনে যে কাজকর্মের বিশ্বাস বা সংস্কার বা ইচ্ছা থাকে তদনুসারেই আমরা পরলোকে কাজ-কর্মে লিপ্ত হই। তার মানে এ নয় যে, যে ধরনের কাজ এই পৃথিবীতে করি ঠিক তেমনটিই করবো পরলোকেও। সেটা মোটেই সম্ভবপর নয়, কেননা তাই যদি হ'ত তবে পৃথিবীতে জীবন-যাপন করার কোন অর্থই থাকতো না। ধরুন যদি কোন

৯। প্রত্যেক গ্রহ-নক্ষত্র-উপগ্রহেরই একটি আকর্ষণীশক্তি থাকে। সেই আকর্ষণীশক্তির জন্যে গ্রহনক্ষত্রগুলি একে অপরকে আকর্ষণ করে। একেই বলা হয় মাধ্যাকর্ষণশক্তি।

একজন ঝাড়ুদার স্বর্গে গিয়ে অনন্তকাল ধরে সেখানকার রাস্তা ঝাঁট দিয়েই যায়, কোন রাঁধুনীর কিংবা দর্জীর মেয়ে অনন্তকাল ধরে স্বর্গের রান্না করে বা জামাকাপড় সেলাই করে কাটায়, তাহলে জিজ্ঞাসা করি—সেটা কি রকম স্বর্গ! স্বর্গের যে সুখকর পবিত্র ধারণা আমরা করি, তা কি ঐ স্বর্গ থেকে ভিন্ন ধরনের হবে না?

আসলে পরলোকে কাজকর্ম থাকা কিছু অস্বাভাবিক নয়। সেখানকার কর্ম হবে সম্পূর্ণ নীরবে, শারীরিক কর্ম সেখানে অর্থাৎ সেই সূক্ষ্ম মানসলোকে থাকেনা থাকে পার্থিব জড়শরীরের সংস্কার। স্বপ্নকে সেখানে বাস্তব বা সত্য বলে কল্পনা করা হয়। সংস্কারই অচেতন স্তরে প্রেতলোকে কাজ করে। প্রেতশরীর নিয়ে বিদেহী আত্মারা পৃথিবীতে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের ভেতর খবরাখবর করে। যে সকল আত্মা অজ্ঞানতা ও অসৎকাজের জন্য কষ্ট পাচ্ছে—অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের সাহায্য করে ও সান্ত্বনা দেয়, তাদের আলো দেয়, জ্ঞান ও চেতনা দেয়। কিন্তু তাহলে প্রাকৃতিক কার্য-কারণ-নিয়মসূত্রের ব্যতিক্রম করার উপায় নেই, তাকে মানতেই হয়, কেননা কেউ বা কোন আত্মা যদি সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত না হয় তাহলে তাকে ইচ্ছা করলেই সাহায্য করা যায় না। কাজেই কেউ সাহায্য পাবার যোগ্য হ'লে তবে তাকে সাহায্য পাঠানো যায়, নইলে নয়। এ'জন্য সাধারণত একটা নীতিকথার প্রচলন আছে: 'যারা প্রাণপণ চেষ্টা করে তাদেরই ভগবান সাহায্য করেন।' কথাটা কিন্তু নিছক সত্য, কারণ যারা চেষ্টা করে তারা নিজেদের সাহায্য পাবার অধিকারী হিসাবে তৈরী করে, আর সেজন্য পৃথিবী থেকে তারা সাহায্য পায়। সাহায্য পাবার অধিকারী না হ'লে পৃথিবী থেকে কোন সাহায্যই পাওয়া যায় না। কাজেই সাহায্য পাওয়াটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে আমাদের বা বিদেহী আত্মাদের যোগ্যতা ও স্বভাবের (প্রকৃতির) ওপর। তাই মহানুভব লোকনায়কেরা আমাদের বলেছেন: সাহায্য পাবার জন্য নিজেদের তৈরী করতে হয় এবং এমনভাবে সংসারে বাস করতে হয় যাতে আমরা জীবনে সুখ-শান্তি পেতে পারি, আর তাহলেই এক মুহূর্তের জন্যও আমাদের অনুশোচনা করতে হয় না, কেননা ঠিক তখনই আমরা অনুভব করি যে দায়িত্ব আমাদের ওপরই আছে, ভালো হবার ও ভালো ফল পাবার দায়িত্ব আমাদের নিজেদেরই। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ ও জীবনযাপন ক'রে ভবিষ্যৎ জীবনের ও সাথে সাথে বর্তমান জীবনে যা-কিছু করি সেই সকল বোঝাই (দায়িত্বই) আমার নিজের ওপর নিয়েছি।

আমাদের স্বভাব-চরিত্রই (প্রকৃতি) বলুন আর ভবিষ্যৎই বলুন সবই আমরা নিজেদের কাজ দিয়ে নিজেরা সৃষ্টি করি। আমাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ অপর কোন লোকই গড়ে দিতে পারে না, আমাদের ভবিষ্যৎ ভালোমন্দ আমাদের ওপরই নির্ভর করে। তাই সত্য কথা কি, আমরা এক একজন ছোট আকারে সৃষ্টিকর্তা, ছোটখাট সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন তৈরী করি, অদৃষ্টকে গড়ে তুলি ও নিজেদের চিন্তাধারা ও কার্য দিয়ে চরিত্র বা প্রকৃতিও সৃষ্টি করি। সুতরাং যে কাজই আমরা করব তা জ্ঞানপূর্বক ও সচেতন হয়ে করা উচিত। যে নিয়মসূত্র আমাদের জীবনধারাকে নিয়মিত কর্‌ছে তাকে বুঝেই করা উচিত। শুধু যে জড়জগতেই এভাবে চল্‌বো—তা নয়, মানসিক, নৈতিক, বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক এই সকল জগতেই আমাদের ঐভাবে চলা উচিত।

প্রাকৃতিক নিয়মকে বুঝলে আমাদের ভবিষ্যতে উন্নতির পথও উন্মুক্ত হয়। তখন আমাদের দুঃখ করারও আর অবসর থাকে না, অনুশোচনা করারও কোন-কিছু থাকে না, অবিশ্রান্ত আনন্দ ও সুখের স্রোতই জীবনে চল্‌তে থাকে। আমাদের ভেতর যে অবিনশ্বর সত্যবস্তু আছে তাকে ও সত্যিকারের শাশ্বত অবস্থাকে জান্‌লে আমাদের ধরণীর ধূলার জীবনই অবিচ্ছিন্ন সুখ-শান্তিপূর্ণ ও মধুময় হয়ে ওঠে। কিন্তু আমরা যোগ্য নই ব'লে ঐ সত্য আমাদের কাছে প্রকাশিত নয়, বরং লুকানো আছে। এখন আমরা যেন সংসার-সমুদ্রের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছি, কিন্তু সময় একদিন প্রত্যেকের ভাগ্যে আসবেই যখন তার সুপ্ত শক্তি জেগে উঠবে, আর জেগে উঠবে তার পরম-সত্যকে জানার আকুলতা ও দিব্য-ইচ্ছা। কোন জীবন ও সাধনাই বিফলে যায় না। একদিন-না-একদিন প্রত্যেকেই সেই পরমজ্ঞান বা ব্রহ্মানুভূতি লাভ করবে এবং জন্ম-মৃত্যুবর্জিত এমন একটি অবস্থায় উপনীত হবে যেখানে কোন-কিছু বিকৃতি, কোন-কিছু পরিবর্তন থাকবে না, থাকবে নিরবচ্ছিন্ন সত্তা, অফুরন্ত শান্তি ও অনন্তজ্ঞান। কাজেই মৃত্যুকে আমাদের ভয় করার কিছু নেই। মৃত্যু পরিবর্তন বা অবস্থার বিবর্তন ছাড়া অন্য কিছু নয়। এই শরীর আমরা ত্যাগ করতে পারি, এবং আমাদের (জন্মগ্রহণের) ইচ্ছা থাকলে অন্য একটি নতুন শরীর আবার গ্রহণ করবো। ভগবদ্গীতায়ও পাই ঃ "দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা, তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ" প্রভৃতি ; অর্থাৎ শিশুদেহের পর যৌবনশরীর আমরা পাই ও তা ত্যাগ ক'রে

আবার প্রৌঢ়দেহ লাভ করি এবং তাও ত্যাগ করি যেমন পুরাতন বেশভূষা লোকে পরিত্যাগ ক'রে নতুন পরিচ্ছদ গ্রহণ করে। আত্মা অজর ও অমর, আত্মার মৃত্যু নাই, মৃত্যু হয় কেবল জড়শরীরটার।

আসলে মৃত্যুর সময় জড়দেহটাকেই আমরা পুরাতন বলে ত্যাগ করি। যে পুরাতন শরীর আমাদের নানা উপকার সাধন করে সেটাকে ফেলে দিয়ে আবার তার চেয়ে ভালো ও মজবুত আর একটা নতুন দেহ গ্রহণ করি। জ্ঞানীরা তাই মৃত্যুকে ভয় করেন না, তাঁরা মনে রাখেন যে, প্রত্যেকের জন্য অনন্তজীবন একটা আছেই, কোন জীবনই বিফলে যায় না। আর যাঁরা চরম-অধ্যাত্মজ্ঞান, চাক্ষুষভাবে লাভ করেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই অনন্তসত্তার অনুভূতি পেয়েছেন এবং সাথে সাথে উপলব্ধি করেছেন শাশ্বত শান্তি ও সুখ— যে শাশ্বত সুখ-শান্তির অধিকারী হ'য়ে কৃতকৃতার্থ ও মহীয়ান্ হয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ, গৌতম-বুদ্ধ, যীশুখ্রীষ্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ ও পৃথিবীর অন্যান্য লোকনায়কগণ।

ষোড়শ অধ্যায়

॥ প্রশ্ন ও উত্তর ॥

প্রঃ পরলোকে আত্মা কি পূর্ণতার পথে অগ্রসর হয়, অথবা তাকে পুনর্জন্ম নিয়ে মর্ত্যে ফিরে আসতে হয় ?

উঃ জীবাত্মার কামনার উপরই তা নির্ভর করে।

প্রঃ মর্ত্যে ফিরে না এসেই যদি আত্মার বিবর্তন হ'তে পারে তো তার ফিরে না-আসাই শ্রেয় নয় কি ?

উঃ মর্ত্যে শরীর ধারণ করে যে অভিজ্ঞতা লাভ হতে পারে, অপর লোকে তা হবার সম্ভাবনা নেই।

প্রঃ সকল জীবাত্মাই যদি দেহ ধারণ করে পুনর্জন্ম নিতে চায় তো তাতে দেহ মিলবে তো?

উঃ তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তুমি ধারণা করেছো যে, দেহ আত্মার জন্য অপেক্ষা করে থাকে। এটা ঠিক নয়। আত্মাই দেহ সৃষ্টি করে নেয়। বিবর্তনের স্থূল নিয়ম অনুযায়ী সে তা গড়ে নেয়।

প্রঃ দেবদূত স্বর্গচ্যুত হ'লে সে কি দেহ ধারণ করেছিল ?

উঃ এটি একটি পৌরাণিক বিশ্বাস। শয়তানের কথা বলছ তো? পৌরাণিক বিশ্বাস হচ্ছে এই যে, সে ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছিল, তাই তিনি তাকে স্বর্গ থেকে নির্বাসিত করেছিলেন। সে মর্ত্যে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু এ-ব্যাখ্যাটি স্থূল—প্রাচীনযুগীয় মনের উপযুক্ত। এর মধ্যে যথার্থ কোন সত্য নেই। এই ভাবে তখন সৎ ও অসতের ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা হয়েছিল।

প্রঃ আপনি কি বলেন—মৃতেরা জানতে পারে না যে তারা মৃত কি-না ?

উঃ হ্যাঁ, তারা অনেকেই জানতে পারে না। তা ছাড়া তা জানতে অনেক সময় লাগে তাদের।

প্রঃ আচ্ছা, আমরা যে বেঁচে আছি তার কোন নিশ্চয়তা আছে ?

উঃ না, তার কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। আমরা আমাদের মৃতও বলতে পারি।

প্রঃ কোন-কোন মাতাল প্রেতাত্মার প্রভাবে কোন-কোন মিডিয়মও মাতাল হয়ে যায়। এ' ব্যাপারের কেমন করে নিবৃত্ত করা যায়?

উঃ জীবিতকালে যে ব্যক্তি মাতাল ছিল, মরণের পরও তার সেই প্রবৃত্তি সংগে যায়। কিন্তু সেখানে তার সুরা-পিপাসা মেটানোর কোন উপায় না থাকায় সে তখন কোন বন্ধু, আত্মীয় বা মিডিয়মের উপর ভর করে। তাকে সুরাপানে প্রবৃত্ত ক'রে প্রেতাত্মা নিজের পিপাসা মেটায়। যে ব্যক্তির ওপর ভর হয় তার যথেষ্ট ইচ্ছাশক্তি থাকলে সে নিজেকে ঐ প্রেতাত্মার প্রভাব থেকে মুক্ত ক'রে নিতে পারে। তা না হলে অপর কোন সৎ ও অধিক শক্তিশালী প্রেতাত্মার সাহায্যে তাকে অসাধু প্রেতাত্মার প্রভাব থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে।

প্রঃ আত্মা বিশিষ্ট একটি দেহে কি অনির্দিষ্টকাল থাকতে পারে?

উঃ হ্যাঁ, পারে। যে আত্মা জীবনের মৌলিক নিয়মগুলি জেনে যথার্থ জীবন যাপন করে তার পক্ষে তা সম্ভব হয়।

প্রঃ আপনি বলেছেন, মৃতদেহকে কবরে রাখলে আত্মা সেখানে ফিরে ফিরে দেখতে আসে মায়ার টানে, এতে সে কষ্ট পায়। কিন্তু দেহকে পুড়িয়ে দিলে কি তার কষ্ট বেশী হবে না?

উঃ হ্যাঁ, তা অবশ্য হবে। তবে সে অল্পকালের জন্য। কিন্তু দেহটি পুড়ে গেলে কিছুকাল পরে সে তা ভুলে যায়। দেহকে রক্ষা করলে ভোলা সহজ হয় না।

প্রঃ স্বপ্ন বা অচেতন অবস্থায় আত্মা কতো অল্পকাল থাকতে পারে?

উঃ জীবিতদের ও মৃতদের কালের পরিমাণ এক নয়। জীবিতদের পাঁচ হাজার বছর মৃতদের পাঁচ সেকেণ্ডের মতো হতে পারে।

প্রঃ কিন্তু এই সময়টি কত দীর্ঘ হতে পারে? দশ বছর?

উঃ এর উত্তর আমি আগেই দিয়েছি।

প্রঃ হিন্দুদের একটি করণ আছে। যখন কেউ মারা যায় তারা তখন একটি কলসী করে ও গামছা রাখে এবং বিশ্বাস করে সেইগুলির জন্য ঐ মৃতের আত্মা আটবার ফিরে ফিরে আসে। এর উৎপত্তি কি থেকে?

উঃ আমি কখনো এরকম ঘটনা দেখিনি। হয়তো কতকগুলো কুসংস্কার-জাত বিশ্বাস আছে, কিন্তু এমন কখনো ঘটতে দেখিনি যে বুঝবো

আত্মার খাদ্যের প্রয়োজন আছে বা বিদেহী আত্মার পুষ্টি দরকার। বছরে একবার করে অনেকেই খাদ্য উৎসর্গ করে। আমাদের একবছর দেহাতীতদের একদিনও হতে পারে, তাই বছরে একবার করে খাদ্য উৎসর্গ করা হয় তাদের নাম করে ; কিন্তু দরিদ্ররাই তা থেকে উপকৃত হয়।

প্রঃ পরলোকে গিয়ে কি আমাদের স্বজন-বান্ধবদের আমরা চিনতে পারি ?

উঃ হ্যাঁ, পারি।

প্রঃ পুনর্জন্ম আর দেহান্তর-গ্রহণের (ট্রান্সমাইগ্রেসন) মধ্যে তফাৎ কি ?

উঃ আমাদের ধর্মে পুনর্জন্মের কথা আছে। পুনর্জন্ম আর দেহান্তর গ্রহণ এক নয়। পুনর্জন্ম অধিকতর যুক্তিসম্মত। দেহান্তরগ্রহণে যখন তখন খুশিমত পশুদেহে গমন করার কথা আছে, পুনর্জন্মে তা নেই।

প্রঃ আত্মা কি নিজেকে ভাগ করতে পারে ?

উঃ না, তা পারে না। স্থূলদেহ ছাড়বার আগেই আত্মা সূক্ষ্মদেহ গড়ে নেয়, স্থুলদেহ ছাড়লে তাতেই সে থাকে। স্থূলদেহের মধ্যেই সূক্ষ্মদেহ থাকে।

প্রঃ আপনি যে কুয়াসার মতো পদার্থের কথা বলেছেন—সেটি কি ?

উঃ সেই জিনিসটি তড়িৎ-অণুর (ইলেকট্রন) মতো সূক্ষ্মবস্তু। মরণের সময়ে এই বস্তুটিই বেরিয়ে যায় দেহ হ'তে।

প্রঃ মরণের পর এর সংগে আত্মার কি কোন সম্পর্ক থাকে ?

উঃ আত্মা আসলে জীবন, মন, বুদ্ধির উৎস। কুয়াসার মতো বস্তুটি তা নয়। সেই জিনিসটি হচ্ছে পদার্থের কতকগুলি কণিকার পুঞ্জীভূত রূপ।

প্রঃ এইটিই কি 'অহম্' বা 'ইগো' ?

উঃ 'ইগো' থাকে প্রাণসত্তার কেন্দ্রস্থলে। প্রাণকেন্দ্রের মতো এটি থাকে আড়ালে, অদৃশ্য হয়ে।

প্রঃ এই 'ইগো' বা অহমিকার কি অবস্থা হয় মরণের পরে ?

উঃ এটি থেকে যায়, তবে গোপনে অপ্রকাশ অবস্থায় থাকে।

প্রঃ দেহের ওপর আত্মার কি আধিপত্য থাকে ?

উঃ হ্যাঁ, আত্মার মধ্যেই সব নিরাময়শক্তি থাকে।

॥ পরিশিষ্ট ॥

পরিশিষ্ট ঃ প্রথম

[ক'লকাতা 'দি সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটি'-প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতার সারাংশ]

ক'লকাতা কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে অবস্থিত আর্য-সমাজ-হলে ইংরেজী ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটির বাৎসরিক অধিবেশন হয়। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা মাননীয় কামেশ্বরপ্রসাদ সিংহ বাহাদুর ছিলেন সেই অধিবেশনে সভাপতি। গণ্যমান্য মনীষীদের সমাবেশ তাতে হয়েছিল। প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন মহারাজা স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর, কাশিমবাজারের মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ('সার্ভেন্ট-পত্রিকা-র সম্পাদক) এবং অনেক চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক ও বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ। 'পরলোকতত্ত্ব'-সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার জন্য স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ সেই সভায় আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সভা আরম্ভ হবার অনেক আগেই 'আর্যসমাজ হল' শ্রোতৃ-মণ্ডলীর দ্বারা পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

সভা আরম্ভ হবার ঠিক কিছু আগেই স্বামী অভেদানন্দ গৈরিকবসনে সজ্জিত হ'য়ে হলে অর্থাৎ সভাগৃহে প্রবেশ করলেন। তাঁর প্রিয়দর্শন দেহ, প্রশান্তোজ্জ্বল গম্ভীর মূর্তি সমস্ত শ্রোতাদের মধ্যে এক পুণ্য পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। সেই দৃশ্য সহজে ভোলার নয়।

'অমৃতবাজার পত্রিকা-র বাবু পীযূষকান্তি ঘোষ সেই সভার একজন উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন আগামী বৎসরের জন্য ক'লকাতা সাইকিক্যাল সোসাইটির সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন স্বামী অভেদানন্দ এবং এজন্য তাঁকে আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি। তাঁর ঘোষণাকে সকলে একবাক্যে সমর্থন করেন। তখন সভাপতি দ্বারভাঙ্গার মহারাজা অভিভাষণ দেন এবং স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে বক্তৃতা দেবার জন্য অনুরোধ করেন।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ প্রথমেই আমেরিকায় কিভাবে প্রেততত্ত্বানুশীলনের সৃষ্টি, বিকাশ ও বিস্তার হয়েছিল এবং আমেরিকা থেকে কিভাবে ধীরে ধীরে অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশগুলিতে তা ছড়িয়ে পড়েছিল সেই সম্বন্ধে সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ সুদীর্ঘকাল আমেরিকায় থাকাকালে কিভাবে

তিনি প্রেততত্ত্বানুশীলনের প্রতিষ্ঠানগুলি ও তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষভাবে প্রেত-বৈঠকের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে বলতে থাকেন। তিনি কিভাবে হার্ভার্ডের অধ্যাপক উইলিয়ম জেন্‌স্‌, অধ্যাপক মায়ার্স ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ মনীষীদের বিদেহী আত্মার-দর্শন লাভ করেছিলেন সেকথাও বলেন।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বললেন বিচিত্রভাবে অভিজ্ঞতাপূর্ণ ঘটনা সম্বন্ধে ও মানুষ মরে গেলে পরে কি হয়। মরণের পর মানুষ প্রেতজীবনের নানাস্তর অতিক্রম করে পরলোকে যায়। যারা এ জগতে অসৎ জীবন যাপন করে মরণের পর যায় আলোকহীন অনন্ত অন্ধকারের দেশে, ভোগ করে সেখানে নানা দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণা। সৎস্বভাবের লোকেরা মৃত্যুর পর ভিন্ন লোকে যায়, তাদের হয় সদ্‌গতি।

তারপর স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ প্রেতাত্মাদের সংগে তাঁর যে-সব যোগাযোগ হয়েছিল তাদের চাক্ষুষ ঘটনার কথা বর্ণনা করতে লাগলেন। তিনি বল্লেন : একবার কোন একটা প্রেতবৈঠকে তিনি উপস্থিত ছিলেন ও একটা অদ্ভুত ঘটনা সেখানে ঘটেছিল। অন্ধকার ঘরের মধ্যে একটি গ্রামোফোন-বাক্স একটি টেবিলের ওপর রাখা হয়েছিল আর তার তলার এককোণে কিছু গন্ধক মাখিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ঘরটা নির্দিষ্ট ছিল প্রেতাবতরণ-বৈঠকের জন্য। ঘরের দরজা-জানালাগুলো ভালো করে বন্ধ করা ছিল। বৈঠক আরম্ভ হবার সংগে সংগে গ্রামোফোন-বাক্সটা হঠাৎ দেখতে দেখতে শূন্যে উঠতে লাগলো, ঘরের ছাদ স্পর্শ করলে, তারপর পাখী যেমন ওড়ে সেরকম ঘরের চারকোনে ঘুরতে লাগল ও একটা নির্দিষ্ট গান তাতে পুরোদমে বাজতে লাগল। অকস্মাৎ দম্‌ করে একটা জোর শব্দ শোনা গেল, দেখলাম দেওয়াল ভেদ করে বাক্সটা বাইরে চলে গেছে। শোনা গেল বাইরেও ঠিক সেইভাবে ঘুরছে এবং গানও সংগে সংগে শোনা যাচ্ছিলো। পনের মিনিট পরে আবার একটা জোর শব্দ হল, দেখলাম গ্রামোফোন-বাক্সটা আবার ঘরের ভেতর চলে এলো। তখনও সেই একই রকম সুর—সেই একই গান তাতে বাজছে। সমস্ত ঘটনাটা ঘটলো পাঁচ মিনিটের ভেতর।

আর একটা বৈঠকে ঘটলো, তাতে অপর একটা ঘটনা ; সেটাও কম কৌতুক কর ছিল না। সেখানে স্বামীজী শুনেছিলেন যে, কোন একটা প্রেতাত্মাকে খবর এনে দিতে, কিন্তু তাঁর শরীরের ওপর স্পর্শ অনুভব করলেন কতকগুলো

হাতের। তিনি চারিদিকে শশব্যস্ত হয়ে চেয়ে দেখলেন, কিন্তু কাকেও কোথাও দেখতে পেলেন না। তিনি আরও বিস্মিত হলেন যখন শুনলেন একজন প্রেতাত্মা তাঁকে সম্বোধন করে বলছে : 'স্বামী, তুমি কি মনে করো যে, মিডিয়ম নিজে এসব কাজ কর্‌ছে ?'

তারপর সে বৈঠকেই আবার আর একটা ঘটনা ঘটলো সেটা ছিল আরো বিস্ময়কর। যেমন স্বামীজী অন্ধকার ঘর ছেড়ে তাঁর পূর্ব-আসনে বস্‌তে যাবেন অমনি দেখতে পেলেন যেন একটি মেয়ে তাঁর চেয়ারটি দখল করে বসে আছে। তিনি আরো বিস্মিত হলেন। দেখলেন, মেয়েটির রক্তমাংসের শরীর, কোন প্রেতাত্মা দেহ ধারণ ক'রে এসেছে। তিনি যেই তার কাছে গেলেন অমনি মেয়েটি উঠেই স্বামীজীর সংগে করমর্দন করলেন। তিনি স্পষ্ট অনুভব করলেন মেয়েটির হাত ঠিক তাজা মানুষের মতো গরম, ঠাণ্ডা নয়। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর হাতেই প্রেতাত্মার হাতটি গলে বাতাসে মিলিয়ে গেল। মেয়েটির শরীরও গেল অদৃশ্য হয়ে।

স্বামী অভেদানন্দজী বল্লেন : কতকগুলো প্রেতাত্মা (সকলে নয়) মিডিয়মদের সাহায্য না নিয়েই পার্থিব দেহ নিয়ে দেখা দিতে পারে। তারা সোজাসুজি সকলের সংগে যোগাযোগ স্থাপন করতেও পারে ? তিনি উল্লেখ করলেন যে, স্যার আল্‌ফ্রেড টার্নারের একটি ঘরে প্রেতবৈঠকে স্বতন্ত্র একটি গলার স্বর শুনেছিলেন, তিনি স্বামীজী ও অন্যান্যকে সম্বোধন করে বলেছিলেন : 'ভাই, সান্ধ্য নমস্কার জানবে।'

কিন্তু সকল প্রেতাত্মার শক্তি থাকে না জড়শরীর ধারণ করার। যাদের মানসিক বা ইচ্ছাশক্তি খুব প্রবল তারাই কেবল বিদেহ অবস্থায়ও দেহ ধারণ করতে পারে। তারপর এখানে মনে রাখতে হবে যে, প্রেতাত্মারা জড়শরীর ধারণ করে বটে, কিন্তু তারা জানতে পারে না তারা শরীর ধরেছে কিনা, তাই বেশীক্ষণ তারা শরীরটাকে ধরে রাখতে পারে না, কিছুক্ষণ পরেই দেহটা গলে বাতাসে মিলিয়া যায়।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বক্তৃতাপ্রসংগে বললেন অবশ্য গোঁড়া ও ভাবপ্রবণ খ্রীষ্টানদের মন থেকে অনেক-কিছু ভুল ও অলৌকিক বিশ্বাস দূর করেছে পরলোকতত্ত্বের আন্দোলন ও অনুশীলন। খ্রীষ্টানেরা যে বিশ্বাস করেন মৃতাত্মারা আবদ্ধ থাকে কবরের মধ্যে, যতদিন না তাদের শেষ বিচারের দিন আসে—এর বিরুদ্ধেও প্রেততত্ত্ববাদ যথেষ্ট-কিছু জেহাদ ঘোষণা করেছে।

আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের লোকেরা এখন বিশ্বাস করতে চায় না যে মৃতাত্মা কবরের মধ্যে শেষ-বিচারের দিন পর্যন্ত পড়ে পড়ে পচবে ও তারপর উঠে যাবে বিচারের জায়গায়, পাবে হয় নরক, নয় স্বর্গ। খ্রীষ্টান চার্চ-সমর্থিত অনন্ত নরকাগ্নি-মতবাদটির ওপর থেকে পাশ্চাত্যের শিক্ষিত ও চিন্তাশীল লোকদের বিশ্বাস ক্রমশঃ লোপ পেয়ে যাচ্ছে। এখন যাদের দৃষ্টিভঙ্গি বেশ যুক্তিপূর্ণ তাদের কাছে খ্রীষ্টানদের ঐ সব মতবাদ হাস্যকর বলে মনে হচ্ছে।

স্বামী অভেদানন্দজী বলেন: কিন্তু প্রেতানুশীলনে নানা কৌতুহলোদ্দীপক ব্যাপার সংঘটিত হলেও অনেক অনিষ্টকর দিকও আছে: অনেকে নাকি দাবী করেন যে মানুষের ধর্মজীবনের অনেক রহস্য ভেদ করে পরলোকতত্ত্ব, কিন্তু তা ঠিক নয়। যাঁরা আত্মার কল্যাণ চান, যাঁরা আত্মজ্ঞান লাভ করতে ইচ্ছুক সেই সাধকদের কোন উপকারই সাধন করতে পারে না প্রেততত্ত্ববাদ। যে-কোন লোকের ধর্মজীবনকে গড়ে তুলবে এই যে মতবাদ তা অচল বলে প্রমাণিত হয়েছে। বরং এই মতবাদে অনেকে ভ্রমেও পড়েছে। প্রেতানুশীলন-আন্দোলনের জন্য অনেক লোক জীবনে ভুল করেছে এবং প্রেততত্ত্ববাদ থেকে ধর্ম যে সম্পূর্ণ পৃথক এটাও তারা নির্ণয় করতে পারেনি। আসলে পরলোকতত্ত্ব ও ধর্ম দুটো একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির জিনিস। পরলোকতত্ত্বের কাজ হল প্রেতাত্মা ও পরলোকবাসীদের নিয়ে আলোচনা কিন্তু ধর্মের কাজ হল মানুষকে প্রেরণা দেওয়া ও উদ্বুদ্ধ করা, দুঃখ-কষ্টের বাঁধনকে ছিন্ন করে পরমাত্মার স্বরূপকে উপলব্ধি করা। ভূতপ্রেতের সংগে কারবার ও প্রেতলোকের আলোচনা বরং মানুষের মনকে নিম্নগামী করে, কিন্তু ঈশ্বরের প্রণিধান ও ধ্যান-ধারণা মানুষের পার্থিব জীবনকে স্বর্গীয় ও শাশ্বত করে। কাজেই অধ্যাত্ম-ব্যাপারে প্রেততত্ত্ব কোন ব্যবহারে লাগে না। প্রেতাত্মাদের সংগে মেলামেশা বরং অনেকাংশে মানুষের ভাগ্যে দুঃখপূর্ণ পরিণতিই এনে দিয়েছে। প্রেততত্ত্বানুশীলনে মিডিয়মদের কোন বৌদ্ধিক, নৈতিক বা আধ্যাত্মিক এই কোনটারই উপকার সাধন করে না। ক্রমাগত প্রেতাবেশ অভ্যাস করায় মিডিয়মদের মনও দুর্বল হয়, মস্তিষ্কের শক্তি নষ্ট হয়, ফলে তারা হয় পাগল, নয় দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্থ। প্রেতবৈঠকে যেসব মেয়ে-পুরুষেরা প্রায় অনবরতই বসে তাদের মন যেন অচল ও বিচারহীন হয় ও তারা হয়ে দাঁড়ায় চিন্তাবিবর্জিত পশুতুল্য। যেসব লোকেরা আবার দুষ্ট প্রেতাত্মাদের পাল্লায় পড়ে তারা তাদেরই হাতে হয় আবার ক্রীড়নক মাত্র। বিচারশক্তি তাদের

কমে যায়, মনুষ্যজীবনের আশীর্বাদ যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তা থেকেও তারা বঞ্চিত হয় এবং পরিশেষে তাদের জীবনের পরিণতি হয় শোচনীয়। কাজেই প্রেততত্ত্ববাদের সংগে ধর্মের মিল আছে এই মনে করে কোনমতেই ভুল করা উচিত নয় কারো। প্রেতানুশীলন কিছুটা কৌতূহল নিবৃত্তি করতে পারে আর আনে বিশ্বাস যে মরণের পরও আমাদের সত্তা থাকে, এছাড়া আর বেশী কিছু করতে বা দিতে পারে না। কিন্তু ধর্মের প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। ধর্ম-সাধনার অভ্যাস করলে মানুষ লাভ করে অনন্ত সুখ-শান্তি। ধর্ম মানুষকে যাওয়া-আসার বন্ধন থেকেও মুক্তি দেয়।

পার্থিব জীবনের সীমা ও বন্ধনকে অতিক্রম করতে হ'লে, কিংবা অজ্ঞান, ভ্রম ও অসত্যের পারে যেতে গেলে আমাদের বেদান্তসম্মত সাধনা জানা উচিত। যোগসাধনায় তত্ত্বজ্ঞানলাভ ছাড়া কোন লোকই জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। মন-মুখ এক হ'য়ে নিয়মিতভাবে যোগাভ্যাস দ্বারাই একমাত্র জীবন-রহস্যের দ্বার উন্মুক্ত হ'তে পারে। আত্মতত্ত্ব জানা, জন্ম-মৃত্যুকে অতিক্রম করা—জন্মগ্রহণের আগে ও মৃত্যুর পরে আত্মসত্তার বিবরণ জানা, এগুলিই মুক্তির একমাত্র পথ। আগেই বলেছি যে, প্রেততত্ত্ব নয়, ধর্মই একমাত্র সাহায্য করতে পারে মানুষকে তার সত্যকারেব স্বরূপ জানতে, আর সেই স্বরূপ জ্ঞানময়, সর্বব্যাপী, কূটস্থ পরমচৈতন্য। সুপ্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত ধর্মের ইতিহাস এ'কথারই সাক্ষ্য দিয়ে আসছে। সকল সত্যদ্রষ্টা, ধর্মবক্তা ও অবতারকল্প মহাপুরুষদের আমরা মানবসমাজের অধ্যাত্ম আদর্শের জীবন্ত বিগ্রহ বলে মনে করি, কারণ তাঁরাও বড় হয়েছিলেন একমাত্র অধ্যাত্মসাধনারই ভেতর দিয়েই। অবিশ্রান্ত অকপট সাধনাই তাঁদের অসত্যের অন্ধকার দূর ক'রে সত্যের আলো দেখিয়েছিল, তাঁদের অজ্ঞান ও মায়ার আবরণকে সরিয়ে দিয়েছিল। আত্মানুভূতি লাভ ক'রেই তাঁরা জীবনের যত দুঃখ, যত কষ্ট ও যন্ত্রণা থেকে চিরদিনের জন্য অব্যাহতি পেয়েছিলেন।

অনেক লোকই ভুল ক'রে মনে করেন এবং বিশ্বাস করেন যে, বেদান্তের শিক্ষা মানুষের জীবনকে শুষ্ক, একঘেয়ে ও নাস্তিক করে তোলে। তাঁরা বলেন, বেদান্ত মানেই হল শুষ্ক জ্ঞানের বিচার। কথাটা অবশ্য মিথ্যা নয়, কেননা বেদান্ত বিচারবর্জিত কোন জিনিসকে কোনদিনই সমর্থন করে না কিংবা যে কোন জিনিসকেই সে বিনা-বিচারে গ্রহণ করবারও প্রশ্রয় দেয় না। আর এটা অতীব সত্য যে, বিচার-বুদ্ধি ছাড়া অসত্য থেকে সত্যনির্ণয় করাও

যায় না। কাজেই চরমসত্যকে জানতে গেলে বুদ্ধি ও বিচারের সাহায্য ছাড়া উপায় নেই ; বিচার-বুদ্ধিকে আশ্রয় আমাদের করতেই হয়। সুতরাং একথা মোটেই সত্য নয়—বরং অবান্তরই যে, বেদান্তের সাধনা মানুষের জীবনকে শুষ্ক ও নাস্তিক করে। বরং বেদান্তের উদার শিক্ষা মানুষের জীবনযাত্রাকে মধুময় ও অবিশ্রান্ত শান্তির ধারায় আপ্লুত ক'রে তোলে। অনন্ত ও অফুরন্ত সুখ ও আনন্দের উৎসেই বেদান্ত নিয়ে যায় মানুষকে। বেদান্তের শিক্ষা আমাদের উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত করে অদ্বিতীয় সত্তাকে জানতে, এবং বুঝতে যে জীব ও ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন। সকল ধর্মের এটাই কিন্তু আসল লক্ষ্য। যেকোন ভাগ্যবান এই শাশ্বত অবস্থাকে উপলব্ধি করতে পারেন তিনি ইহজীবনেই অনন্ত সুখ ও অনন্ত শান্তি লাভ করেন।

পরিশিষ্ট ঃ দ্বিতীয়

॥ প্রশ্ন ও উত্তর ॥

[স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের সঙ্গে পরলোকতত্ত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা করার যতটুকু আমাদের সুযোগ হয়েছিল তার কিছু অংশ এখানে স্মৃতি থেকে দেওয়া হোল]

প্রশ্ন—স্বামীজী, মৃত্যুর ঠিক আগে ও পরে মানুষের আত্মার অবস্থা কি রকম হয়।

উত্তর—মৃত্যুর ঠিক পূর্বে মানুষের আত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয় থেকে প্রাণশক্তিকে ধীরে ধীরে টেনে নেয়। দীপশিখা নির্বাপিত হবার আগে যেমন ধীরে ধীরে তা নিষ্প্রভ হয়ে আসে, তেমনি মৃত্যুর ঠিক আগে মানুষের ইন্দ্রিয়গুলো ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে যায়। তারপর প্রদীপ একেবারে নিভে যাবার মতো মানুষের প্রাণশক্তিও স্তব্ধ হয়ে যায়। তবে আশ্চর্যের বিষয় হল, ইন্দ্রিয়দের শক্তিগুলো কিন্তু তীক্ষ্ণ ও সতেজ হয়ে ওঠে তখন। আত্মা বা প্রাণশক্তি ঠিক দেহ ছেড়ে যাবার আগের মুহূর্তে মানুষ অজ্ঞান হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে এবং সেই অবস্থায়ই প্রাণশক্তি দেহ ছেড়ে চলে যায় কুয়াসার মতো আকার নিয়ে।

প্রশ্ন—তাহলে মরণের পরে অবস্থা নিশ্চয়ই ভয়ংকর হয় ?

উত্তর—হ্যাঁ, পৃথিবীতে ভোগের মায়ায় যে সব প্রেতাত্মা আসক্ত থাকে তাদের অত্যন্ত কষ্ট হয়। তাদের এমন অবস্থা হয় যে তারা যে ম'রে গেছে, শরীর তাদের নেই একথা জানতে পারে না। সেই অবস্থায় প্রেতাত্মা তার জীবনের সকল সংস্কারই বহন করে নিয়ে যায়। পরে ঘুম ভেঙ্গে গেলে সূক্ষ্মস্তররূপ প্রেতলোকে প্রবেশ করে। এই যে প্রেতলোক এটাও মানুষের নিজের কল্পিত, তাই একে মানসলোকও বলে। সেখানকার পরিবেশ হল কম্পনমাত্র। বিদেহী আত্মাদের সকল সুপ্ত বাসনা সেখানে জেগে ওঠে। প্রেতলোকেও অনেকে ঘুমোয়, তবে কালের পরিমাণ সকলের সমান নয়।

প্রশ্ন—প্রেতশরীর কি তখন নির্জন অজানা একটি রাজ্যে পদার্পণ করে ?

উত্তর—হ্যাঁ, তাই বটে। এটাকে পরিষ্কার করে বল্লে একটা উদাহরণ দিতে হয়। মনে করো, তুমি কলকাতার মত বড় ও লোকবহুল শহরের

বাসিন্দা। গভীর রাত্রে সেখানে একটা ভূমিকম্প হল, ফলে সমস্ত শহরটা একটা ধ্বংসস্তূপেই পরিণত হলো। যত বাড়ী-ঘর পড়ে গেল, ধ্বংস হয়ে গেল সারা শহরটা। সেই অবস্থায় তোমার চোখে যদি একটা কাপড় বেঁধে দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় তো অবস্থাটা কি দাঁড়ায় একবার কল্পনা করো। ঠিক এ'রকম দুরবস্থাই হয় মরণের পর মায়াবদ্ধ হতভাগ্য প্রেতাত্মাদের কপালে।

প্রশ্ন—এ' রকম দশা কি সকল প্রেতাত্মাদের ভাগ্যেই ঘটে?

উত্তর—না, তা নয়। পৃথিবীর মায়ায় আবদ্ধ সাধারণ প্রেতাত্মা যারা তারাই কেবল এ' ধরণের যন্ত্রণা ভোগ করে। কিন্তু যারা পুণ্যাত্মা তাদের গতি হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা মৃত্যুর পর সহজে ও নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী এখানে সেখানে ঘোরাফেরা করতে পারে এবং নিজেদের পুণ্যের ও পবিত্রতার অলোকচ্ছটায় পথ দেখ্‌তে পায়।

প্রশ্ন—স্বামীজী, আপনাকে আবার জিজ্ঞাসা করতে পারি কি—মরণের পর আত্মা যায় কোথায়?

উত্তর—যায় যেখানে সে আছে। আচ্ছা বলো দেখি—ঘুমুলে তুমি যাও কোথায়? তখন নিশ্চয়ই বাইরে কোথাও যাও না, থাকো মনেরই মধ্যে (মনোরাজ্যে)। মরণের পর মনোরাজ্য ছাড়া আত্মার গতি অপর কোন জায়গায় হয় না। আমরা নিদ্রার সময় যেমন স্বপ্নলোকে থাকি, মরণের পরও ঠিক তাই। অর্থাৎ আত্মারা তখন মনোময় জগতে বাস করে। সেই প্রেতলোক তথা মনোলোকে তারা সবকিছুই করে—তারা সর্বত্রই যায় মনের মাধ্যমে (কল্পনায়)। তখন জড় জিনিস বলে কোন কিছুই তাদের কাছে থাকে না। যে দেহটা নিয়ে তারা থাকে তা-ও সূক্ষ্ম (সূক্ষ্মশরীর), সেটা তৈরী সতেরটা সূক্ষ্ম উপাদানে। সেই সতেরটা উপাদান হল: পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি। সাংখ্যকার কপিল ও অন্যান্য হিন্দু-দার্শনিকরা সতেরটি উপাদান দিয়ে তৈরী দেহকে 'সূক্ষ্মশরীর' বলেছেন।

প্রশ্ন—মানুষ প্রার্থনা ও সচ্চিন্তা করলে কেমন ক'রে প্রেতাত্মাদের তা উপকার-সাধন করে?

উত্তর—আমি আগেই বলেছি—ঠিক মৃত্যুর পরে কেউ জানতে পারে না

যে তার দেহটা চলে গেছে, বা পূর্বদেহে সে আর নেই। তখন মূর্ছার মতো অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে প্রেতাত্মারা পড়ে থাকে। তাই কল্যাণকামীরা তাদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা ও সচ্চিন্তা করলে কম্পনের আকারে তারা প্রেতাত্মাদের কাছে গিয়ে পৌঁছায় ও তাদের সাহায্য করে। নিকট আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়তম বন্ধুবান্ধবেরা কল্যাণেচ্ছা করলে তার প্রভাব প্রেতাত্মাদের কাছে যায় ও তাদের অবস্থার উন্নতি সাধন করে। এইভাবে প্রার্থনা ও ইচ্ছা করলে প্রেতাত্মাদের মনের নিগূঢ় অন্তরে একটা কম্পন সৃষ্টি করে, ফলে তাদের সুপ্তজ্ঞান আবার জাগ্রত হয় এবং তখনি ঠিক তারা জানতে পারে যে জড়শরীর তাদের নেই, সত্যিকারের তারা মৃত। পৃথিবীতে আত্মীয়-স্বজনদের কান্না ও শোকোচ্ছ্বাস তাদের প্রাণে কষ্ট দেয়, তাই তারা প্রেতলোকে যেতে বাধ্য হয়, দুঃখ-কষ্টই তাদের প্রেতলোকে টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের কল্যাণেচ্ছা তাদের লুপ্তজ্ঞানকে ফিরিয়ে আনে এবং ঠিক তখনই তারা পৃথিবী ও প্রেতলোকের 'সীমানাদেশ' বা বর্ডারল্যাণ্ড পার হবার চেষ্টা করে। সেই সীমানাদেশটিও আসলে কম্পনের সমষ্টি ছাড়া অন্য কিছু নয়; সেটা যেন একটি ইথার বা আকাশের নদী; তাকে তুলনা করা যায় নিরপেক্ষ একটি জায়গার সংগে। হিন্দুরা এই জায়গা বা অবস্থাটিকেই বলেন 'বৈতরণী', পার্শীরা বলেন 'ছিন্নৎব্রিজ', মুসলমানেরা বলেন 'সিরৎ'। ঐ সীমানাদেশ বা 'বৈতরণী' অনায়াসেই পার হতে পারে না সেই সব প্রেতাত্মা যারা সাধারণ অর্থাৎ পৃথিবীর মায়ায় আবদ্ধ। সাধারণত তাই তারা যায় এমন সব জায়গায় যেখানে গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। সেই প্রেতলোকের অন্ধকারকে উপনিষদে বর্ণনা করা হয়েছে,

অসূর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥ —ঈশ-উপঃ ১।৩

অর্থাৎ এমন সব লোক বা স্তর আছে যেখানে অনন্তকাল ধরে অন্ধকার রাজত্ব করে। যেখানে সূর্য বা কোন গ্রহের আলোই পড়ে না। যারা আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করে না বা যারা আত্মজ্ঞান পাবার চেষ্টা পর্যন্ত করে না তারাই মরণের পর ঐসব অন্ধকারলোকে যায়।

সত্যই সূর্য, চন্দ্র ও তারকারা প্রেতলোকে আলো দেয় না, কারণ তারা হল এ'জগতের জিনিস, সেই জগতে তাদের প্রবেশ নাই। প্রেতলোক সূক্ষ্মলোক, কাজেই স্থূল জিনিসের সেখানে স্থান হবে কেন ?

প্রশ্ন—তাহলে যে-সব প্রেতাত্মারা মায়ায় পড়ে রয়েছে পৃথিবীর ওপর তাদের অবস্থা নিশ্চয়ই অত্যন্ত শোচনীয়।

উত্তর—নিশ্চয়ই। যদি মায়াসক্ত প্রেতাত্মাদের আতৃপ্ত বাসনা কোন রকমে চরিতার্থ না হয় তো তাদের অবস্থা ক্রমশই শোচনীয় হতে থাকে। তারা অবশ্য তাদের মরণের খাং নিজেরাই খোঁড়ে। জড়-জিনিসকে ভোগ করার বাসনা তখন তাদের মধ্যে তীব্র হয়ে ওঠে। অথচ যদি বাসনা তাদের অতৃপ্ত থেকে যায় তবে তারা বাসনা-কামনার আগুনে পুড়ে মরতে থাকে। আসলে তুমি যেমন করবে তার ফলও তেমনি পাবে। সকল বাসনাই মানুষ ও প্রাণীদের ভেতর সংস্কারের (সূক্ষ্ম) আকারে থাকে। মন যেন আধারবিশেষ, অথবা সংস্কারের সেটা যেন বাণ্ডিল স্তূপ। দেহের মৃত্যু হলেও সংস্কার মরে না। তাই মানুষ মরে গেলেও সমস্ত সংস্কারই সূক্ষ্ম বা বীজের আকারে মনের মধ্যে থাকে।

প্রশ্ন—স্বামীজী, দ্বিতীয় সত্তা বা ভৌতিক দেহ কাকে বলে ?

উত্তর—দ্বিতীয় সত্তা, (ডবল) বা ভৌতিক দেহ জড়দেহেরই একটা দ্বিতীয় বা ভিন্ন রূপ ছাড়া আর কিছু নয়। মরণের সময় ঐ ভৌতিক সূক্ষ্মদেহটা শরীর ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু সেটা চলে গেলেও শরীর ও তার ব্যবধানে থেকে যায় বাষ্পের আকারে একটি যোগসূত্র। পরিশেষে ওটাও যায় গলে। আত্মা বা সূক্ষ্মদেহ থাকে তখন অচেতন অবস্থায়—যেমন মাতৃগর্ভে শিশু থাকে প্রাণ নিয়ে, কিন্তু বাইরের চেতনা তার থাকে না।

প্রশ্ন—প্রেতাত্মাদের সংগে সংযোগ স্থাপন করা কি যায় ?

উত্তর—নিশ্চয়ই যায়। মিডিয়ামকে সহায় ক'রে প্রেতাবরণ-বৈঠকে সেই সব প্রেতাত্মা যারা আধো-জাগরণ অবস্থায় থাকে তারা অনেকে মানুষের স্বার্থের খাতিরে শান্তিময় ঘুম ছেড়েও পৃথিবীর স্তরে আসতে বাধ্য হয়। অনেক প্রেতাত্মা আবার নিজেরাই নেমে আসার জন্য উদ্‌গ্রীব থাকে। কিন্তু তারা আসে বা আত্মপ্রকাশ করে সম্পূর্ণ ঘুমের অবস্থায়। এমন দেখা গেছে যে, মিডিয়মের যে রাস্তা দিয়ে প্রেতাত্মারা অবতরণ করে সেটা

খোলা থাকলে তারা আর আত্মসংযম রক্ষা করতে পারে না, ভিড় করে নেমে আসার জন্য।

প্রশ্ন—বিদেহী প্রেতাত্মারা কি আবার দেহ ধারণ করতে পারে?

উত্তর—পারে বৈকি। বিদেহী প্রেতাত্মাদের সূক্ষ্মাবরণ বা সূক্ষ্মদেহ মিডিয়মের শরীর থেকে বায়বীয় আকারের এক্টোপ্লাজম্-রূপ উপাদান আহরন ক'রে জড়দেহ ধারণ করতে পারে। তবে ঐ যে প্রাণশক্তি আহরণ করে সেটা মিডিয়ম যখন অচেতন অবস্থায় থাকে তখন। তারা আত্মপ্রকাশ করে ছায়ার আকারে। কখনও কখনও তারা চলা-ফেরা করে, কথা কয় প্রভৃতি। যে-সব লোকের মনের শক্তি খুব বেশী তারা ঐ ভৌতিক ছায়াশরীর দেখ্তে পায়। প্রেততাত্ত্বিকেরা এসব নিয়ে অনেক গবেষণা আলোচনা করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে মিডিয়মের শক্তিকে ধার করে প্রেতাত্মারা এই জগতে সাময়িকভাবে দেহধারণ কর্তে পারে।

প্রশ্ন—প্রেতাত্মারা কি আবার পৃথিবীতে জন্মায়?

উত্তর—জন্মায় বৈকি। যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ তার বাসনা-কামনার বাঁধন ছিঁড়তে ও জন্ম-মৃত্যুর চক্রকে অতিক্রম করতে পারে ততক্ষণ তাকে বারবার পৃথিবীতে জন্মাতেই হবে। অল্প বা বেশীক্ষণ পরেই হোক বিদেহী আত্মারা নূতন জীবন নিয়ে পৃথিবীতে জন্মাবার প্রবল ইচ্ছা অনুভব করে। অতৃপ্ত বাসনার বীজ তাদের বাধ্য করে পৃথিবীতে আবার জন্মাবার জন্য। কাজেই জন্মাবার আগে তাদের মন বা ভাবের অনুয়ায়ী তারা মাতাপিতা, পরিবেশ ও আবেষ্টনী নির্বাচন করে। আবার তারা অচেতন অবস্থায় উপনীত হয়, তাদের সূক্ষ্মদেহের মৃত্যু হয় যেমন জড়দেহের মৃত্যু হয়েছিল পৃথিবীর ওপর। সৃষ্টি ও বিনাশের প্রবাহে পড়ে তারা আংশিক তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে আবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। পৃথিবীতে এসে ধীরে ধীরে পূর্বেকার ঘুমের অবস্থাকে তারা কাটিয়ে উঠতে থাকে।

প্রশ্ন—পরলোক-সম্বন্ধে জানার জন্য কি প্রেততত্ত্ব-অনুশীলন করা ভালো নয়?

উত্তর—আমার মনে হয় ওটা ঠিক নয়, কেননা যাঁরা সত্যিকারের আত্মজ্ঞান লাভ করতে ইচ্ছুক, প্রেততত্ত্বানুশীলন তাঁদের বরং ক্ষতিসাধন করে। মনুষ্যজীবনের লক্ষ্যই হ'ল অসার ও অশাশ্বত যেসব জিনিস তাদের জ্ঞান লাভ করা নয়, পরন্তু যা পরমার্থ ও শাশ্বত কল্যাণকর সত্যবস্তু তাকে লাভ করা। জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রেতলোক আছে না হয় মেনে নেওয়া

গেল, কিন্তু সত্যিকারভাবে তারা মানুষের মনের কল্পনারই পরিণতি। প্রেতাত্মারা স্বরূপে জন্মরহিত, অমর,—সৃষ্টি তাঁদের কোনদিনই হয়নি। জন্ম ও মৃত্যু—আসা ও যাওয়া আসলে আপেক্ষিক পৃথিবীর জিনিস। অজ্ঞান-আবরণের জন্যই লোকে মনে করে সে মরছে বা জন্মাচ্ছে। আত্মজ্ঞানরূপ স্বয়ং জ্যোতিষ্মান আলোর দ্বারা অজ্ঞান-অন্ধকার যথন দূর হয় তখন মানুষ উপলব্ধি করে তার শাশ্বত আনন্দময় স্বরূপ। প্রেততত্ত্ব কখনও কোনদিন মানুষকে জন্ম—মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারে না, বাঁচাতে পারে একমাত্র পরমাত্মার জ্ঞানই। একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানই মানুষকে চিরদিনের জন্য মুক্তি দিতে পারে।

পরিশিষ্ট : তৃতীয়

[আমেরিকায় থাকাকালে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ অনেক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে প্রেততত্ত্ববাদ-সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং সে সমস্ত বিভিন্ন বক্তৃতায় আমেরিকার তদানীন্তন চিন্তাশীল মনীষীরা যেমন 'ফ্রি রিলিজিয়স এ্যাসোসিয়েশন'এর সভাপতি টমাস ওয়েণ্টওয়ার্থ হিগিনসন, কেম্ব্রিজের ডা: লুইস জি, জেন্স, হার্বার্ডের অধ্যাপক জোসিয়া রয়েস, কলম্বিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জেমস্ এইচ্ হিলোপ, মিল্ টমসন, হ্যারিসন ওটিস্ এপথ প, নিউ বেডফোর্ডের রেভারেণ্ড পল বিভারি ফরথিংহোম্, কেম্ব্রিজের রেভারেণ্ড শ্যামুয়েল এম ক্রোথারস্ প্রভৃতি উপস্থিত থাকতেন। স্বামীজীর বক্তৃতার সারাংশগুলি তদানীন্তন বোষ্টন হেরাল্ড, বোষ্টন জার্নাল, বোষ্টন ট্রাভেলার, ডেলি ইভনিং আইটেম্, লিইন, দি মল এ্যাণ্ড এম্পায়ার, নিউইয়র্ক হেরাল্ড, পিট্সবুর্গ পোষ্ট, শিকাগো ইণ্টান-ওসেন, ওয়াটারবায় হেরাল্ড প্রভৃতি বিখ্যাত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হ'ত। আমরা সেই সেই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কতক-গুলি বক্তৃতার সারাংশের বঙ্গানুবাদ এখানে দিলাম।]

১। স্বামী (স্বামী অভেদানন্দ) বল্লেন, আত্মার অমরত্ববাদের সৃষ্টি হয়েছিল প্রাচীন ভারতে আর্যদের মধ্যেই। তিনি 'বুক অব এক্লিরিয়াটস্' থেকে কতকগুলি নজির উদ্ধৃত করে বললেন : মরণের পর আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মনীষী সোলেমনেরও অভ্রান্ত বিশ্বাস ছিল না। বিশ্বের অনেক জায়গায়ই এখনো অনেক লোক আছেন যাঁরা 'মানুষ ম'রে গেলে তার জন্ম হয় না' একথা বিশ্বাস করেন। একটিমাত্র মানুষ (যীশুখ্রীষ্ট) মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ করেছিলেন (খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করেন যে, যীশুখ্রীষ্ট ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে মারা যাবার পর আবার দেহসহ পুনরুত্থিত হয়ে স্বর্গে গিয়েছিলেন)। এই রহস্যপূর্ণ পুনরুত্থানের কথা দিয়েই মরণের পর আত্মার অস্তিত্বকে যথেষ্টভাবে প্রমাণ করা যাবে না। যাঁরা যীশুর এইপুনরুত্থানরহস্য বিশ্বাস করেন তাঁরা আবার আমাদের মতো অবিশ্বাসীর অনন্ত-জীবনের প্রতি সন্দেহশীল, কিন্তু তাঁদের বিশ্বাসে বর্তমান জগৎ প্রভাবান্বিত নয়।

মরণের পর যারা পরলোকের বিষয়ে কিছুটা আশাবাদী তাদের আশাকে বাঁচিয়ে রাখার পক্ষে বড় অন্তরায় হল—সংশয়বাদীদের এই বিশ্বাস যে জড়দেহই

মানুষের আত্মা সৃষ্টি করে সুতরাং দেহ নষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও নাশ হবে। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে জন্মের আগে-ও আত্মার অস্তিত্ব ছিল, মরণের পরেও থাকবে আর এ'থেকেই পরিষ্কারভাবে বুঝায় হিন্দুরা 'সূক্ষ্মদেহে' জীবাত্মা বা প্রাণবিন্দু-রূপে জড়দেহ-অতিরিক্ত একটি বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন। হিন্দুরা বলেন, জড়দেহ সম্বন্ধে ঐ প্রাণবিন্দু বা সূক্ষ্মদেহের কাজ বা প্রয়োজন শেষ হলেই তৎক্ষণাৎ পুরাতন দেহটিকে পরিত্যাগ করে নূতন একটি দেহ সে গ্রহণ বা সৃষ্টি করে, কারণ সূক্ষ্মদেহ বা জীবাত্মার কোনদিন মৃত্যু নাই, সে অবিনশ্বর। পৃথিবীতে কোনো জিনিসেরই নাশ নাই, সুতরাং মৃত্যুটা হল কেবলই কতকগুলো পরিবর্তন বা বিচিত্র বিকাশ। জন্ম-মৃত্যুধারার ভেতর দিয়ে জীবাত্মার রূপেরই কেবল পরিবর্তন হয় এবং যতদিন না তার জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য-রূপ মুক্তি লাভ বা অন্তর্নিহিত সকল সুপ্ত শক্তির পুনর্জাগরণ হয় ততদিন তার পরিবর্তন বা রূপপরিবর্তন চলতেই থাকে। আমরা জানি সূক্ষ্মদেহ আমাদের আত্মার যথার্থ স্বরূপ নয়, এটা আবরণ মাত্র। পরমাত্মার জীবাত্মা অংশবিশেষ অথবা বলা যায়—'জীবাত্মা একটি বৃত্তের মতো, তার কেন্দ্রীরূপী চৈতন্যাত্মা রয়েছেন বৃত্তটির সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে কিন্তু ব্যাসের পরিধি নেই কোন জায়গায়ও। সর্বব্যাপী চৈতন্যই পরমবস্তু পরমেশ্বর, তাঁকেই বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে কেউ আল্লা, কেউ যীশুখ্রীষ্ট, কেউ বুদ্ধ বা স্বর্গস্থ পিতা বলে পূজা ও উপাসনা করে থাকেন। পরমাত্মা কোন পরিবর্তন—কোন সীমায়িত গণ্ডীরই অধীন নন, তিনি সমগ্র বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করে আছেন, সকল জীবাত্মা তাতেই স্থিত এবং তিনি সকল-কিছু কর্মের উৎস বিশেষ।

"পৃথিবীর সকল ধর্মের উদ্দেশ্যই আত্মানুশীলন করা ও আত্মজ্ঞান-রূপ অমৃততত্ত্বকে লাভ করা। খ্রীষ্টানধর্মের ত্রুটিই তো সেখানে যে, সে বাইরের আচার ও অন্ধবিশ্বাসকে অনুসরণ করে আসল উদ্দেশ্যকে হারায় ও পরমাত্মার অনুশীলন করে না।"

—বোষ্টন হেরাল্ড, ২রা জুন, ১৮৯৯

২। "স্বামী অভেদানন্দ তাঁর ভারতের শবদাহপ্রথার উল্লেখ ক'রে বলেন—তার প্রচলন প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে। (বৈদিক যুগে যে শব-সংকারপ্রথার প্রচলন ছিল ঋগ্বেদের মন্ত্রই তার প্রমাণ) ভারতবাসীরা মনে করতেন ও এখনো করেন, শবদাহপ্রথা মৃতজনদের দেহের সংস্কার-সাধন করার

একটি উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যকর নিয়ম। পার্শীরা বিশ্বাস করেন যে মরণের সাথে সাথেই দেহটাকে নষ্ট করে ফেলা উচিত। হিন্দুরা আত্মাকে দেহ থেকে একেবারে পৃথক বস্তু বলে মনে করেন আর এই আত্মাই মানুষের আসল স্বরূপ, দেহটা আত্মার ধারক ও আবরণ।

—বোষ্টন জার্নাল, ২রা জুন, ১৮৯৯

৩। "ভারতের স্বামী অভেদানন্দ হিন্দু, যুবক, প্রতিভাদীপ্ত তাঁর মুখ এবং বিশুদ্ধ ইংরেজীতে তাঁর অসাধারণ দখল। অতীব মনোজ্ঞ ভাষায় চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দিলেন তিনি ভারতের শবদাহপ্রথার ওপর, বল্লেন—প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে এই প্রথা চলে আসছে ভারতবর্ষে। কাজেই পৃথক করে শব-সৎকার সমিতির আর ভারতে প্রয়োজন নেই। সেখানকার প্রতিটি হিন্দুই মৃতদেহের সৎকারপ্রণালী ভালোভাবে জানেন।

"ইজিপ্টবাসীদের প্রথা ও ধারণা কিন্তু ভিন্ন রকমের। তাঁরা দেহ ও আত্মার সম্পর্ককে এত নিবিড় বলে ভাবেন যে, একটিকে অপরটি থেকে মোটেই বিচ্ছিন্ন করতে চান না আর তার জন্য মরণের পর মৃতদেহকে তাঁরা ওষুধপত্রাদি দিয়ে ভালভাবে সংরক্ষিত করে তবে কবরস্থ করেন, কেননা তাঁদের স্থির বিশ্বাস, তাহলেই আত্মা সুখে অবস্থান করবে। কিন্তু হিন্দুদের বিশ্বাস তাদের থেকে অনেক পৃথক ; তাঁরা মনে করেন দেহটা কিছুই নয়, আত্মাই মানুষের ইহসর্বস্ব, দেহ আত্মার আবাস, অবিনশ্বর আত্মা দেহকে পরিত্যাগ ক'রে চলে গেলে দেহের আর কোন মূল্যই থাকে না।"

—বোষ্টন ট্রাভলার, ২রা জুন, ১৮৯৯

৪। "আমরা মনে করি যে জন্মের সময় আমাদের আত্মা পরমেশ্বর থেকে বিচ্ছুরিত হন। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, জন্মের আগে ও মরণের পরে আত্মার অস্তিত্ব থাকে। সত্যিই এই বিশ্বাস মনুষ্যজীবনের অনেক-কিছু সমস্যার সমাধান করে ; বিশেষ করে আমাদের মধ্যে সকল রকম বৈষম্যের সমাধান এর দ্বারা হয়। সুখ ও দুঃখ আমাদের অতীত জীবনেরই ফলস্বরূপ। অদৃষ্টও আমরাই নিজেরাই সৃষ্টি করি। বাসনা অনুযায়ী জীবাত্মা তার ভবিষ্যৎ জীবন সৃষ্টি বা গ্রহণ করে। যেমন, দেখার ইচ্ছা বা বাসনা সৃষ্টি করে তার চক্ষুরূপ ইন্দ্রিয়। তবে জীবাত্মা কোনদিন না কোনদিন মুক্তিরূপ অমৃতত্ব লাভ করবেই,

সাধনা-তার বৃথা যাবে না। স্বর্গ বা নরক আসলে মানুষেরই চিন্তার পরিণতি, মানুষের চরম লক্ষ্য হয় তার অন্তরে দেবত্বের বিকাশ সাধন করা—তার পরম পবিত্র অন্তরাত্মার অনুভূতি লাভ করা। 'বুদ্ধ'-শব্দটির অর্থ 'জ্ঞানী', তবে এই জ্ঞানের আবার ভিন্ন ভিন্ন রকমের বিকাশ আছে। কর্মফলের চিন্তা না করে কর্ম করার শ্রেয় এবং ফলপ্রত্যাশাহীন কর্মই জগতে শ্রেষ্ঠ। ভালোবাসার বেলায়ও তাই ; ভালোবাসা যখন অপরের ভালোবাসা পাবার প্রত্যাশা করে না তখনই তা শ্রেষ্ঠ ভালোবাসা।"

—ডেইলি ইভনিং আইটেম্, লিইন : মাস

মঙ্গলবার, ১০ই এপ্রিস, ১৯০০

৫। "স্বামীজী (স্বামী অভেদানন্দ) বলেন : মানুষের আত্মা পরমাত্মারই বিকাশ বিশেষ বলে শাশ্বত ; অনন্তকাল এই আত্মার সত্তা ছিল ও অনন্ত ভবিষ্যতেও থাকবে। মোটকথা অবিনশ্বর বস্তুমাত্রেই আদিতে ও অন্তে সমান-ভাবে থাকে। বিশ্বের সকল ধর্মই এই কথা বলে যে, অতীত ও ভবিষ্যতে আত্মার অমরত্ব ছিল ও থাকবে।

"বিদেশী আত্মাদের বর্তমান বিকাশ নির্ভর করে তাদের অতীত বিকাশ বা কর্মবৈচিত্রের ওপর এবং ভবিষ্যৎ নির্ভর করে বর্তমানের ওপর। মৃত্যুর ভেতর দিয়ে আমরা আমাদের প্রকৃতিকে গ্রহণ করি অর্থাৎ পূর্বজন্মের স্বভাব বা প্রকৃতির উপরই আমাদের বর্তমান জীবনের স্বভাব বা চরিত্র নির্ভর করে, এর কোন ব্যতিক্রম হয় না। স্বভাব বা চরিত্র গঠিত হয় আমাদের জীবনের অপরিহার্যভাবে প্রভাব বিস্তার করে। শাস্ত্রেও আছে ; 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতী তাদৃশী,, যার যেমন কর্ম, সে তেমনি ফল পায়। কর্মের এটিই একটি বড় নিয়ম এবং এটিকে বিজ্ঞানসম্মত কার্যকারণসূত্রও বলা যায়।

—দি মল এ্যাণ্ড এম্পায়ার ; বৃহস্পতিবার,

ফেব্রুয়ারী ৪ঠা, ১৯০৫

৬। 'প্রেততাত্ত্বিক মিডিয়ামের কাজ' এটাই ছিল ভারতাগত স্বামী অভেদানন্দের বক্তৃতার বিষয়। **তিনি বলেন প্রেতগণ বাস্তব রূপ নিয়ে

আবির্ভূত হয় এটি নিজের চোখে দেখেছেন এবং তাদের কাছ থেকে সংস্কৃত ও বাংলাভাষার যে বার্তা পেয়েছেন তা সম্পূর্ণ সত্য।

"প্রেততত্ত্ববাদের মূল ঘটনা মেনে নিলেও স্বামীজী মিডিয়ম হবার প্রবৃত্তিকে প্রশংসনীয় বলে মনে করেন না, কেননা এতে যে স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্বের লোপ ঘটে তাতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মানুষের স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়, বিচার শক্তি ও আত্মসংযমের বিলুপ্তি ঘটে, নৈতিক জ্ঞান ও চরিত্রের অবনতি হয় এবং অনেক সময় উন্মাদগ্রস্ত হয়। তারি জন্য ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকে যোগী ও ধর্মাচার্যেরা তাদের ছাত্র ও শিষ্যদের মিডিয়ম হতে নিষেধ করেছেন এবং শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে আত্মিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত ও বর্ধিত করে জড়শক্তি ও ভৌতিক শক্তিকে নিজের বশীভূত করা যায়।"

—নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড, ফেব্রুয়ারী ১৩, ১৯০৫

৭। "স্বামীজী (অভেদানন্দ) বল্লেন : প্রেততত্ত্ববাদের কিছু অবশ্য ভালো জিনিস আছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, পূর্বজীবনের অস্তিত্ব যদি নাই থাকে এবং পরবর্তী জীবন বা ভবিষ্যৎও না থাকে তবে আকস্মিকভাবে বর্তমানে আমরা এ' পৃথিবীতে এলামই বা কেন? অমরত্ব সম্বন্ধে প্রশ্নটির বিজ্ঞান সম্মতভাবে উত্তর দিয়ে তিনি বল্লেন : বিজ্ঞানের প্রমাণ হল—কোন জিনিসই শূন্য থেকে আকস্মিকভাবে সৃষ্টি হতে পারে না, কাজেই মনুষ্য-দেহ নিয়ে জন্মগ্রহণ করবার আগে আমাদের আত্মার অস্তিত্ব ছিল।"

পিট্‌স্‌বুর্গ-পোষ্ট, জানুয়ারী ২৬, ১৯০৭

৮। "অনেকে বলেন যে, বেদান্ত প্রেততত্ত্ববাদের মূল কথাই প্রকাশ করে মরণের পর আত্মা কিভাবে থাকে কি ধরনের প্রেতাত্মা আমাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে, কার্য-কারণ নিয়মের অনুযায়ী পৃথিবীর ভোগসুখে আসক্ত বিদেহীরা কিভাবে আবার জন্মগ্রহণ করে ও মনুষ্যদেহ নিয়ে বারংবার যাতায়াত করে সেই সকল রহস্য বেদান্ততত্ত্ব থেকে আমরা জানতে পারি।

শিকাগো ইনটার ওসেন, অক্টোবর ২৬, ১৯০৮

৯। "বেদান্তের মতে আত্মার পুনর্জন্মবাদ কাকে বলে এ'কথার উত্তর দেবার আগে আমার প্রথম বলা প্রয়োজন হবে যে, প্লেটো ও তার

মতানুবর্তীরা যেমন বলেন—'মরণের পর মানুষের আত্মা কিছুক্ষণের জন্য পশুদের দেহে আশ্রয় গ্রহণ করে এই মতকে অনুসরণ না ক'রে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে মরণের পর আত্মা মানুষের শরীরই গ্রহণ করে, পশুর শরীর নয়।

"মরণের পর পুনর্জন্মগ্রহণ সম্বন্ধে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি হল যে প্রত্যেক জীবাত্মাই তার কর্মাকর্মের ফলস্বরূপ দেহধারণ করতে বাধ্য, এতে তার খুশিমত প্রবৃত্তি থাকতে পারে না। এই নিয়মকেই কার্য-কারণসূত্র বলে। সর্বজনগ্রাহ্য কার্যকারণ নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন ভারতবর্ষেরই চিন্তাশীল মহামনীষীরা একথা বোধ হয় আমি অনায়াসেই বলতে পারি। এই নিয়মের সংস্কৃত নাম তাঁরা দিয়েছেন 'কর্ম'। আধুনিক বিজ্ঞানেরও মূলসত্যের অন্যতম হল কর্মসূত্র। অবশ্য বৈজ্ঞানিকেরা এর ভিন্ন নাম দিয়েছেন। তাঁরা এর বিচিত্রভাবে নাম দিয়ে বলেছেন, 'করণসূত্র', 'পরিপূরক নীতি,' 'কর্ম-পরিণতি-সূত্র প্রভৃতি। তবে কর্মনীতি বা কার্য-কারণ-নিয়মের বিচিত্র নাম থাকলেও এ'সম্বন্ধে সকলের ধারণা কিন্তু একই, কেননা তারা বিশ্বাস করে যে, প্রতিটি কর্মই তার অনুযায়ী ফলদান করতে বাধ্য, আবার প্রতিটি ফলথেকেই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আর একটি ফল-সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক।

"কর্মনীতি দ্বারা আমাদের জন্ম ও পুনর্জন্ম নিয়ন্ত্রিত হয়। আমাদের বিশ্বাস যে, পিতামাতা কখনও সন্তানের আত্মা সৃষ্টি করতে পারেন না। তাঁরা উপায় বা মাধ্যম বিশেষ, কেননা তাঁদেরকে আশ্রয় করেই জীবাত্মারা পার্থিব শরীর ধারণ করে। অবশ্য জীবাত্মাদের যদি জন্মগ্রহণ করার তীব্র বাসনা বা ইচ্ছা থাকে তবেই।

"মরণের পর জীবাত্মারা আবার জন্মগ্রহণ করে বটে, কিন্তু যতক্ষণ না জন্মের অনুকূল পরিবেশ তারা দেখতে পায় ততক্ষণ জন্মগ্রহণ করে না।

আমাদের (ভারতবাসীর) বিশ্বাস যে, জীবাত্মারা যখন আবার নতুন জন্মগ্রহণ করে তখন তারা মনুষ্য-শরীরই ধারণ করে, পশুপক্ষীর শরীরে যায় না, কাজেই অন্য মনুষ্য-দেহ ধারণকে আমরা বলি 'পুনর্জন্মগ্রহণ'। মানুষের আত্মা পশুদেহকে আশ্রয়রূপে বেছে নেবে কেন ? যদি কেউ একথা বলে তবে তার উত্তরে বলি, মানুষের আত্মা মনুষ্য-দেহ ধারণ করার আগে বিভিন্ন প্রাণীর শরীরে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ক্রমবিকাশের নীতি ও নিয়ম অনুযায়ী পরিশেষে

সে মনুষ্য-দেহ ধারণ করে, কাজেই মনুষ্য থেকে পশুরাজ্যে যাবারই বা তার প্রয়োজন কি ? তা ছাড়া এরকম হওয়াটাও বিজ্ঞান ও যুক্তি সম্মত নয়।

"কোন এজজন বিখ্যাত অধ্যাপক মরণের পর পুনর্জন্মগ্রহণ-সম্বন্ধে বলেছেন ঃ যারা মনুষ্য-শরীর ধারণ করার পর জীবাত্মার পশুদেহ ধারণনীতির সমর্থন করে তাদের বিশ্বাস সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অসম্ভব। তা ছাড়া বাস্তব সত্যের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় ক্রমবিকাশনীতি কখনই উচ্চ শ্রেণী ছাড়া, নিম্নাভিমুখী হয় না।"

—ওয়াটার ব্যারি হেরাল্ড, কন্ (সম্পাদকীয়)
অক্টোবর ১৪, ১৯০৭

১০। "হিন্দু দার্শনিক স্বামী অভেদানন্দ পশ্চিম কর্নওয়েল থেকে পাঁচ মাইল দূরে কোন একটি জায়গায় বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন ঃ 'আমি দর্শনের অধ্যাপক। এই দর্শনকে আপনারা বেদান্ত বা হিন্দুধর্ম বলতে পারেন তাতে কোন আপত্তি নাই। তবে এই দর্শনের অন্যতম মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল আত্মার অমরত্ব প্রতিপাদন করা। জড়-দেহের ধ্বংসের পর আত্মার অস্তিত্ব থেকে যায়, তবে কিছু সময়ের জন্য সে কর্মফল ভোগের নিমিত্ত স্বর্গে কিংবা অন্ধতম স্থানে গমন করে। এই আত্মার মধ্যে কিন্তু একটি আকর্ষণী শক্তি আছে। এ'সম্বন্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গেছে এমন সৈনিকদের আত্মার উদাহরণ নেওয়া যাক। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের এমনিই আকস্মিকভাবে মৃত্যু ঘটে যে, মরণের পর তারা কিছুক্ষণ জানতেই পারে না যে, তাদের দেহ গেছে। কিছুদিনের মতো তাদের আত্মা সূক্ষ্ম ভৌতিক জগতের বিভিন্ন স্তরে বিচরণ করে। তারপর কর্মের গুণাগুণ অনুযায়ী আবার জন্মের স্পৃহা তাদের মধ্যে জাগে এবং তদনুযায়ী বিদেহীর আত্মা চেষ্টা করে। ভাগ্যবানদের ইচ্ছা সফল হয়, তারা অনুকূল পরিবেশে ও দেহে জন্মগ্রহণ করে, আর হতভাগ্যেরা কষ্ট ভোগ করে। তবে কারুরই জন্য অনন্ত নরকের ব্যবস্থা নাই। অনন্তকাল ধরে নরক-যন্ত্রণা 'ভোগ করবে এই ধারণা অজ্ঞানী ও নির্বোধেরাই করে। কাজেই আমরা সকলেই একদিন-না-একদিন মহামুক্তির সন্ধান পাব, আর শুধু মুক্তিই বা কেন, পরম পবিত্র ভগবানের মতো পরিপূর্ণতা লাভ করব।

আমরা (ভারতবাসীরা) বিশ্বাস করি যে, আমাদের প্রত্যেকের বাসনা

চরিতার্থের জন্য এক একটি লোক (স্তর) আছে। যেমন গায়কের লোক, শিল্পীর লোক, কর্মীর লোক প্রভৃতি। স্বর্গ ও নরকের কথা আমি উল্লেখ করেছি বটে, কিন্তু তাই বলে আমার বক্তব্য এই নয় যে, এ'দুইটি মানুষের আত্মার একমাত্র লক্ষ্য বা গন্তব্য স্থান। স্বর্গ ও নরক আসলে মানুষের চিন্তারই পরিণতি বা ফলস্বরূপ। মনে করুন—কোন লোক সারা জীবন ধরেই কৃপণ। এখন মৃত্যুর পর তার গতি কি হবে ? অর্থের ওপর একান্ত আকর্ষণের জন্য পার্থিব টাকাকড়ির আসক্তিই তার মধ্যে প্রবল হয়ে উঠবে, কিন্তু টাকাকড়ির বাসনা সেখানে চরিতার্থ হবে না, কেননা পরলোকে সূক্ষ্ম চিন্তার স্থান, স্থূল টাকাকড়ি বা বিষয়ের অস্তিত্ব সেখানে নাই। কাজেই 'তীব্র বাসনার চরিতার্থ না হলে সেই কৃপণের প্রেতাত্মা অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে।

ভারতবর্ষের ধারণা হল বর্তমান পার্থিব জীবন অতীত জীবনের ফল-স্বরূপ। অনন্ত যাওয়া-আসা বা জন্মমৃত্যুর ধারায় আমরা বিশ্বাস করি এবং এই জন্মমৃত্যুর বা গতায়াত-রূপ ক্রমবিকাশের ভেতর দিয়ে পরিশেষে 'পরমমুক্তি লাভ করি।"

—নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড রবিবার,
অক্টোবর ১৪, ১৯০৭

মূল্য ঃ ১৮০০ টাকা

দ্রণ ঃ ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও, ৭২।১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩